বিষ্ণু দে, এ ব্রতযাত্রায়

অরুণ সেন

অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন. কলকাতা-৬

শান্তা-’কে

‘এই লাবণ্যে এই নিশ্চিত ছন্দে
আমরা সবাই কেনই বা পার হব না
সামনের এই পাহাড়ের খাড়া খন্দ ?’

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থের লক্ষ্য : ব্যক্তি, সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধসূত্রে কবি বিষ্ণু দে-র গড়ে-ওঠা, 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'অন্বিষ্ট' পর্যন্ত তাঁর বিকাশের পথরেখা এবং 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' থেকে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পর্যন্ত তাঁর কবিতার বিশ্বকে চোখের সামনে হাজির করা। 'অন্বিষ্ট' পর্যন্ত আলোচনাতেই সেই বিকাশের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ তখনই তো তাঁর আত্ম-আবিষ্কার সম্পূর্ণ হল। ফলে সেখানে অনেকটাই কবিতা ধরে ধরে অভিজ্ঞতার উন্মোচন এবং পাঠকের কাছে তা পৌঁছে-দেওয়া, অর্থাৎ পাঠকের সঙ্গেই যেন কবিতা-পড়া। অবশ্যই সেই পড়ার সূত্রে তথ্য, এমনকি তত্ত্বকেও বাদ না দিয়ে। আলোচনার পদ্ধতি তাই এখানে ইতিহাসের ক্রমানুসরণ—কবিতার থিম বা বিষয় ও রূপকল্প অনালোচিত এমন নয়, কিন্তু তা ইতিহাস-অনুসারী আলোচনার সীমানাতেই। 'অন্বিষ্ট'-পরবর্তী কবিতা প্রসঙ্গে আবার রূপকল্প বা বিষয়ের আলোচনাই ক্রমশ স্বাধিকার পায়—তার আভাসই হয়তো এ-গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধে। কবি বা কবিতার কালপর্যায় এবং সমালোচকের লক্ষ্য অনুসারেই সমালোচনার সঠিক পদ্ধতি নিরূপিত হয়। বর্তমান গ্রন্থের আলোচনার দোষগুণ এই গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতির কথা মনে রেখেই বিচার্য হোক, এটাই লেখকের আশা।

এই লেখাগুলির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে-সব বন্ধু লেখকের সহমর্মী সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের কথা মনে পড়ছে। লেখাগুলির চূড়ান্ত রূপ দেবার সময় শ্রীদেবেশ রায়ের সহায়তা পেয়েছি প্রায় যৌথকর্মের অন্তরঙ্গতায়। বইটির নামে বিষ্ণু দে-র কবিতার যে ছিন্ন চরণটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেটিও তাঁরই নির্বাচন। শ্রীশঙ্খ ঘোষের প্রশ্রয়েও আমি গভীর কৃতজ্ঞ।

ভাবতে ভালো লাগছে, শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী-র কাছেও প্রচ্ছদপট আঁকার কাজটি হয়ে উঠেছিল মিলিতভাবে বিষ্ণু দে-চর্চারই অঙ্গ। আর নীরদ মজুমদারের রিখিয়ায় বসে আঁকা ত্রিকূটের ছবিটির সঙ্গে একটু স্মৃতি জড়িয়ে : কোনো-এক সময়ে বিষ্ণু দে বিষয়ে বই বেরোবে জেনে সামান্য অনুরোধেই তিনি ঐ বইটির জন্য ছবিটি এঁকে দিয়েছিলেন সাগ্রহে এবং চিঠিও দিতেন দু-একটি, কবে বই বেরোবে জানতে চেয়ে। অরুণা প্রকাশনীর আনুকূল্যে সত্যিই বেরোল এতদিনে।

অরুণ সেন

লেখকের অন্য গ্রন্থ :

এই মৈত্রী। এই মনান্তর।

বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জি

সূচি

মুখবন্ধ

'রচনাবলির সমগ্রতা'

প্রত্যেক কবির বিচারেই তাঁর সমগ্র রচনা এবং সেই রচনার কালানুক্রম সম্পর্কে জ্ঞান খুব কাজে লাগে। কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে সেই জ্ঞান প্রায় অপরিহার্য। বিষ্ণু দে, আমাদের মতে, সেরকমই একজন কবি। অথচ বিষ্ণু দে-র রচনার সমগ্রতা ও কালানুক্রম বিষয়ে বহু পাঠকই অজ্ঞ বা উদাসীন। বিষ্ণু দে দীর্ঘদিন লিখেছেন এবং প্রায় ছেদহীনভাবে লিখেছেন—তাঁর ঐ অবাধ সৃজনীশক্তির কারণেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে চিঠিতে উচ্ছ্বসিতভাবে জানান, 'আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায়।'[১] এবং শুধু তাই নয়, একথাও হয়তো বলা যায়, তিনি অনেক লিখেছেন (এক্ষেত্রে অবশ্য, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের তুলনা ওঠে না)। তাঁর বহুপ্রসূ রচনায় আছে অনেক বাঁক, নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি—প্রসঙ্গ ও প্রকরণের প্রগতি। আর সে-বিষয়ে অজ্ঞতা থাকলে যা হয়, তা হল তাঁর প্রথম দিককার কোনো কবিতাকে খ্যাতির কারণে মনে করা হয় তাঁর পরিণত প্রকরণের প্রতিনিধিমূলক উদাহরণ—যদিও হয়তো কবিতার সংখ্যা বা স্বভাব কোনো দিক থেকেই তার সমর্থন নেই। কবির প্রথম দিককার কোনো কবিতা কোনো পাঠকের কাছে সংগতভাবেই চূড়ান্ত সিদ্ধির উদাহরণ বলে মনে হতেই পারে (যেমন ধরা যাক, 'ঘোড়সওয়ার')—কিন্তু তখনও, কবিজীবনে তার স্থান কোথায় এবং তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টিতে তা প্রতিনিধিমূলক কিনা, এই বিস্মরণ অমার্জনীয়।

এটা বেশি বিপত্তিকর হয় বিষ্ণু দে-র কাব্যবিকাশের প্রথম পর্যায়ের কবিতা বা কাব্যগ্রন্থের আলোচনায়। কাব্যবিকাশের চূড়োয় পৌঁছবার আগেই যে-পরিক্রমা চলে, সেই পরিক্রমার পর্বে পর্বে প্রায়শই নিপুণ ও সার্থক কবিতাও বেরোতে পারে তাঁর হাত দিয়ে (যে-কথা অনেকেরই মনে হয়েছে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'-র কোনো কোনো কবিতা পাঠ করে), কিন্তু তাকে কখনই তাঁর কাব্যস্বরূপের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা চলে না।

এর ফলে যা হয়, শুধু একটি কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, কোনো এক যুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য বিষ্ণু দে-র সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গেঁথে যায় বিষ্ণু দে-র নিরন্তর প্রবহমানতার কালানুক্রম বিষয়ে অজ্ঞ পাঠকের মনে। আর সেই ভ্রান্তিতে মনে হয়, বিষ্ণু দে কাব্যপ্রকরণে এলিয়টের অনুসারী—যদিও সেটা তাঁর কাব্যবিকাশের প্রথম পর্যায়ে কিছুটা বলা গেলেও, পরবর্তী পর্যায়ে, তাঁর কাব্যজীবনের দীর্ঘতম সময়ে, মোটেই সত্যি নয়। অবশ্যই প্রথম পর্যায়ের প্রাকরণিক অভিজ্ঞতাকে তিনি আত্মসাৎ করেছেন, কাজেও লাগিয়েছেন হয়তো পরে—কিন্তু তার চেয়েও সত্যি, তিনি অনেকদিন ছেড়ে এসেছেন এলিয়টী প্রকরণের সংস্পর্শ। ঠিক সে-রকমই প্রথম পর্যায়ের পরেই তাঁর কবিতায় শব্দগত বা পুরাণ-উল্লেখগত পড়া-শোনাজাত দুরূহতা যদিও অনেক কমে যায়, ক্রমশই কমতে থাকে, কখনো শব্দ ও উল্লেখের সারল্য প্রায় হয়ে ওঠে বিস্ময়কর, তবু অমনোযোগী পাঠকের পূর্ব-স্মৃতি অনড়। দুরূহতার অপখ্যাতি রয়েই যায়।

কালানুক্রম বিষয়ে শুধু তথ্যজ্ঞান থাকলেই অবশ্য কাজ শেষ হয় না। বিষ্ণু দে-র প্রবহমান বৈচিত্র্য, অথচ সেই সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতা, রবীন্দ্রনাথের মতোই, তাঁর প্রকরণে এমন-একটা বৈশিষ্ট্য দেয়, যার স্বাদ পূর্বযুগের প্রকরণের আলোয় আরো স্পষ্ট হয়। এক পর্বের প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কখনো পরম্পরায় কখনো বৈপরীত্যে তিনি পর্বান্তরে চলেন। ফলে, আরো একটা বড় ক্ষতি বিষ্ণু দে-র হঠাৎ-পাঠকদের—তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয় না কোন শব্দ, কোন বাক্‌প্রতিমা, কোন উল্লেখ শব্দ-বাক্‌প্রতিমা-উল্লেখের অরণ্য থেকে উঠে এসে কীভাবে তাঁর সামগ্রিক কাব্য-অভিজ্ঞতায় আত্ম-উন্মোচনের কাজ করছে, তাঁর কবিতার চাবিকাঠির কাজ করছে। বুঝে উঠতে পারবেন না তাঁরা 'বীজকল্প' শব্দের তাৎপর্য কিংবা দীর্ঘ ব্যবহারের সুবিধায় কেন 'কপিলগুহা' শব্দটির একবার উল্লেখেই অন্য এক পাঠকের হৃদয় স্বচ্ছ হয়ে যায়। অথচ প্রথম জীবনের মুখ্য ও গৌণ অজস্র পুরাণ-উল্লেখ থেকে এভাবেই তো গড়ে ওঠে তাঁর কবিতায় কৈলাসবাসী হরগৌরী বা সতী-পার্বতী বা কুমারসম্ভবের ইঙ্গিতময় প্রতীক। শুধু তাই নয়, এক-একটি পর্বের উপমা-উল্লেখের পুনরাবৃত্তিতে ও পুনর্গঠনে তৈরি হয় স্থায়ী এক-একটি পৌরাণিক কাঠামো। এভাবেই বৃষ্টি-নদী-সাগরের প্রাকৃত উপমায় মেলান তিনি ভাগীরথী ও সগরসন্তানমুক্তির পুরাণকে। নগ্নতনু সৌন্দর্যের প্রতীক আর্টেমিস কিংবা অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাতা কবিমানসী মিলে যায় প্রতীক্ষারতা মহাশ্বেতায়—কিংবা আরো পরে আমাদের জীবিকার লড়াইয়ে সহকর্মিণী সঙ্গিনী জঙ্গী নারীতে।

'চোরাবালি'-র নানার্থব্যঞ্জক প্রতীক ঘোড়সওয়ার লোকায়ত অবয়ব পায় লালকমল-নীলকমলে, সামাজিক-রাজনৈতিক অবয়ব তেভাগা আন্দোলনের কৃষাণ-কৃষাণীতে। এইভাবে পারস্পরিক সংলগ্নতায় ও বিকাশে পৌরাণিক উল্লেখগুলি বাস্তব-জীবনে যে তাৎপর্য পায় তাই নয়, জটিল শব্দ বা শব্দবন্ধের পাঠও পুনরাবৃত্তির গুণে অনায়াস হয়ে যায়, কবির নিজস্ব শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠতে থাকে। কবির বাক্যগঠনের ধরনও হতে থাকে পাঠকের পরিচিত। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, প্রথম জীবনে শব্দ উপমা প্রতিমা বা উল্লেখে তথাকথিত পাণ্ডিত্যের যে কিছুটা উগ্র প্রকাশ দেখা যায়, তার কোনো নান্দনিক ও ঐতিহাসিক যাথার্থ্যকে আমরা অস্বীকার করছি। সুধীন্দ্রনাথ যাকে 'নৈরাত্ম্যসিদ্ধি' বলেছেন—স্বকীয়তা প্রকাশে মিথ্যা অহংকার নয়, আত্মম্ভরী প্রগল্‌ভতা নয়, সত্যভাষণের নিরহংকার একাগ্রতা এবং পূর্বসূরীদের আশ্রয়পুটে প্রকাশভঙ্গির সংক্ষিপ্ততা ও বক্রতা—এ সমস্তই ছিল রবীন্দ্রোত্তর কবিতার জন্মকালীন দায়। সুধীন্দ্রনাথের ভাষা আবারও ব্যবহার করে বলা যায়, সভ্যতার প্রাথমিক সরলতা আজ আর সম্ভব নয়, আজকের জটিল ও কুটিল জীবনে ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ করেই কাব্য-কল্পতরুর জন্ম দিতে হয়।[২]

কিন্তু, মানতেই হবে, বিষ্ণু দে যদি সেখানেই থেমে থাকতেন, যদি ঐ পাণ্ডিত্য কবি-ব্যক্তিত্বের বিকাশের একটি প্রাথমিক, চমকপ্রদ কিন্তু প্রাগময় স্তরের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই না থেকে স্থায়ী সুর হতে চাইত, তবে সেই পাণ্ডিত্যের কূট ভেদ করার শ্রম হত পণ্ডশ্রম। অবশ্য, কিছু কিছু কবিতার আতিশয্য বাদ দিলে, সে-পর্বেও কূট ভেদের অত্যুৎসাহ ততখানি আবশ্যক কিনা এটাও সন্দেহ—যদি না অবশ্য সেই পাঠককে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তর দিতে হয়। প্রকরণের কূটজালে আবৃত প্রথম পর্যায়ের কোনো কোনো কবিতা বিষয়ে সতর্ক পাঠকদের অস্বস্তি ততখানিই সত্য, যতখানি সত্য এই মেঘাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক ক্ষণ পার হয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সাবলীলতার জগতে পাঠকের সহজ নিঃশ্বাস। দুঃখের বিষয়, বিষ্ণু দে-র সমগ্র কাব্যসম্ভারকে সামনে রেখে এই কালজ্ঞান অনেকেই দেখাতে পারেন না। তাঁর কাব্যের দুর্বোধ্যতা নিয়ে কিংবদন্তির পরমায়ু বড় দীর্ঘ, তার আড়ালে প্রত্যক্ষও লুকিয়ে থাকতে চায়।

কিন্তু এ সমস্তই তো বাইরের বাধা। এই ভ্রান্তিগুলো যে পাঠক উত্তীর্ণ হবেন, তিনি কি আর কোনো বাধার সম্মুখীন হবেন না বিষ্ণু দে-র কবিতার ক্ষেত্রে? কবিতার ভেতরকার বাধা? সেটাই তো আসল বাধা, বড় বাধা।

বিষ্ণু দে প্রথমাবধিই নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পরিত্রাণের কথা ভেবেছিলেন। তাই অনুশীলনী পর্বে আর কেউ নয়, প্রমথ চৌধুরীই বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে অনুকরণীয় মনে হয়েছিল—ট্রিয়োলেটগুচ্ছ বা এমন কি গল্প রচনাতেও। পরে, আরেকটু সিরিয়স পর্বে, বিদেশী ও স্বদেশী সাহিত্য বা পুরাণ থেকে অজস্র উল্লেখ, এমন কি বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন পরোক্ষতায়। 'চোরাবালি'তে এসে অনেক কবিতাতেই দেখতে পাই কী ভাবে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিককে মেলাচ্ছেন তিনি কবিতায় একাধিক মাত্রার সম্পাতে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায়, ব্যক্তিগত অনুভূতির গোষ্পদে বিশ্বমানবিক ছায়া।[১]

ক্রমশ কী ভাবে সেই মাত্রা বেড়ে যায়, রূপান্তর ঘটে তার সামাজিক-রাজনৈতিক অন্বয়ে. শব্দভাণ্ডারেরও বিস্তার ও বৈচিত্র্য ঘটে—তা-ই তো বিষ্ণু দে-র কাব্যধারার ইতিহাস। ফলে, যে পাঠক একটি মাত্রা খুঁজবেন, তিনি শব্দ-প্রয়োগের অসরল উচ্চাবচতায় অস্বস্তি বোধ করবেন। নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চাপ এখানেও আছে, পাঠক নিশ্চয়ই তাতে সাময়িক সাযুজ্যও বোধ করেন—কিন্তু অচিরেই অর্থান্তরের ছোঁয়া তাঁকে বিচলিত করে—শব্দপ্রয়োগের আকস্মিকতা বা দূরত্ব তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একই কবিতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দেই শুধু নয়, একই শব্দে একাধিক মাত্রা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে পাঠককে। একটি প্রতিমা কখনো. ব্যক্তিগত উত্তাপ বিকীরণ করে, কখনো উদ্ভাসিত হয় ইতিহাসের সাঙ্গীকরণে—লুকোচুরি চলে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার। কবিতার একটি অর্থকে গ্রহণ করে যে পাঠক স্বচ্ছন্দে এগোতে চায়, অকস্মাৎ বাঁধা সড়ক থেকে প্রবল ধাক্কায় ছিটকে পড়ে—কবিতার মোচড়ে আভাসিত হয়ে ওঠে ভিন্ন মাত্রার ভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা।

'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে 'প্রতীক্ষা' কবিতাটির শেষাংশটুকুই ধরা যাক। প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে অংশটির শুরু : 'গাঁয়ের ওপারে নদী বেগে প্রায় ঝর্ণা।' মোটামুটি কোনো অসুবিধে হয় না পাঠকের। কিন্তু খানিক পরেই অভাবিত সব শব্দ আসতে থাকে : 'তবুও নিথর পাখির ঝাঁকে জলের বাঁকে' লাইনটি থেকে। তখনই বোঝা যায় আগের প্রাকৃতিক বর্ণনা যতটা নিরীহ মনে হয়েছিল, ততটা তা নয়। নিছক প্রকৃতিপ্রেমের মুগ্ধতায় কবিতাটি হজম করা শক্ত। কিংবা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' বইয়ের সেই বিখ্যাত 'ক্লান্তি নেই' কবিতাটি ?

চাই না তুমি বিনা শান্তিও,
তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই।
কৃষ্ণচূড়া রাঙে, সেও তো হাহাকার ?
আমারই হৃদয়ের কান্তি ও।

কবিতাটিকে কেউ কেউ নিছক প্রেমের কবিতা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার আগের স্তবকের বহু শব্দই তাঁদের অস্বস্তিতে ফেলে—'জীবন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়' ইত্যাদি অংশে। ঐ অস্বস্তি তখনই ঘুচবে, যখন পাঠক এ-বিষয়ে সজাগ হবেন যে 'তুমি', 'শান্তি', 'আকাঙ্ক্ষা' কোনো শব্দেই আর এখানে একটি জিনিস বোঝায় না।[৪]

ফলে যে বহুমাত্রার বিন্যাস কবির নন্দনের অন্বিষ্ট, তার শরিক হতে হয় পাঠককেও। কবিতাকে বা সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিকেই চিনে নিতে হয় শুধু কবিতা থেকে নয়, তার সংলগ্ন কবির অন্যান্য রচনা ও এমনকি সামাজিক-রাজনৈতিক বা সাহিত্যগত কাজকর্মের পরিচয়েও। পল্‌কা, দুর্বল, অতিসরল শিল্পবিলাসী কাব্যবোধে এই জটিল বহুমাত্রার কবিতা একটা উঁচু পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায়।

কারণ তো এই, বিষ্ণু দে-র কবিতার বিচরণভূমি বিরাট, বিস্ময়করভাবে বিরাট। অনেক ভুবন তিনি হেঁটে বেড়ান, কিংবা হয়তো সে একই বিরাট ভুবন। নিছক বিষয়ের বা উপকরণের দিক থেকে, উপমা বা উল্লেখ বা বাক্‌প্রতিমার উৎসস্থলের দিক থেকে, অনুভূতির ও কল্পনার ভিন্ন ভিন্ন তল বা পর্দার দিক থেকে.তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কিন্তু এ বুঝি শুধু বৈচিত্র্যই নয়, একই প্রেরণার ঐশ্বর্যরঙিন প্রকাশ। সেই ঐশ্বর্যেই ঝলমল করে তাঁর কবিতার জগৎ। বিভিন্ন বিদ্যা বা জ্ঞানের আশ্রয় তিনি নেন, সেই কৈশোর থেকেই, যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন 'আমাদের ভালোবাসা রিফ্লেক্স্‌ লিলি', এই ব্যঙ্গোক্তির প্রকাশে সাইকোলজির আঁকাড়া শব্দপ্রয়োগের জন্য।[৫] অবশ্য অভ্যাসের এমনই গুণ যে, এখন আর প্রবলতম বিষ্ণু দে-বিরোধীও বোধ হয় এই দৃষ্টান্ত এ-প্রসঙ্গে গ্রাহ্য করবেন না।

সুতরাং বিষ্ণু দে-র কবিতার জগতের এই ব্যাপ্তি এবং জটিলতাই একটা বড় বাধা। সময়ের তালে তালে যদিচ সময়ের সঙ্গে অসরল সম্পর্কে চলে বলে এই কাব্যধারাকে যেমন কালানুক্রমিকভাবে জানতে হয়, তেমনি কবি যত কিছু বিষয়কে

ও উপাদানকে গ্রহণ করেন, প্রথম জীবনের বৈদগ্ধ্য-প্রদর্শনের উগ্রতায় নয়, ক্রমশ কাব্য-অভিজ্ঞতার লক্ষ্যের একাগ্রতায় ও বাক্‌প্রতিমার অন্তর্নিহিত গরজে, সেই অনিবার্যতাকে গ্রহণ করার নিরলস ক্ষিপ্রতাই চাই পাঠকদের কাছ থেকেও। বিষয় ও উপাদানের এই ব্যাপকতাকে নিছক পাণ্ডিত্য বলে মনে করলে ভুল হবে তখন, এ পরিগ্রহণ তো তাঁর নন্দনচেতনারই অন্তর্গত। সাম্য-বাদীর জগৎকল্পনার বৃহৎ স্বপ্ন ও দৈনন্দিন রাজনীতির সরলীকৃত প্রয়োজনসাপেক্ষ কর্মকৌশল যেমন এক নয়—তেমনি সর্বজনবোধ্য লোক-কবিতা বা গণ-কবিত আর এমনকি মার্কসবাদীর আধুনিক কবিতা, এ দুয়ের লক্ষ্য কখনই এক বলে তিনি ম.ন করেন নি।

এ তো গেল বিষয় বা উপাদানের দিক থে.কএই ব্যাপ্তি। মেজাজের ওঠানামাও কম দিশেহারা করে না পাঠককে। কখনো বাক্‌বাহুল্যে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দেন, কখনো চলে যান প্রায় স্বল্পবাক্ নিঃশব্দের কবিতার ধার ঘেঁসে। কখনো যুক্তির গাম্ভীর্যে তিনি স্তব্ধ পিরামিড তৈরি করেন, আবার কখনো লিরিক স্বচ্ছতায় পাঠককে চঞ্চল করে তোলেন। নদীতে কখনো শান্ত স্রোত, কখনো আকস্মিক ঘূর্ণি। অনুভূতির এই বৈচিত্র্য, কখনো চড়া পর্দা, কখনো খাদ, কখনো শুদ্ধ স্বর কখনো বা কোমল—তার ঝোঁকে শব্দেও মোচড় পড়ে—অপ্রত্যাশিত, অনভ্যস্ত টান আসে।

কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে? তাঁর পরিণত রচনায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই ওঠানামা—শব্দের এই অর্কেস্ট্রা বা ভাস্কর্য। 'অন্বিষ্ট' বা 'জল দাও'র মতো যে-কোনো একটি দীর্ঘ কবিতার অনুসরণেই বোঝা যায় মেজাজের এই বৈচিত্র্য।

'জল দাও' কবিতাটির শুরু মোটামুটি নৈমিত্তিক একটা এলানো ভঙ্গিতে:

ফাল্গুন আরম্ভে তার—
এক হিসাবে অবশ্য মাঘেই,
কিম্বা তারও আগে,
ও বছরে বা আর বছরে
বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোট ঘেরা মাটির সংযমে

এই ছেড়ে-বলার ভঙ্গিটি শিগ্‌গিরিই কাটিয়ে কবির গলায় আবেগের দ্রুততা আসে:

তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরো থরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন্ রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল।
তার পরই সেই আবেগ গড়িয়ে যায় ধীর স্তব্ধ উপলব্ধিতে :
সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল।
কখনো বেদনায় তিক্ততায় টেনে টেনে বলেন :
এখানে ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায় —
কী যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওয়ায় নাকি সে ঢাকায়…
কিংবা কখনো তত্ত্বের গাম্ভীর্য :
হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা.বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
কিংবা
(আমাদেরই ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোনে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে।)
তার পর অকস্মাৎ 'সতর্ক গম্ভীর' স্তব্ধ-প্রতীক্ষা ভেঙে পড়ে জলস্রোতের দোলায়
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল্ ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিম্বা রুক্মিণী দেবীর মতো ‥
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর —

কিম্বা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামীরে আরালে কিম্বা বুঝি কাশ্যপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
থরথর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে… ।

এইভাবে চলে আরো দীর্ঘ পতনঅভ্যুদয়ে বন্ধুর পরিক্রমা।

একেই তো বলি শব্দচিত্র। বিষ্ণু-দের কবিতায় তাকে যে সব সময় আয়নার সোজা প্রতিফলনে পাওয়া যাবে এমন নয়। তাকে পাওয়া যাবে এমন কি কখনো বৈপরীত্যের চালে। হয়তো যাকে মনে হয় ছদ্ম-বিষাদ, আসলে তা স্যাটায়ার, তীব্র পরিহাস। কিংবা আপাত-পরিহাসের আড়ালে থাকে বিধুর বেদনা। মহাকাব্যিক বিষয়-মহিমাকে তিনি প্রকাশ করেন হাল্‌কা কথনের ভঙ্গিমায়। ফলে দ্বান্দ্বিক কৌতুকের এই মেজাজকে অনেক সময়ই ঠারে-ঠোরে বুঝতে হয় তাঁর কবিতায়।

অবশ্যই শব্দের এই ঐশ্বর্য ও গতিশীলতা এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বান্দ্বিকের তীক্ষ্ণতা — কবিতার অবয়বের এই গড়ন—রাতারাতি তাঁর কাছে পৌঁছয় নি, যতই তিনি কৈশোরেই পরিপক্ক কবি বলে চিহ্নিত হোন না কেন। এরও একটা বিবর্তন আছে, আছে কষ্টার্জিত প্রাপ্তি। যদি ধরা যায়, 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থই তাঁর এই কাব্য-ভাষার, তাঁর নিজস্ব স্টাইলের প্রবেশতোরণ— তবে তার আগে 'উর্বশী ও আর্টেমেস' থেকে 'সন্দ্বীপের চর' পর্যন্ত ধাপে ধাপে কী ভাবে তিনি এই ভাষার অনিবার্যতায় পৌঁছলেন, সেটাও চোখ মেলে দেখতে হয়।

'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থে ইন্দ্রিয়সচেতন তারুণ্যের নিঃসঙ্গ অভিযানের কাহিনী। প্রায় ঝকঝকে তরোয়ালের মতো ঋজু, সংযত শব্দ ব্যবহারে তিনি প্রকাশ করেন এই বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতার প্রতিমা, নানা পুনরাবৃত্তিতে—সঙ্গে সঙ্গে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা জ্যোতির্বিজ্ঞানী উপমায়। এক অর্থে এ পুরনোই বটে— তরুণ কবির এ নিতান্তই প্রথাসিদ্ধ যাত্রারম্ভ, আপাতদৃষ্টিতে। তবু শব্দের তীব্রতায় ও পরিচ্ছন্নতায় আশ্চর্য নতুন। প্রায় একই সময়ে রচিত 'চোরাবালি'-তে সেই অনুসন্ধানী প্রকরণের পরিধি অনেক বিস্তৃত। একবার হয়তো তিনি

ছুটছেন প্রতীক নির্মাণের স্বাবলম্বনে (যেমন ‘ ঘোড়সওয়ার’-এ), আবার হয়তো সময়ের চাপকে মেনে নিয়ে অনুভূতির অবাস্তব ঐক্যকে ভেঙে ফেলে শব্দের ও বাক্‌প্রতিমার আপাত-অসংহতির প্রতিফলনে (যেমন ‘টপ্পা-ঠুংরি’-তে)। কিংবা ‘ওফেলিয়া’ ও ‘ক্রেসিডা’-তে পরোক্ষ ও পরিচিত প্রসঙ্গের স্বকীয় ব্যবহারের কৌশলে। কিন্তু সব কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে এই নবলব্ধ আত্ম-সচেতনতাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

কিন্তু নিছক কবিব্যক্তিত্বের এই নিরবলম্ব নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টায় তো আত্ম-প্রসারণের একটা সীমা আছে। তার ফলে ‘পূর্বলেখ’ বা ‘সাত ভাই চম্পা’য় সেই অবলম্বন খুঁজে নেওয়ার প্রতিজ্ঞায়, ধীরে ধীরে বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক কমিটমেণ্টে, তিনি, খানিকটা যেন কৌশলগত পিছুহটার মতোই, কাব্যপ্রকরণকে সংহত গূঢ়চারী করে তুললেন। উড়ন্ত পাখির ডানা কেটে দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে আনলেন ‘পূর্বলেখ’-তে মৃত্তিকাসন্ধানের সচেতন পরিকল্পনায়। হাল্‌কা ভাসমান বৈদেশিক প্রসঙ্গ ও উপমার বদলে উপনিষদ বা মহাভারতের জগৎ থেকে চরিত্র ও ভারি শব্দ উপর্যুপরি ব্যবহার করে তিনি খানিকটা যেন ধ্রুপদী কঠিন ও নিশ্ছিদ্র গাঢ়তা আনলেন—সনেটের বন্ধনে, অপরিচিত শব্দের প্রাচুর্যে, দীর্ঘ কবিতার পৌরাণিক রূপান্তরে। পরের গ্রন্থ ‘সাত ভাই চম্পা’-তেই আবার সেই ভারকে হাল্‌কা করে দিলেন রূপকথার বা লৌকিক ছড়ার জগতে. ফ্যাশিস্টবিজয়ী রুশ অভিযানের প্রতি সহজ প্রত্যয়ে। কবিতা প্রায় ছুঁতে চাইল বাক্যের স্তবকের প্রতিমার সহজ নিটোল সাবলীলতাকে।

তার পর ‘সন্দ্বীপের চর’-এ, আবার সামনে পা ফেলে ছড়াতে চাইলেন তিনি নিজেকে। আগের পর্বের অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু সহজ উত্তরণে তো তাঁর তুষ্টি নেই। তাই দাঙ্গার তিক্ত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে, ভারতব্যাপী মুক্তিআন্দোলনের গৌরবময় পরিবেশে তাঁর আবেগের কেন্দ্রে যেন বিস্ফোরণ ঘটল। দীর্ঘ কবিতায় শব্দের বাধাবন্ধহারা প্রগল্‌ভতায়, উপমার বিস্তারিত সংগঠনে ও আয়োজনে তিনি তাঁর কবিতার আত্ম-উন্মোচক শব্দ ও প্রতিমাগুলিকে আবিষ্কার করলেন। এই প্রথম শব্দ ও প্রতিমার কিছুটা সঞ্চয়প্রবণ ও পল্লবগ্রাহী প্রাচুর্য থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত নির্বাচন ঘটতে থাকল। কবিকে চেনা যায়, বোঝা যায় এমন সব উপমা, শব্দ—নদী-সাগর, গঙ্গোত্রী-কপিলগুহা বা উমা-সতী এই সব প্রতিমাপুঞ্জ—কিংবা ‘স্বপ্নবীজ’ বা ‘ঊর্মিল-বিপ্লব’-এর মতো ইশারায় ভরপুর প্রতীকোপম শব্দযুগ্ম যেন তৈরি

করে নিচ্ছেন কবি এ-যুগেই।

অর্থাৎ জমি তৈরি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমস্ত চাপটাই বাইরের দিক থেকে। বাইরের ধাক্কায় কবিব্যক্তিত্বের ঢালাই-পেটাই-গড়াই চলেছে মাত্র। কিন্তু এ-পর্যন্ত কবির বিশ্বাসের জগতে মোটামুটি যে স্বচ্ছন্দ ধারাবাহিকতা চলছিল, তা প্রথম ধাক্কা খেল সাম্যবাদী রাজনীতির ইতিহাসের এক বিভ্রান্তিকর অধ্যায়ে। কবির বিশ্বাসের জগৎ সমানই অটুট, অথচ তিনি বিচ্ছিন্ন সহযাত্রী-দের কাছ থেকে। ঠিক এ-রকম ঐতিহাসিক মুহূর্তেই, ভেতরে ভেতরে যখন তিনি প্রবল নাড়া খেয়েছেন, তখনই ঘটল সেই রসায়ন—শব্দের আত্মসচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা প্রস্তুতির অতীত এমন-একটি ঘটনা, যখন সব উপার্জন সংশ্লিষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে একেবারে ভেতর থেকে, তার পর বাইরে এসে বিশ্লিষ্ট হয় যেন রামধনুর সাতরঙের বিচ্ছুরণ। বিশ্বাস ও আবেগকে চূর্ণ করে প্রিজমের মধ্য দিয়ে বর্ণভঙ্গ ঘটিয়ে তিনি যেন প্রত্যেকটি রঙকে বুঝে নিতে চান। তাই কি 'রামধনু' শব্দটি তাঁর এত প্রিয় এই গ্রন্থে, এবং পরেও ?

এইভাবে বেরিয়ে এল স্বতন্ত্র এক ভাষা, কবির নিজস্ব উচ্চারণ। অন্বিষ্ট'-তেই আমরা প্রথম পেলাম কবির উপলব্ধির সম্পূর্ণ জগৎ। তাঁর কাব্যচেতনা ও প্রকরণসিদ্ধির উদাহরণ। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বর। সেই স্বরের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন উচ্চারণ।

বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে, পর্ব-পর্বান্তরের প্রকরণগত নানান চমক সত্ত্বেও, এই প্রাপ্তি বা উপার্জন যেন খানিকটা, অসংলগ্ন নয় বলেই, অনায়াস। এই প্রসঙ্গে আবারও মনে পড়ে যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের কথা। কিন্তু এই বিকাশের আনুপর্বিক সঙ্গী যে পাঠক হন নি, তাঁর আকস্মিক পঠনে অভ্যাস প্রায়শই আহত হয়। ভাষার এই বিকাশলব্ধ, কিন্তু সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত উচ্চারণে অপ্রস্তুত বাঙালি পাঠক তাই দিশেহারা। বিষ্ণু দে-র ভাষার এই নবীনতার কারণেই মাইকেলের দৃষ্টান্ত মনে এসেছে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত-র।[৬] এক-অর্থে ঠিকই। মাইকেলের কাব্যভাষার—প্রবাহমান অমিত্রাক্ষরের—প্রায় বৈপ্লবিক নতুনত্বের কারণেই উচ্চারণ করতে পারেন নি তৎকালীন পয়ারে অভ্যস্ত পাঠকেরা - এমন-কি বিদ্যাসাগর, যিনি গদ্যে ছন্দের সুষমা এনেছিলেন। তাই ক্ষুব্ধ মাইকেলকে বলতে হয়েছিল : My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is. বিষ্ণু দে-র এই নতুন কবিতার পাঠও ভিন্ন। তবু এ পাঠ নতুন কবিতারই

পাঠ। তারই প্রয়োজনে এর জন্ম। এ কথা বলে নেওয়া ভালো, কারণ বিপত্তিটা ঘটিয়েছেন বোধ হয় বিষ্ণু দে নিজেই। রেকর্ডে তাঁর 'ঘোড়সওয়ার' পাঠের কথা বলছি। আগের যুগের কবিতাকে নতুন যুগের উচ্চারণে পড়লে যে জোর খাটানো হয়, উচ্চারণে কালানৌচিত্যের দোষ ঘটে, তা প্রমাণ করেছেন বিষ্ণু দে° নিজেই, 'ঘোড়সওয়ার'-এর অতিপ্রত্যক্ষ নাটকীয়তাকে 'অন্বিষ্ট'-যুগের কথোপকথনের ক্যাজুয়াল উচ্চারণে পাঠ করে। ঠিক যেমন 'অন্বিষ্ট'-র উচ্চারণে শিখিয়েছেন এই নতুন স্বরক্ষেপের মধ্যেই আছে তাঁর নতুন কাব্যভাষার রহস্য।

তাঁর কবিতায় প্রসঙ্গের ঐশ্বর্য যখন জাঁকালো ও নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, অথচ বাইরের আঘাতে দীর্ণ হয়ে ভাষার অন্তর্মুখী প্রত্যয়-বিচ্ছুরণ নতুন নতুন মাত্রা পেতে শুরু করেছে, তখনই তো বাক্যস্রোতে এসেছে ঘন ঘন বিরতি বা বাঁকবদল। ঠিক দ্বিধা নয়, সাবলীলতার উচ্ছ্বাসে অবিশ্বাসী আত্মসচেতন জটিল মনের সততা, আহত সততা। স্বগতভাষণ বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে সংলাপের স্বাভাবিক মন্থর অন্তরঙ্গ সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ বাক্যের একটা আপাতশিথিল কাঠামো।

অর্থাৎ এ-ভাষার সঙ্গে মানুষের কথা বলার ধরনের সাদৃশ্য আছে—হয়তো বিশ্লেষণ করলে পুরনো কলকাতার, কিংবা বাংলাদেশেরই কিছুটা সাবেকি বাক্‌রীতির মৌল রূপের প্রভাবও আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু তা বলে বিষ্ণু দে কখনই মুখনিঃসৃত অসংবদ্ধ অসচেতন বাক্যকে আশ্রয় করেন নি। অর্থাৎ দৈনন্দিন মানুষ যে কথা বলে, তার একটা রূপ আছে—যা খানিকটা সাময়িক, চরিত্রহীন, সহজেই ফ্যাশনের দ্বারা প্রভাবিত, খানিকটা পিছল ও ফিচেল। কিন্তু দৈনন্দিন বাক্‌রীতির অন্তর্নিহিত একটা আলাদা চারিত্রও আছে, আছে তার মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ শক্তি ও স্বাস্থ্য। আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ বহুলাংশে এই দৈনন্দিন বাক্‌রীতির সঙ্গেই যুক্ত। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে অবশ্য প্রশ্নটা এভাবে ওঠেই নি। তিনি তথাকথিত গদ্যছন্দের অস্পষ্টতা বা অনির্দিষ্টতার প্রবল বিরোধী। আবার অন্য দিকে তথাকথিত পদ্যছন্দের সুরেলা ব্যাপারকেও খারিজ করেন। তাঁর কাছে এটা কোনো আলাদা সমস্যাই নয়। যে কবিব্যক্তিত্বে তিনি বিশ্বদৃষ্টির সমগ্রতাকে কবিতায় আনতে চান ভারমুক্ত সহজ কৌতুকে, সেই ব্যক্তিত্বেরই স্বাভাবিক নির্বাচনে বন্ধনের মধ্যেই তিনি আনেন মুক্তি, ছন্দকাঠামোর মধ্যে দৈনন্দিন বাক্‌স্পন্দ। ছন্দের লয় মেনেও কোথায়

যেন এসে যাচ্ছে সহজ বাক্‌ভঙ্গি-উৎসারিত গদ্যোচ্চারণের একটা ঝোঁক। অথচ সেই ঝোঁকটাই আবার অসামান্যভাবে, যেন অন্য এক স্তরে, মেনে নিচ্ছে ছন্দের শৃঙ্খলা। ফলে ছন্দে বা উচ্চারণে তৈরি হচ্ছে একটা বিপরীতের সমন্বয়। ছন্দকাঠামো ও গদ্যস্পন্দের একটা অদ্ভুত টানাপোড়েন। এই সমন্বয় ও টেনশন তো .তাঁর কাব্যভাষার আলগা বৈশিষ্ট্যই নয়, এর উৎস তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞতাতেই। তাঁর কবিতায় যেমন গতির ও স্থিতির, কঠিন ও তরলের সিমফনি তৈরি হয়, তেমনি তারই প্রয়োজনে তাঁর ছন্দেও আসে বাক্‌স্পন্দের এই উচ্চাবচ ভাস্কর্য।

কিভাবে তৈরি করেন তিনি এই ভাস্কর্যের খাঁজ, আলোছায়ার খেলা? কখনো মাত্রাসমাবেশের চলিত রীতি ভেঙে টলিয়ে দেন স্বরেলা উচ্চারণের আবেশকে। কখনো লঘু ও গুরুর যুক্তাক্ষর ও স্বরবর্ণের স্বাধীন বিন্যাসে ধাক্কা দেন। কিংবা কম্পন আনেন আকস্মিক অনুপ্রাসের কৌতুকে। কখনো-বা শব্দনির্বাচনের কৌশলে শব্দার্থের স্বতন্ত্র মর্যাদাতেই দাবি করেন উচ্চারণের স্বতন্ত্র মনোযোগের ধরন। প্রত্যেকটি শব্দ তখন আলগা আলগা পৃথকভাবে উচ্চারিত হতে চায়। একই বাক্য বা বাক্যাংশে বা স্তবকে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় সাজিয়ে দেন। সব মিলিয়ে তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন স্বরের, বা হয়তো স্বর ও স্বরভাঙার একটা শব্দজাল। ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক আবেগ ও উপলব্ধিতে শব্দোচ্চারণের একটি জটিল স্বতন্ত্র রীতি।

> আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
> বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস-যামিনী,
> দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে,
> তোমার সমুদ্রে আর শরীরের তীরে।

অর্থাৎ শব্দব্যবহারের কৌশলেই তিনি নতুন উচ্চারণ সৃষ্টি করেন, সৃষ্টি করেন তাঁর কবিতার নিজস্ব সংগীত। বিষ্ণু দে-র কবিতা প্রসঙ্গে সংগীতময়তার কথা বারবার উঠেছে। বোধহয় এই কারণেও যে সাংগীতিক উপমা বা প্রতিমা তিনি অবিরল ব্যবহার করে চলেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বুঝতে সংগীতবোধ সত্যিই সাহায্য করে নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বভাবতই এই ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য এসেছে মূলত তাঁর শব্দচেতনা থেকেই। সাংগীতিক নানা রীতি তাঁর কবিতার চলনে উপমিত হতে পারে, কিন্তু তা তাঁর শব্দব্যবহারকৌশলের অমোঘ শক্তির বশবর্তী হয়েই এসেছে। সংগীতের স্বরছোঁয়া থাকার ফলে

হয়তো ভিন্ন মাত্রা এসেছে—কিন্তু তাঁর প্রকরণের নন্দনকে ধরতে হলে এই শব্দ-কৌশল থেকেই যেতে হবে সংগীতের দিকে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রাবীন্দ্রিক মাত্রাছন্দকে নিজের স্বরে বাজিয়েছেন বিষ্ণু দে, এই বলে প্রশংসা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।[৭] বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রবহমান মাত্রাবৃত্তের আদি প্রয়োগের কথাও বলেছেন বুদ্ধদেব বসু।[৮] শঙ্খ ঘোষ দেখিয়েছেন, এ তো বাইরের কথা। আসলে প্রথম থেকেই তাঁর প্রবণতা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দসঞ্চার করার তাগিদে ছন্দের সব কটি একককেই অতিক্রম করা।[৯] স্তবক গঠনে, পঙ্‌ক্তির সংখ্যা বা আকার কিংবা পর্বসংখ্যা নির্ধারণে তিনি ভাঙতে ভাঙতে চলেন, বৈচিত্র্য আনেন, দ্রুত ছন্দবদল করেন, এক চাল থেকে আরেক চালে চলে যান, এক লয় থেকে আরেক লয়ে।

শুধু স্তবকের পরিসীমার মধ্যেই নয়—দীর্ঘ কবিতার গড়নেও এই বৈপরীত্যের সমাবেশ। কখনো তা তাই ইওরোপীয় সংগীত সিমফনির গড়নের সঙ্গে তুলনীয়—পয়েণ্ট/কাউণ্টার-পয়েণ্টের মধ্য দিয়েই কবিতারও মুভমেণ্ট। কিংবা কারোর যদি সিমফনির সুনির্দিষ্ট সুনিরূপিত কাঠামোর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ কবিতা সর্বত্র তুলনীয় মনে না হয়, কেউ তুলনা করতে পারেন ফ্যুগ-এর দ্বন্দ্বপ্রবাহের সঙ্গে, যেমন করেছিলেন চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়।[১০] কিংবা ভারতীয় রাগ-সংগীতের মতোই, কারোর মনে হতে পারে, এর গড়ন স্বাধীন ও বিকাশোন্মুখ।[১১] কিন্তু সর্বত্রই, এমনকি শেষোক্ত ক্ষেত্রেও তাকে তিনি উপস্থিত করেন বৈপরীত্যেরই বিন্যাসে।

বলাই বাহুল্য, এই ছন্দ, এই ভাষা, কবিতার এই গড়নই তো তাঁর কাব্য-স্বভাবের অনিবার্য আশ্রয়—বহু বিষয়, বহু মাত্রা, বহু স্বরের জটিল বিন্যাসে গাঁথা কোমলেকঠোরে মন্দ্রিত মহাকাব্যিক কবিস্বভাবের ভাষা। আর তা অর্জিত হয় প্রশান্ত নির্বাচনে নয়—যে কথা বিষ্ণু দে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, দর্জির মাপ নিয়ে জামা তৈরি নয়—জীবনের যে টেনশন বা চাপ থেকে তাঁর কবিতার জন্ম, তারই দাবি এই ভাষা। এক-অর্থে তাই দ্বন্দ্বময় ব্যাপ্ত জীবন থেকেই তিনি কবিতার ভাষা সংগ্রহ করেন। তিনি জানেন, 'এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা'।

১. অরুণ সেন, 'এই মৈত্রী। এই মনান্তর!' আশা প্রকাশনী, ১৯৭৭। বিষ্ণু দে-কে লিখিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র ৩৮ নং চিঠি। পৃ ৮৪।

২. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'কাব্যের মুক্তি'। 'স্বগত', ভারতীভবন, ১৩৪৫ ব। পৃ ৩৪।

৩/৭. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "'চোরাবালি"'। দ্র. ২নং টীকা। পৃ যথাক্রমে ২১০ ও ২১৭।

৪. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র 'ক্লান্তি নেই' প্রসঙ্গে আলোচনা ও সেই সূত্রে বর্তমান লেখকের চিঠি। 'কবিতা-পরিচয়', ২য় ও ৩য় সংকলন, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৭৩ ব।

৫. বুদ্ধদেব বসু-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১ ব। ৪নং চিঠি।

৬. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, 'খরস্রোত নব আনন্দের'। 'দেশ', ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮০ ব।

৮. বুদ্ধদেব বসু, 'বাংলা ছন্দ'। 'সাহিত্যচর্চা', সিগনেট প্রেস, ১৩৬১ ব। পৃ ১০৫-৬।

৯. শঙ্খ ঘোষ, 'বন্ধুর ছন্দের দুর্গে'। 'ছন্দের বারান্দা', চিত্রক, ১৩৭৮ ব। পৃ ৮৬-৮।

১০. 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার পাণ্ডুলিপির কোনো এক জায়গায় পাদটীকাতে নাকি তাঁর মন্তব্য ছিল, কিন্তু ছাপার সময় সম্পাদক তা বর্জন করেন (সূত্র : বিষ্ণু দে-র *Music I live by* শীর্ষক বেতার ভাষণের অনুবাদ। 'পরিচয়', শারদীয় ১৩৮৯ ব)।

১১. দ্র. অরুণ সেন, 'বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতার সাংগীতিক গড়ন'। 'সারস্বত', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১ ব।

কবির জন্ম

১৯০৯—১৯৩৩

‘ভিড়েও নিঃসঙ্গ শিশু পৌঁছে গেল মোহানার প্রান্তিক খাড়িতে’

‘বিষ্ণু দে-র জন্ম ১৯০৯ সালে—কলকাতা শহরে, উনিশ শতকের বঙ্গীয় জাগরণের সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যসম্পন্ন এক যৌথ পরিবারে।’ এই বাক্যের সব কটি তথ্যের ইঙ্গিত গ্রহণ করলেই তাঁর জন্মের যথাযথ পশ্চাদ্‌ভূমি বোঝা যাবে।

প্রথমত, তাঁর জন্ম বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। পরাধীন ভারতবর্ষে। তাঁর জন্মের বছরটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯) আগে বটে—কিন্তু তাঁর শৈশবের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সেই বিশ্বযুদ্ধের অবসান—অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর অব্যবহিত কালটাই তাঁর শৈশবের যথার্থ কাল। এই সময়েই তো ভারতবর্ষ, এবং সেই সূত্রে বাংলা দেশও রাজনীতি-অর্থনীতির দিক থেকে এক নতুন পরিস্থিতিতে এসে পড়ল। সময়টা এক-অর্থে গান্ধীর কাল, ঠিক যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল। কিন্তু সেটা খুব সহজ করে বলাও যায় না আবার। নানা জটিলতায় আবর্তিত সময়। গান্ধীর আত্মপ্রকাশের গৌরবময় কাল যেমন, বাংলা দেশের দিক থেকে, গান্ধী-বিরোধিতারও কাল। এমনকি সে-বিরোধিতা কোনো-কোনো সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও। তা ছাড়া ভারতবর্ষে, বিশের দশকে, যে নানা ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠছিল, তাতেও সময় হয়ে উঠেছিল উত্তাল।

দ্বিতীয়ত, তাঁর জন্ম কলকাতা শহরে। আজকের দিশাহারা কলকাতা নয়, বিশ শতকের গোড়াকার কলকাতা। আজ পরিচয়লোপী মেট্রোপলিস, বিপর্যস্ত দূষিত নোংরা শহর, কিন্তু তখন এই জীবন্ত শহরে এর চেয়ে অনেক বেশি সৌন্দর্য ও অবকাশ ছিল, ছিল গোটা শহরের, এমনকি প্রত্যেক অঞ্চলের আলাদা আলাদা স্থানীয়তার উত্তাপ। তদুপরি উত্তর কলকাতার বনেদি কায়স্থ

পরিবারগুলির মধ্যে একটা জড়ানো ভাব তো ছিলই। বিষ্ণু দে সেরকমই এক পরিবারের সন্তান।

তৃতীয়ত, যে পরিবারে তিনি জন্মান সেই পরিবার ছিল বাংলা দেশের উনিশ শতকের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।[১] তাঁর ঠাকুর্দার বড় ভাই শ্যামাচরণ দে উনিশ শতকের বিখ্যাত পুরুষ। সংস্কৃত কলেজের উল্টোদিকে শ্যামাচরণ দে-র বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রমুখের যাতায়াত ছিল। ঠাকুর্দা বিমলাচরণ দে-ও যুক্ত ছিলেন এই উনিশশতকী আবহাওয়া ও কার্যকলাপের সঙ্গে। এ-ব্যাপারে পারিবারিক গর্ববোধের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বিষ্ণু দে ছোটবেলায়। উনিশশতকী মহাপুরুষদের ও পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে নানা কাহিনী চালু ছিল পরিবারে।[২]

যৌথ পরিবারটি ছিল বৃহৎ। যৌথ পরিবারের অনেক দোষ হয়তো আছে, কিন্তু পরিবার বৃহৎ হলে বিভিন্ন আত্মীয়দের সাহচর্যে যে বিভিন্ন সম্পর্ক ও অনুভূতির জগৎ গড়ে ওঠে, তা শিশুর বিকাশের পক্ষে অনুকূল : এ-কথা অনেক মনস্তাত্ত্বিকই বলেছেন। সেই সৌভাগ্য বিষ্ণু দে-র ছিল। তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখাতেও যৌথ পরিবারের উত্তাপ ও বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কের হৃদ্যতা বর্ণিত হয়েছে।[৩]

বিষ্ণু দে ছোটবেলা থেকেই শারীরিক দিক থেকে খুব রুগ্ন ছিলেন। ফলে শিশুমনের পক্ষে অনুকূল যৌথ পরিবারের পরিবেশে, অনুভূতি ও কল্পনার বিস্তারের যে সুযোগ তা তো ছিলই, তার ওপর ঐ রুগ্নতার জন্যই তাঁর প্রতি স্বতন্ত্র পারিবারিক প্রশ্রয় ও মনোযোগও ছিল। যৌথ পরিবার ও শ্যামাচরণ-বিমলাচরণের ঐ বিরাট বাড়ির ছড়ানো স্থাপত্যে তিনি যেমন ইচ্ছে মতো ঘুরেছেন, বেরিয়েছেন, পড়েছেন, নানা ধরনের স্বাধীনতা পেয়েছেন, তেমনি ছোটবেলা থেকেই তিনি হয়ে পড়েছিলেন লাজুক, স্পর্শকাতর, তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল। এবং ক্রমশই অন্তর্মুখী। কিন্তু, পাশাপাশি, ছোটবেলা থেকেই এর ক্ষতিপূরণ হিসেবেই যেন, তিনি পেয়ে গেছেন মনের জোরও—অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস ও মানসিক স্বাস্থ্য।

বিষ্ণু দে স্কুলে যেতে শুরু করেন একটু বেশি বয়সে—১৯১৯ সালে, দশ বছর বয়সে। ভর্তি হন চতুর্থ শ্রেণীতে। তার আগে বাড়িতে পড়তেন মা-বাবার কাছে। ঐ দশ বছর বয়সেই 'সন্দেশ' পত্রিকায় পদ্যলেখার

প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। সেই ওঁর 'প্রথম রচনা'। এই রচনাটির বিষয়ে বিষ্ণু দে অনেক জায়গাতেই কিছুটা কৌতুক-মিশ্রিত বর্ণনা দিয়েছেন। কৌতুক, কেননা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গরজ, বা তাঁর নিজেরই ভাষায় 'ব্যক্তিত্বের বাইরে নিজস্ব তাড়না' তখনও শুরু হয় নি। 'কি করে লেখক হলুম' এই আত্ম-পরিচয়মূলক রচনায় তাই তিনি পরোক্ষ উক্তি করেন, 'এই চাপের বোধ সব সময়ে এক কবিব্যক্তির মনে থাকবে এমন কোনো নিয়ম নেই, অভ্যাসিকতার বল অর্জনে আত্মীয় বন্ধুর বিবাহপদ্যও সে লিখে ফেলতে পারে, উপলক্ষ্যের তাগিদে অথবা নির্বন্ধে। এমনকি নিছক দশ টাকা পুরস্কারের লোভেও বালক তার প্রথম কবিতা লিখে বালকবালিকোচিত প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় পাঠাতে পারে। এবং পুরস্কারটা না পেলেও কবিতা লেখার বা পদ্য রচনার মজাটা পেয়ে যায় আর লিখে যেতে চায় নিজের নানারকম কৌতূহলের খুশিতে, যদিচ সে খুশি মুখাপেক্ষী হয়—কালোচিতভাবেই—সত্যেন্দ্রদত্তজ বাহারের।'[৪] পরবর্তী আরেক বর্ণনায় এই কাহিনীর তথ্য আরো সম্পূর্ণতা পায়: 'আশ্চর্যের বিষয়ই বটে, আমি আমার পদ্যরচনার প্রথম পর্বকে মনে করতে পারি। ছোটদের একটি নামী পত্রিকায় কিছু চিত্র অবলম্বনে কবিতা চাওয়া হয়েছিল এবং পুরস্কারের উল্লেখও ছিল···আমি চেষ্টায় রত হলুম, অংশত কারণটা এই যে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর লেখাটা একটা চ্যালেঞ্জের বিনয় এবং অংশত, এখন আমি নিশ্চিত [উদ্ধৃতিটি জ্ঞানপীঠপুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণের অংশ], কারণটা এই যে তাতে পুরস্কারের ঘোষণা ছিল। খবর পাওয়ার জন্য ডাকটিকিট সহ লেখাটি এনভেলাপে মুড়ে আমি পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু বলা বাহুল্য জবাব এল না। তবু এটা শুরু করে দিল আমার আবিষ্কারের চেতনা, আমার সেই আবিষ্কারকে লিখে ফেলার মজা, সব রকমের ছন্দে সব রকমের পদ্য লেখার উল্লাসের চেতনা। যদিও তেরো বা চোদ্দ বছরের আগে কিছুই ছাপা হয় নি, কিন্তু আমি জেনে গেছি লেখা ব্যাপারটা উত্তেজনা ও আবিষ্কারে ভরপুর, ঠিক যেন রুশ স্তেপভূমিতে বালক ছুটিয়েছে ঘোড়া।···কোনো কোনো জ্যেষ্ঠ লেখক তরুণ বালকের ছন্দের দক্ষতাকে প্রশংসাও করতেন। এখন আমি যখন পেছনে ফিরে তাকাই সেই যৎকিঞ্চিৎ বাকপটু পদ্যরচনার দিনগুলোর দিকে, তখন নিজেকে অন্তত ধন্যবাদ দিই এই জন্যে যে কোনো এক নাটকীয় আতিশয্যের ঝোঁকে আমি প্রায় দুশো পৃষ্ঠার কুশলী পদ্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম।'[৫]

পদ্যরচনার অবিশ্রান্ত মজা থেকে ক্রমশ এক পা করে-করে তিনি বোধহয় প্রবেশ করেছেন কবিতার জগতে, ক্রমশ অর্জন করেছেন আত্মপ্রত্যয়. অন্তত ছাপানোর কথা ভাবছেন প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায়। 'এমনকি জিজ্ঞাসু—আর যশোলিপ্সুও বটে—আত্মপ্রসাদে একটি রীতিমতো পদ্যরচনা [রামমোহন রায় সম্পর্কে সনেট] প্রবাসীর মতো তখনকার উচ্চবর্ণ পত্রিকায় পাঠিয়েও দেয়। আর একটু অবাকই হয়—যখন ডাকটিকিটটাও ফেরৎ আসে না। উল্টোদিকে আবার অবাক হয়ে যায়—কিছুকাল পরে বিচিত্রা পত্রিকার কান্তিচন্দ্র ঘোষের স্বতপ্রবৃত্ত উচ্ছ্বাসে। যেমন খুশি হয় ঢাকার প্রগতি পত্রিকার বুদ্ধদেব বসুর বিস্মিত চিঠি পেয়ে অথবা কল্লোল-এর দীনেশ দাশ ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তর সমর্থনে।'[৩] কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসব তাঁর নিজেরই ভাষায় 'ছন্দমিলের পালা-কীর্তন' ছাড়া তো আর কিছুই নয়।

অবশ্য ইতিমধ্যেই কিছুটা স্থানাভাবের এবং অন্য নানাবিধ পারিবারিক কারণে বিষ্ণু দে-র পিতা নিজের সংসার নিয়ে উঠে এলেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের ছোট বাড়িতে।[৫] সম্ভবত সেটা ১৯২২ সাল। বিষ্ণু দের বয়স তেরো। যৌথ পরিবারের উত্তাপ থেকে সরে আসার ক্ষতিটা সুদে-আসলে পূরণ হয়ে গিয়েছিল পিতার অন্তরঙ্গ সাহচর্যে। এই অত্যন্ত সুপুরুষ এবং স্বভাবের দিক থেকে দৃঢ় ও কোমল ব্যক্তিটি কিশোর-পুত্রের মন গড়ে তোলার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিলেন। প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না তাঁর পুত্রদের প্রতি। তাদের পড়াতেন ধৈর্য সহকারে, আবার বন্ধুর মতো কথাবার্তাও চলত, এমন কি মাঝে-মাঝে নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্কও। সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন উদার—এমনকি শিক্ষার ব্যাপারেও। তাঁরই আনুকূল্যে বিষ্ণু দে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বই কিনে কিনে একটা নিজস্ব লাইব্রেরিও গড়ে তুলেছেন শৈশবে। পুত্রের কবিতারচনাতেও তাঁর যথোচিত আগ্রহ ছিল। পুত্রও পরিণত বয়সে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন পিতার সহজাত রুচি ও সাহিত্যজ্ঞানের বিষয়ে। সংবেদন গড়ে-ওঠার এই পর্বে পিতাই বোধহয় সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিলেন—তিনি নিজেই বলেছেন কথোপকথনের ভাষ্যে: 'আমি যা কিছু হতে পেরেছি, যা আমার মনে ইচ্ছে ছিল হবার—সবটা নিজের জীবনে সফল হয় নি নিশ্চয়—কারুরই কখনই তা হয় না—তবু যতটুকু আমি করতে চেষ্টা করেছি এবং সফল হতে পেরেছি সেটা বাবা আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বলেই।'[৮]

প্রভাবের দিক থেকে এর পরই বিবেচ্য তাঁর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা। বিষ্ণু দে প্রথমে ভর্তি হন বাড়ির কাছে মিত্র ইনস্টিটিউশনে, স্কুলজীবনের শেষ দুটি বছর সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে। বিষ্ণু দে পরীক্ষার রেজাল্টের বিচারে কোনো সময়েই অসাধারণত্বের পরিচয় দেন নি, নিজেরই ভাষায়, তিনি ছিলেন 'পরীক্ষার নীচের তলার ভাড়াটে'।[৯] অথচ এ-সময়েই শুরু হয়ে গিয়েছিল নানা বিষয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা ও পড়াশোনার অভিযান। পদ্যরচনা। ফলে কোনো কোনো শিক্ষক তো ছিলেনই, যাঁরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য এই বালক বা কিশোরটির প্রতি শুধু স্নেহই অনুভব করতেন না, তাঁর হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তিকে দিতেন প্রায় সাবালকত্বের মর্যাদা।

মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর। খুব তারিফ করতেন ছাত্রের লেখা। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়। তখনই চিত্রকলার ব্যাপারে ছাত্রের উৎসাহ দেখে আর্ট-অ্যালবাম কিনে দিতেন। সর্বোপরি ছিলেন পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। স্বরচিত 'চার্বাক দর্শন' উপহার দেন সমুৎসুক ছাত্রকে। নানা বিষয়ে তর্ক এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নানা আলোচনা হত ওঁর সঙ্গে পড়ার সময়।[১০]

বাল্যবয়স থেকেই এই যে আত্মীয়পরিজন, শিক্ষক এবং সর্বোপরি পিতার কাছ থেকে বয়স্কমর্যাদালাভ এসবই নিশ্চয়ই বিষ্ণু দে-র মানসিক গঠনকে ত্বরিত এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং খুব অল্প বয়সেই পরিণত রচনা লিখে যে তিনি অনেককে বিস্মিত করেছিলেন, তা ঘটতে পেরেছে।

কিন্তু মনের এই সুখী ও স্নিগ্ধ পরিবেশ ব্যাহত হতেও শুরু করেছিল এই বয়স থেকেই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সম্পর্কিত রচনা পাঠান্তে বালক বিষ্ণু দে 'প্রচলিত শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা' অনুভব করে স্কুল ছাড়তে চেয়েছিলেন। তখনও সহৃদয় পিতা ক্রুদ্ধ হন নি, শাসন বা হুকুম করেন নি—পুত্রের সঙ্গে বয়স্ক মতবিনিময় করেছেন। বড় জোর নিজের বন্ধুবান্ধব বা শুভানুধ্যায়ী মারফৎ বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু জোর খাটান নি। আর তারই ফলে বিষ্ণু দে রয়ে গেলেন স্কুলে।[১১] সংকটটা গৌণ ছিল বলেই হয়তো তার নিরসন হতে পেরেছিল পিতার এই আচরণের ধরনেই শুধু নয়, অন্য নানাবিধ স্বাধীনতালাভে —বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডায় যাওয়া-আসা, বয়সে-বড় বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদি নানা নতুন অভ্যাসে গড়ে-ওঠা আত্মপ্রত্যয় ও মানসিক পরিপক্কতার

অধিকারে।

আর প্রায় তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল তাঁর নান্দনিক যাত্রারম্ভ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভাবিত বা বিবিধ কল্লোলীয় হাওয়া ছেড়ে তিনি বেছে নেন প্রমথ চৌধুরীর প্রকরণের জগৎ। লেখা হতে থাকে 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর কোনো-কোনো কবিতা, 'চোরাবালি'-র বেশ কিছু 'লঘু' কবিতা—ট্রিয়োলেটগুচ্ছ। শিল্পসাহিত্য বিষয়ে নানা প্রবন্ধ তো বটেই, এমনকি গল্পও লিখছেন তখন প্রমথ চৌধুরীর আদলে। ক্রমশই তন্ময় হয়ে উঠছেন নিজের সাহিত্যিক ব্রত বিষয়ে।

বিষ্ণু দে-র জীবনের একটা বড় সংকটও কিন্তু দেখা দিল তাঁর লেখার এই উর্বর সময়েই। সংকটের বীজ নিশ্চয়ই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই অল্পবিস্তর ছড়িয়ে ছিল। নানা বৈপরীত্যে টালমাটাল সেই পরিবেশে। গান্ধীজীর আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদ দুটোরই সহজ-অসহজ রূপ এই বাংলাদেশে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তো ঘুরেফিরে আসেই। বিষ্ণু দে-র নিজেরই ভাষায়, তখন 'গান্ধীজির নীতির গোধূলি' এবং 'রবীন্দ্রনাথের সমর্থ নিভৃতিতে লালিত খোলাহাওয়ার ধ্যানধারণা'।[১২] শ্রমজীবীর আন্দোলনও ক্রমশ দানা বাঁধছে। 'যন্ত্রণার মুঠিতে···আস্থা আর হাজার কাটাকুটিতে আঁকা আশা।'[১৩] ১৯২৭-এর 'নৈরাশ্যের বছর' যেন ১৯২৮-এ এসে হয়ে উঠল উদ্দীপনাময়।

রাজনৈতিক-সামাজিক সচলতার এই সময়টিতেই যখন তিনি ক্রমশ সৃজনের আনন্দে ভরপুর, শৈশবের 'অন্তর্মুখী' মন হয়ে উঠছে 'নানা জ্ঞানে দ্বিধাহীন'—তখনই আবার চারপাশের ক্লিন্ন পরিবেশের বিরুদ্ধতায় তাঁর শৈশবের শালীনতা ও শুচিবোধ আহত হচ্ছে প্রবলভাবে। শরীর ও মনের দ্বন্দ্বের চেহারা তিনি যেন এই প্রথম উপলব্ধি করছেন। সৃজনের উল্লাসের মুহূর্তেই আহত সংবেদনের এই আর্তি সমস্ত স্নায়ুতে ঘা দিচ্ছে। তাঁকে এনে ফেলছে গভীরতর সংকটের মধ্যে। সেই সংকট দাবি করছে নন্দনের আরো কোনো লিপ্ততা।

সংকটমুক্তি যেমন কোনো একটি ঘটনার আশ্রয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে—সংকটবরণও তেমনি শুরু হতে পারে কোনো ব্যক্তিগত আপাততুচ্ছ অভিজ্ঞতার ঘটনায়। এমনকি তা হতে পারে পরীক্ষার আগের রাত্রে প্রতিবেশী যুবকের লাম্পট্যে ব্যথাহত মা এবং তরুণী বধূর বেদনার্ত করুণ চোখ দেখেই—স্নায়ুকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে এমনই দৃশ্যের স্থূলতা ও কারুণ্য। বিষ্ণু দে-র নিজেরই ভাষ্যে জানতে পারি, 'এই দৃশ্যটাতে আমি খুব শক্‌ড হই। পরের দিন পরীক্ষা দিতে পারি নি। এক বছর রাত্রে ঘুমোতে পারি নি। লিখে লিখে কবিতা ছিঁড়ে
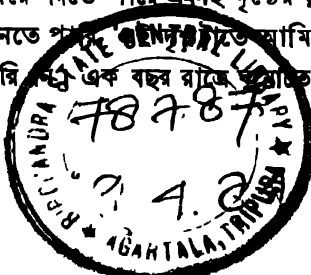
ফেলে দিয়েছি।'[১৪] পরে অন্য প্রসঙ্গে লেখেন, 'হ্যাঁ, আমার মধ্যেও ছিল সংকট বা ক্রাইসিস। খানিকটা যেন আততির হর্ষে স্নায়ুর ছিলার টান। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে আমি শারীরিক দিক থেকে ছিলুম চমৎকার, কিন্তু নিদ্রাহীন।'[১৫]

প্রায় বছরখানেক এই নিদ্রাহীন মানসিক চাপের মধ্যে কাটাবার পর হঠাৎই যেন তার মুক্তি ঘটল তাঁর হাত দিয়ে কবিতার দশটি লাইন লেখার সঙ্গে সঙ্গে। ঐ লাইন কটি পরবর্তীকালে বিখ্যাত 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় তিনি জুড়ে দেন। শৌখিন রচনার পর্ব থেকে লেখার একনিষ্ঠ ব্রতে পৌঁছনোর ইতিহাসকে বিষ্ণু দে নিজেই বিবৃত করেছেন এই ভাবে: 'এই ছন্দমিলের পালাকীর্তনের পরে এল বিনিদ্র "জন্মাষ্টমী"-র শেষাংশের আরম্ভের অসম্পূর্ণ গোটা দশেক লাইন। · কিন্তু ঝোঁকটা বোধহয় অন্তরঙ্গই ছিল, কারণ সবটাই সম্পূর্ণ হয়ে গেল প্রায় বছর দশেক পরে হঠাৎ এবং প্রাথমিক দশ লাইন স্বতই এসে গেল বিলক্ষণ দীর্ঘ কবিতা "জন্মাষ্টমী"-র…।'[১৬] ঠিক একই কথা অন্যত্র লিখছেন: 'আমার মনে পড়ে কিভাবে আমার চতুর সাবলীল রীতির কবিতার মেজাজ রূপান্তরিত হল প্রকাশভঙ্গির দ্বিধান্বিত কিন্তু আবিষ্কার-উন্মুখতায়। আরো মনে পড়ে কিভাবে এক রাত্রে লাইন দশেক চলে এল প্রায় স্বয়ংক্রিয় লিখনভঙ্গিমায়—প্রায় ৮/৯ বছর পরে সেই লাইনগুলোই 'জন্মাষ্টমী' নামক অতিশয় দীর্ঘ কবিতার মধ্যে এসে গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এবং সক্রেটিস-খ্যাত ডিয়োটিমার উদ্দেশ্যে নাটকীয়ভাবে সম্বোধিত অন্ধকার যাত্রা-বিষয়ক আরো আগের একটি কবিতাও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।'[১৭] 'জন্মাষ্টমী' সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯৩৬ সালে—সুতরাং সেই 'অন্তরঙ্গ ঝোঁকে' রচিত অংশটির সময়সীমা, দু-এক বছর আগে পিছে ধরলে, ১৯২৮-২৯-৩০ সালের মধ্যেই হবে—অর্থাৎ যে বছরগুলিতে কবির মানসিক সংকট ও তার উত্তরণের চাপ খুব বেশি বাস্তব ছিল। 'এই প্রথম সংকটযুগের গোড়ার দিকেই লেখা হয় "উর্বশী ও আর্টেমিস"-এর সেই সব কবিতা, "চোরাবালির" র কিছু কিছু ভের দ সোসিয়েতে মার্কা লঘু কবিতার পরের লেখা, যাতে লেখকের লিখনচৈতন্যও ছিল সংকটদীর্ণ কিন্তু আবার উল্লসিতও, ভাষাও ছিল তাই দ্বিধান্বিত কিন্তু স্বাধিকৃত. ছন্দে মিলে কর্তৃত্ব হয়তো সময়ে-সময়ে মনে হয় গৌণ—প্রচ্ছন্ন একটা মুক্তিবোধের নন্দিত চৈতন্যে, কিন্তু যে মুক্তি ছিল অনিদ্রাতত স্নায়ুর জ্যা-মুক্তি।'[১৮]

'অন্ধকার যাত্রা-বিষয়ক আরো আগের একটি কবিতা' বলে যেটি উল্লেখ

করেছেন বিষ্ণু দে, তার কথাই প্রথমে ধরা যাক। কবিতাটির নাম 'যাত্রা'—'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর ১ম সংস্করণে স্থান পেয়েছিল। পরে ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর যে কবি নিজেকে মনে করেছেন 'মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক, সেই কবিই এখানে কঠিন একাকীত্বের মুখোমুখি হয়েছেন।

অমাবস্যা-তমিস্রারে দুইহাতে ঠেলি ঠেলি কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের মাঝে পথ করি
চলিয়াছ সঙ্গীহীন কি উদ্দেশে কঠিন যাত্রায় ?
নাহি ভয় রজনীর,
বিজনের, পৃথিবীর, আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নাহি তব, হৃদয় আমার ?
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, জীবনের নাহিকো ঠিকানা
জনশূন্য সিক্তবালু সৈকত-উপরি
চলিয়াছ স্থিরদৃষ্টি একা।
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, শুধু আছে আকাশ-ছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রূর হাসি আঁধারের।

কঠিন উদ্দেশ্যহীন সঙ্গীহীন এই যাত্রায় কিন্তু একাগ্রতা ও তীব্রতার কোনো অভাব নেই—তাই 'চলিয়াছি স্থিরদৃষ্টি একা' এবং এ যাত্রাকে বলা হয়েছে 'অসিধার ব্রত', অসির ভয়ংকর ধারের উপর দাঁড়িয়ে ব্রতপালনের নিষ্ঠা। বৈপরীত্য এখানেই যে সেই ব্রতের কোনো লক্ষ্য নেই এবং যে-অন্ধকার সঙ্গীহীন, দ্বান্দ্বিক পরিহাসে সেই যাত্রাকেই বলা হয়েছে 'অভিনব জয়যাত্রা' এবং অন্ধকারেই সন্ধান পাওয়া গেছে 'রাত্রি-আঁধারের উদ্দাম প্রণয়'। বৈপরীত্যের এই তীব্রতাতেই কবি বলেন:

তুমি শোনো নাই বুঝি গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সংকটের তীব্র আর্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র করিছে একেলা ?

উদ্দেশ্যহীন অন্তহীন নিঃসঙ্গ যাত্রায় বাধ্যতামূলক এই অংশগ্রহণ—'এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তি-দেশে/যাত্রা কভু যাবে না থমকি'—এর মাঝখানে কবির প্রত্যাশা শুধু গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে এই নিষ্ফল যাত্রা রোধ করার, ক্ষান্ত করার 'মিনতি'-তে। সংকটমোচনের জন্য এই আকুতিই সক্রেটিস-খ্যাত

প্রেরণাদাত্রী ডিয়োটিমার প্রতি সাহায্যপ্রার্থনায় আবেদনে রূপ পায়।

'জন্মাষ্টমী' কবিতার যে লাইন দশেক অংশটির কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন, তাকে এবার চোখের সামনে আনা যাক।

অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাট পার্থায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, নির্বর্ণ, নির্মেঘ ;
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধকণা পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর।

বলা বাহুল্য, আত্মপ্রকাশের ও সত্তার যে সংকটে পীড়িত ছিলেন কবি, সেই সংকট-চেতনার ও মুক্তির সাক্ষ্য লাইন কটি। বিষ্ণু দে-র এই নিদ্রাহীন সংকট ও সংকট-মোচনের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিতে পারে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র কবিকে এবং সে-বিষয়ে বিষ্ণু দে-র নিজস্ব ব্যাখ্যাকেও।[১৯] সেই ব্যাখ্যায় জানতে পারি কিভাবে আত্মপরিচয়ের কৈশোর-সংকট এড়িয়ে 'দ্বিধান্বিত কবির চরণ মুক্তি পেল বিশ্বসাহিত্যের খেলা দরবারে' এবং ব্যক্তিপরিচয় ও কবিপরিচয়ের অভিন্নতার বোধে। কিন্তু এ-যুগের কবির কাছে মুক্তির উল্লাস ভাষা পায় বৈপরীত্যের চেতনার জমিতে—তাই 'স্থবির রাত্রি'-র পাশে 'আবেগ', 'দ্বারকার দস্যুভয়'-এর পাশে 'ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর'। এবং সবাকে ছাপিয়ে প্রতীক্ষার স্থৈর্য, যে প্রতীক্ষার কথা বারবার ফিরে এসেছে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থের অনেক লাইনেই। এই বৈপরীত্যের এবং প্রতীক্ষার টেনশনের পরোক্ষতাতেই তিনি মুক্তি পান সংকটের ব্যক্তিগত থেকে।

এই সংকটমুক্তির কালে যে-প্রভাব বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচেয়ে কাজ করেছিল, তা হল টি. এস. এলিঅটের প্রভাব। এই প্রভাব কাজ করে গেছে দীর্ঘকাল যদিও তা ক্রমশই গ্রহণেবর্জনে হয়ে উঠেছে খুব জটিল—কিন্তু সে তো পরের কথা। ১৯৩০ সালের আগেই এলিঅটের রচনার সঙ্গে বিষ্ণু দে-র

যে সাক্ষাৎকার, সে-ঘটনা তিনি বিবৃত করেন এই ভাবে : 'তারপর এল আকস্মিক-ভাবে আমাদের পটলডাঙা পাড়ার পুরোনো বই-এর কারবারী ইউসুফ-এর দাক্ষিণ্যে'এলিঅটের "দি সেকরেড উড" আর "পোয়েমস ১৯২৫"। পুরোনো কিন্তু শস্তা—টাকা টাকা। কিন্তু প্রায় আনকোরা অবস্থায়। এলঅট সাহেবের নামটা আগেই জানতুম, কবিতা পড়েছিও গোটাকয় মার্কিন কবিতার সংকলনে…। তখনও তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা "দি ক্রাইটেরিঅন" চোখে দেখি নি।'[২০] আর-এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, সংকটমুক্তির পর দ্বিতীয় পর্ব এই এলিঅট-আবিষ্কার—'টি. এস. এলিঅটের "কবিতাবলী ১৯২৫" এবং "সেকরেড উড", আমার ঐ নব-আবিষ্কারই কি বিকাশের দ্বিতীয় পব ছিল না?'[২১] ঐ প্রবন্ধে প্রসঙ্গান্তরের পর আবার তিনি লিখলেন, 'আবাব আমি স্মরণ করি এখানে টি. এস. এলিঅটকে। তাঁর "ঐতিহ্য ও ব্যক্তিক গুণপনা" আমাকে আমার বিকাশে সাহায্য করেছিল প্রচুর।'

এলিঅটের কাব্যের প্রকরণও বিষ্ণু দে-কে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই এবং তার সাক্ষ্যও রয়েছে অনেক এ-সময়ের কবিতায়—কিন্তু এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, এলিঅটের কবিতার ও কাব্যনন্দনের ঐতিহাসিক প্রেরণাই বিষ্ণু দে-র কাছে তো বটেই, সে-যুগের আরও কারো কারো কাছে প্রধান ব্যাপার ছিল। সেজন্যই তিনি বলেছেন, 'বাংলা দেশে এলিঅট'[২২], বারবার উল্লেখ করেছেন তৎকালীন সাহিত্যিক বা এমনকি রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক পরিবেশে এলিঅটের ভূমিকার কথা। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত উভয় প্রয়োজনেই এলিঅটের কাব্যতত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিকতা ও আত্মসচেতনতার চর্চাই তিনি জরুরি মনে করেছিলেন। 'ছন্দমিলের পালাকীর্তন' শেষ করে পথ-সন্ধানের এই সংকট-পর্বেই তিনি এলিঅটকে পেয়েছিলেন সংকটমুক্তির সহায়ক প্রেরণা হিসেবে, তাঁর কাব্যে ও কাব্যতত্ত্বে উভয়তই।

ঠিক এই সময়েই, এলিঅটের ঐতিহাসিক প্রেরণার সমকালেই যে-সব সমধর্মী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্বের সূত্র এই এলিঅট-ই। তিনি লিখেছেন, 'অচিরে সামাজিক সম্পর্কের সুযোগে জানতে পারলুম যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীন্দ্রনাথ এই কবির ও সমালোচকের [এলিঅটের] মুগ্ধ পাঠক। কৌতূহল থেকে, বলা যায়, এলিঅট-পাঠের নন্দিত উত্তেজনা থেকে হল সামাজিক সম্বন্ধোত্তর সাহিত্যিক সৌহার্দ্য।'[২৩] এরকমই আরেকজন ছিলেন 'চারুচন্দ্র দত্ত মশায়ের

জামাতা অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ'—'এলিঅটের জগতের সঙ্গে পরিচয় ছিল' তাঁর।[২৪]

বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র সঙ্গে তাঁর এলিঅট-কেন্দ্রিক মতবিনিময় এবং ক্রমশ নিবিড় সৌহার্দ্য কবিতারচনার প্রথম পর্যায়ে যে অসামান্য সহায়তা দান করেছিল, সে-কথা বিষ্ণু দে পরিণত জীবনেও বারবার স্মরণ করেছেন। বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন তিনি সুধীন্দ্রনাথ-রচিত 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধটির—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ঘরোয়া ছাত্রসভায় পঠিত এই প্রবন্ধের প্রাথমিক ভাষ্যেই এলিঅট-বিষয়ে 'কলকাতার প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা'।[২৫]

বিষ্ণু দে-র উপর এলিঅটের প্রভাব সম্পর্কে নানারকম অতিশয়োক্তি এড়ানো যাবে যদি আমরা ঘটনাটিকে এইভাবে ঐতিহাসিক ক্রমে দেখি। কেননা সে-যুগেও এলিঅটের কবিতার প্রভাব তাঁর উপর ছিল খুবই বহিরঙ্গ—কিছু প্রকরণ বা কলাকৌশলকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রথম থেকেই তাঁর পথের ভিন্নতা সম্পর্কে এখন আর কারোরই সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই সময়ে এলিঅটের নান্দনিক অনুপ্রেরণা তাঁর কাছে একটা বাস্তব ব্যাপার—পরবর্তীকালে এলিঅট সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র যে সমালোচনামূলক বা দ্বান্দ্বিক মনোভাব গড়ে ওঠে, তার প্রাসঙ্গিকতা ছিল না তখনও। পথ সন্ধানের তীব্র সংঘাতে ও আলোড়নে এলিঅটের সঙ্গে পরিচিতিই তাঁকে উচ্ছ্বসিত করেছিল। 'এলিঅটের সেকরেড উড-এর অন্তত দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য পাশ্চাত্যের অনেকের মতো আমাদেরও কাউকে কাউকে বেশ অনুপ্রাণিত করে এবং এইরকম আলোকিত ধাক্কা ফলপ্রসূ হয়— অন্তত তাই আশা করেছিলুম—কারণ তখন মনে হয়েছিল এই রকমই তো আমরাও ভাবতে চেষ্টা করেছিলুম। এবং তাঁর 'দি ওয়েস্টল্যাণ্ড' নামক তখনকার দীর্ঘতম কবিতাটি বিচলিত করে এত গভীরভাবে যে লাইনগুলো ঘরে-বাইরে ট্রামে-বাসে মনে গুঞ্জরিত হত, এমনই জাদুর ভয়ঙ্কর লিরিক্‌ল্ শক্তি, একটা ঘোরের মধ্যে বহুকাল কাটে তীব্র নান্দনিক আততিতে।'[২৬]

এলিঅটের আবির্ভাবের মুহূর্তটিকে তাহলে বুঝে নেওয়া দরকার কবি-ব্যক্তিত্বের ঐ নানা চাপের ইতিহাসে। বিশের দশকেই তাঁর সত্তার ঐ নিদ্রাহীন সংকট। সংকটমুক্তির সঙ্গে-সঙ্গে এলেন এলিঅট। 'স্নায়ু তখন এক পাহাড়ের চূড়ায়'।[২৭] এলিঅটের পরে পরেই যিনি এলেন তিনি বেঠোফেন। বেঠোফেনের নাইন্‌থ্ সিমফনির প্রভাবের কথাও বলেছেন বিষ্ণু দে—'জন্মাষ্টমী'

কবিতাটিও শেষ হয়েছে স্নায়ুর মুক্তির ঐ উল্লাসে। 'বেঠোফেনের অন্তিম সংগীতের আলোয়'।[২৮]

এর পাশে-পাশেই চলেছে সাহিত্য-শিল্প-সংগীত বিষয়ে বিষ্ণু দে-র ব্যাপক আগ্রহ ও চর্চার অভিযান। দু-হাত মেলে যেন তিনি মানবসভ্যতার সমস্ত সম্পদকে আহরণ করার শক্তি অর্জন করে চলেছেন। সাহিত্য তো বটেই। 'পেশাদার ছাত্রের খ্যাতি'[২৯] ছিল না, কিন্তু স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের উদগ্র পাঠক—সে-সময়ের বন্ধুদের ভাষায় 'বইয়ের পোকা'। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পুরাণের মধ্যে ডুবে আছেন তিনি, যার পরিচয় আমরা পেয়েছি প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে। একদিকে প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগের ইওরোপীয় সাহিত্যের চরিত্র বা ঘটনা, অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্য-এর বিস্তৃত জগতে তিনি বসবাস করছেন গভীর পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি নিয়ে - তার চকিত উল্লেখ নানাভাবে এসে পড়ছে কবিতায়। বাংলা কবিতার সামগ্রিক ইতিহাস-পঠনের অভিজ্ঞতাও সেখানে। চিত্রকলা ও সংগীতের কালানুক্রমিক জ্ঞানও তিনি অর্জন করতে চান। বলা বাহুল্য দেশ ও বিদেশের সমস্ত শিল্প-অভিজ্ঞতাই। আধুনিক নাগরিক শিল্পই কেবল নয়, লোকশিল্প বা লোকসংগীতের সমঝদারিতেও গভীর আগ্রহ। শুধু শিল্পসাহিত্যই নয়, জ্ঞানের সংসগ্নতার বোধে, নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞানভাবনা সবের দিকেই তার উৎসুক চোখ গিয়ে পড়ে। অমলেন্দু বসু এজন্যই বলেছেন প্রসঙ্গক্রমে, 'তাঁর ছিল জ্ঞানার্জনের বিষয়ে ডনের মতোই "hydroptique thirst" এবং নিজের অধীনে আনতে চাইতেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবটুকু না হোক অনেকটাই।'[৩০] বলা বাহুল্য, এই পাঠতৃষ্ণা বা জ্ঞানতৃষ্ণা বা রুচি-অর্জনের তৃষ্ণা তাঁর স্বভাবের ভেতরকার প্রেরণাতেই ঘটেছিল এবং আরও পরে এই সমগ্রতার সন্ধান যথার্থ মুক্তি পেয়েছিল মার্কসবাদের সাযুজ্যে।

১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে তিনি 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'-'বিচিত্রা' কিংবা 'ধূপছায়া' পত্রিকায় লিখে চলেছেন স্বদেশী ও বিদেশী চিত্রকর-ভাস্করদের সম্পর্কে প্রবন্ধ, বিদেশী সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ।

১৯৩১ সালে বেরোয় 'পরিচয়'—সম্পূর্ণ নতুন মেজাজের পত্রিকা—'বাংলা দেশের ক্রাইটেরিঅন'—বুদ্ধির প্রখর দীপ্তিতে উজ্জ্বল। বাইশ বছরের যুবক বিষ্ণু দে এলেন 'পরিচয়'-এর আড্ডায়—প্রায় প্রথম থেকেই। ইতিমধ্যেই অবশ্য 'প্রগতি'-তে

বেশ কিছু এবং 'কল্লোল'-এ সামান্য কয়েকটি লেখা বেরনোর সুবাদে তিনি বোধহয় কিছুটা 'কল্লোল'-এর লেখক বলেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন। অন্তত 'কল্লোল'-এর কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা 'পরিচয়'-গোষ্ঠী জানতেন। হিরণকুমার সান্যাল তাই 'পরিচয়'-এর গোড়াকার কথা বলতে গিয়ে লেখেন, 'কল্লোলের পাতায় ও আপাতদৃষ্টিতে কল্লোলী ঢঙে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন বিষ্ণু-দে'[৩১]- কথাটা অবশ্য ঠিক নয়—কিন্তু বিষ্ণু দে 'কল্লোল' বা কল্লোল-জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গোপন করেন না 'পরিচয়'-এর নবলব্ধ বন্ধুদের কাছে।

কিন্তু 'পরিচয়'-এর জগতই তো তাঁর আরো কাছের। যে আত্মসচেতনতার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর 'ফ্রেঞ্চ ভার্স ফর্ম' নিয়ে, সেই আত্মসচেতন আধুনিকতার সন্ধানই তো 'পরিচয়'-এর লক্ষ্য। কিংবা জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায়, শিল্প-সাহিত্যের নানা জিজ্ঞাসায় বিষ্ণু-দের যে চর্চা ও অভিযান শুরু হয়েছিল, তার পরিগ্রহণ তো ঘটতে পারে এখানেই। কিন্তু 'পরিচয়'-এর একান্ত একজন হয়েও বোধহয় তফাৎ ছিল অন্যদের সঙ্গে—বুদ্ধি ও মননের চর্চার সঙ্গে-সঙ্গে তার বাইরে মানবজীবনের আঁকাড়া বাস্তবের সৃজনও টানত তাঁকে।

এই পরিগ্রহণের অভিযানে বন্ধু ও শিক্ষকের ভূমিকা ছিল তাঁর কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকের। বিষ্ণু দে বি. এ. পড়েছিলেন সেণ্ট পলস কলেজে (১৯৩০-৩২)। সেণ্ট পলস কলেজের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক শুধু তাঁর জ্ঞান-চর্চার পরিধিকেই বিস্তৃত করেন নি, তাকে উৎসাহিত করে তুলেছেন সংগীত বিষয়ে, পাশ্চাত্য সংগীত বিষয়ে। এর মধ্যে দুজনের নাম তিনি কয়েকবারই করেছেন: রেভারেণ্ড সি. সি. মিলফোর্ড এবং অধ্যাপক এইচ. ক্র্যাবট্রি। তবে সবচেয়ে বেশি ছিল ইতিহাসের অধ্যাপক ক্রিস্টোফর একরয়েডের প্রভাব, যিনি তরুণ বিষ্ণু দে-কে, অবশ্যই নিজের মতো করে, চিনিয়েছিলেন আধুনিক ইতিহাস ও মার্কসবাদের জগৎ।[৩২] ইওরোপীয় ক্লাসিকাল সংগীতের প্রতি বিষ্ণু দে-র আকর্ষণও গড়ে ওঠে প্রধানত তাঁর সাহচর্যে। মিলফোর্ড, একরয়েড বা ক্র্যাবট্রি প্রত্যেকেই বিভিন্ন বাজনা বাজাতে জানতেন। কলেজের চ্যাপেলে অর্গানে বাখ বাজিয়ে 'পাশের ঘরের ছাত্রকে চকিত করে' তুলতেন অধ্যাপক ক্র্যাবট্রি।[৩৩] মনে হয়, যে-পাশ্চাত্য সংগীত বিষ্ণু দে-কে সারাজীবন অনুপ্রাণিত করে রেখেছিল পরবর্তী জীবনে, কবিতা-রচনাকেও প্রভাবিত করেছিল, সেই

সংগীতানুরাগের প্রকৃত শুরু এখান থেকেই। সেন্ট পলস কলেজের দিনগুলি তাঁর মনের বিকাশে অনুকূল পরিবেশই তৈরি করেছিল। ১৯৩২-এ এখান থেকেই তিনি বি. এ. পাশ করেন, স্বর্ণপদক পান ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তির জন্য।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পড়তে এসে তিনি ঘনিষ্ঠ হন আরো দুজন বিখ্যাত অধ্যাপকের—একজন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আরেকজন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। এই দুই অধ্যাপক বিষ্ণু দে-কে গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেন (সেই কৃতজ্ঞতাতেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি' উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে এবং বহুকাল পরে 'হে বিদেশী ফুল' নামক অনুবাদ-গ্রন্থটি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে)।

'এলিজাবেথান ও শেকসপীয়রীয় বিষয়ে মহাপণ্ডিত' এবং এলিঅট-পাউণ্ড প্রমুখ আধুনিক কবিদের সম্পর্কে খড়্গহস্ত প্রফুল্লচন্দ্র 'প্রত্যেকটি ছাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করতেন এলিজাবেথান উত্তাপ, সে-যুগের কর্মপ্রেরণা ও প্রাণশক্তি'।[৩৪] বিষ্ণু দে তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। কিছুটা কৌতুকের সঙ্গেই স্মরণ করেছেন কিভাবে এলিঅট-সম্পর্কে বিমুখ এই অধ্যাপক এলিঅটের 'পাঠাহত' কপিটি দেখে চমৎকৃত হন ছাত্রের অধ্যবসায়ী কাব্যপাঠের সিরিয়সনেসে। বিষ্ণু দে জানতেন, 'সে উদারতা তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিক্ষক-যশের মধ্যেও ছিল।'[৩৫]

অবশ্য রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগাযোগ ও মিল ছিল অনেক বেশি। রবীন্দ্রনারায়ণও উঁচুদরের পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর রুচির ব্যাপ্তি ছিল আরো বেশি এবং শুধু শিল্পসাহিত্যই নয়, জীবনযাপন ও বোধের সমগ্রতার দিকে ছিল তাঁর ঝোঁক। বিষ্ণু দে-র উপর তাঁর গভীর একটা প্রভাব ছিল মনে হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'অন্যদিকে প্রাজ্ঞ অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, যাঁর সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে ইতিহাসে ভূগোলে জ্ঞান ও প্রাণময় আগ্রহ ছিল আশ্চর্য। যাঁর বিষয়ে প্রফুল্লবাবুর মতো কড়া বিচারকও বলতেন: আমাদের অ্যাকাডেমিক জগতে একমাত্র রবির স্থান আছে নিজেরই রুচিবোধে...। রবিবাবুর আত্মসংকুচিত বিনীত সজ্জন স্বভাব, কিন্তু প্রতিষ্ঠাখ্যাত বহুবিধ পাণ্ডিত্যের মধ্যে আর অধ্যক্ষজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও এলিঅট-পাউণ্ডদের রচনার বিস্মিত ও নন্দিত পাঠই তার প্রমাণ। রবিবাবুর তখন থেকেই স্থির লেখকের [বিষ্ণু দে-র] প্রতি আশ্চর্য স্নেহপ্রীতি ও সাহিত্যিক পরিগ্রহণ ও অনুমোদন। এবং ঐতিহ্য জিজ্ঞাসায় তাঁর জ্ঞান ছিল সহায়।'[৩৬] স্পষ্টতই রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের জীবনের ও দৃষ্টির এই বহুচারিতা—বিশেষত তাঁর

বিশ্বজোড়া আগ্রহ, রুচিবোধ ও ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবির প্রতি স্নেহশীল সংযোগ ও সহমর্মিতা—বিষ্ণু দে-র কাছে ছিল খুবই উপকারী, তাঁর প্রস্তুতিপর্বে সৃজনশীল সহায়ক।

ছাত্রবয়সের এই উত্তাল দিনগুলিতেই (১৯৩২-৩৪) বেরোয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস', লেখা চলতে থাকে 'চোরাবালি'-র বহু কবিতা, 'পরিচয়'-এর আড্ডার সূত্রে লেখা হতে থাকে প্রুস্ত-লরেন্স-হাক্সলি-এলিঅট প্রসঙ্গে প্রবন্ধ—চলতে থাকে ছবি দেখা, গান শোনা—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রবল আড্ডা। সেন্ট পলস কলেজের দিনগুলিতে যে গান-শোনা শুরু হয়েছিল, তা পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে অর্কেস্ট্রা শুনতে যাওয়া, বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো—দীর্ঘদিনের এই সংগীতচর্চায় তার সঙ্গী ছিলেন কখনো জ্যেষ্ঠ নীরদ সি চৌধুরী বা অপূর্বকুমার চন্দ, বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অনুজ চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বা সমর সেন প্রমুখ। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র লিখছেন, 'বিষ্ণুর কাছে আমার আরও একটা ঋণ আছে। পাশ্চাত্য সংগীতের রামধনু-আকাশের প্রতি সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। /তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে একদিন বিষ্ণুর বাড়িতে একটি রেকর্ড শুনলাম: Thousands Years of Music···/ বন্ধুর বাড়িতেই শুনলাম বেটোফেনের ফিফথ ও সিকসথ সিমফনি।'· বিষ্ণু একদিন বলল—চলো নীরদদার বাড়িতে যাই। ওঁর কাছে মোৎসার্ট-বেটোফেন-বাখ-এর প্রচুর কালেকশন আছে।/নীরদচন্দ্র চৌধুরী মশাই তখন চক্রবেড়েতে থাকতেন। ·তিনি শুধু রেকর্ডই শোনালেন না, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাখ্যাও করে দিলেন।/.. সহোদরপ্রতিম চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুর বাড়ি আসত—আমাদের ঘনিষ্ঠ সহচর, মার্কসপন্থায় বিশ্বাসী উজ্জ্বল তরুণ। তারও ছিল ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রকাণ্ড সংগ্রহ এবং এতৎ বিষয়ে অগাধ জ্ঞান।/রেকর্ড শুনতে চঞ্চলের বাড়ি যেতাম। প্রত্যেক কম্পোজারের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য বিষয়ে আলোচনা হত।'[৩৭] বই-পড়া, গান-শোনা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা-দেওয়া সবই তখন কবিতা-রচনার মালমশলা ও প্রেরণা। সমর সেন যেমন বলেছেন, 'হাতে-তৈরি সেই সূক্ষ্ম গ্রামোফোনটি (ই-এম-জি), তার অদ্ভুতদর্শন চোঙাটিও কবিদের প্রেরণা ও শৃঙ্খলার অঙ্গ ছিল।'[৩৮]

এর পরই একটা বাঁক এসে যায় বিষ্ণু দে-র জীবনে ও সাহিত্যে। অনিবার্য ভাবে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য চর্চার মানস তাঁকে নিয়ে যায় গভীরতর উৎসে। এলিঅট থেকে পাওয়া তাঁর আত্মসচেতনতা ও ঐতিহ্যবোধই তাঁকে প্ররোচিত করে এলিঅট বর্জনে। এই উত্তরণের বিষয়ে পরোক্ষ উক্তিতে নিজের সম্পর্কেই বিষ্ণু দে বললেন: 'একজন তাই থেকে উত্তরোত্তর বুঝতে লাগল যে পথ চওড়া হচ্ছে—সংকীর্ণ অর্থে, প্রাদেশিক অর্থে সাহিত্যসৃষ্টি ও চর্চা থেকে সাহিত্যের উৎসে এবং বহুতায়, ইতিহাসে, জীবনের দর্শনে, জ্ঞানের কর্মিষ্ঠতায়।...দেখল যে অ্যাংলো-ক্যাথলিক রাজন্যবাদী এলিঅটের ঐ ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধের অসম্পূর্ণ নির্ণয়ই নিয়ে যায় সাহিত্যের পাদপীঠে, সমাজ-জীবনে, রাজনীতির ইতিহাসে, অতীতে ও ভবিষ্যতের চিন্তায় অর্থাৎ বর্তমানেই। এবং সাহিত্যিক রূপান্তর হয়ে ওঠে সঠিক রূপান্তরের চৈতন্য।'[১৯]

১৯৩৪ সালে তিনি এম. এ পাশ করেন—১৯৩৫ সাল থেকে শুরু করেন রিপন কলেজের শিক্ষকতা। রিপন কলেজে অধ্যক্ষ তখন তাঁরই প্রিয় শিক্ষক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। সহকর্মী বুদ্ধদেব বসু, যাঁর সঙ্গে 'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকার সূত্রে বন্ধুত্ব ছিল নিবিড় এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাঁর সঙ্গে আজীবন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত তখনই। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা হচ্ছে একে একে। 'চোরাবালি'-র নেতিবাচক ব্যঙ্গবিদ্রূপের জগৎ ছেড়ে এসে তিনি প্রবেশ করছেন সমাজ-সচেতনতার নতুন জগতে। মার্কসবাদে প্রত্যয় কবিতার বিষয়ে ও শরীরে এনে দিচ্ছে নতুনত্ব।

১. এ-সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যাবে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গের রত্নমালা', ২য় ভাগ (টি. এস. ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং, ১৩২১ ব, পৃ ১৮-২০) এবং শিবনাথ শাস্ত্রী-র 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৩৬২ ব, পৃ ৩৩০) গ্রন্থ দুটিতে।

২/৩/৭/৮/১০/১১/১৪. বিষ্ণু দে, 'ছড়ানো এই জীবন'। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', রবিবাসরীয়, ২২ ও ২৯ জুলাই; ৫ ও ১২ আগস্ট; ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯।

৪/৬/৯/১৬/১৮/২০/২৩/২৪/২৬/২৯/৩৫/৩৬/৩৯. বিষ্ণু দে, 'জনৈক লেখকের কৈফিয়ৎ' [প্রথম প্রকাশের সময় নাম ছিল: 'কি করে লেখক হলুম']। 'সেকাল থেকে একাল', বিশ্ববাণী, ১৯৮০। পৃ, যথাক্রমে ২১-২২, ২২, ২৪, ২২, ২২, ২২-২৩, ২৩, ২৩, ২৩, ২৪, ২৪, ২৪, ২৫।

৫/১৫/১৭/২১. *Speech of Shri Bishnu Dey the award-winner.* **Bharatiya Gnanpith**, ১৯৭৩। বাংলা অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা ('সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৮২ ব)।

১২/১৩/২২/২৫/২৭/২৮. বিষ্ণু দে, 'টমাস স্টার্ণস এলিঅট'। 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য' ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, [১৯৫৮]। পৃ. যথাক্রমে ৮২, ৮১, ৮১, ৮০-৮১, ৮১, ৮১।

২৯. বিষ্ণু দে, 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা'। লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৬৬। পৃ ৩৬।

৩০. Amalendu Bose, *Bishnu Dey. Poetry Bengal*, Bishnu Dey Special Number, ১৯৫০। অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৩১. হিরণকুমার সান্যাল, 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র'। প্যাপিরাস, ১৯৫৮। পৃ ৭১।

৩২/৩৪. Ashok Sen, *The Poet Bishnu Dey and His Poetry*. ভারতীয় জ্ঞানপীঠ কর্তৃক ১৯৫৩ সালের পুরস্কার-দান উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ। অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৩৩. কবিতা সিংহের 'ঘরোয়া কথা'-র প্রতিবাদে বিষ্ণু দে-র চিঠি। 'দৈনিক কবিতা সংকলন', ২৫ বৈশাখ ১৩৫৭ ব।

৩৭. জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, 'আমাদের নবজীবনের গান'। 'কালান্তর', শারদীয় ১৩৫১ ব।

৩৮. Samar Sen, *The Still Centre. Poetry Bengal*, Bishnu Dey Special Number, ১৯৫০। অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

'ছন্দমিলের পালাকীর্তনের পরে'

'বাল্যে রচিত বিষ্ণু দে-র ছন্দপটু পদ্য প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র কথা উঠেছিল, কিন্তু তার পরে, প্রকৃত তৈরি হওয়ার পর্বে, বিষ্ণু দে-র কাছে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ইত্যাদি কেউই নন, অনুসরণীয় ছিলেন একমাত্র প্রমথ চৌধুরী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কে তাঁর মনে হয়েছিল 'রবীন্দ্রপূর্ব প্রাগৈতিহাসিক'।[১] যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-র 'মরীচিকা'-র 'বিশেষ ভক্ত' হয়েও তিনি বলেছেন, যতীন্দ্রনাথের ঝুড়ির বেতের ফাঁক দিয়ে যে জল গড়িয়ে পড়ে, 'সে জল sentimentalism-এর অশ্রুজল ও সে বেত imagination নয়—fancy।'[২] মোহিতলালের কাব্যের ছদ্ম ধ্রুপদী ভঙ্গির পেছনে যে আসলে রোমান্টিক রুগ্নচিত্ততা আছে, তা বলতে গিয়ে বিষ্ণু দে লিখলেন, '"ইনটেন্‌স্‌লি feel করিতে" গেলে যে চিত্তবৃত্তির স্বাস্থ্য ও সতেজতা চাই, তাহা রুগ্নচিত্ততার বিরোধী।'[৩]

অবশ্য একই সঙ্গে 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিও বিষ্ণু দে-র গভীর একটা

আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল—বিশেষত 'কল্লোল'-এর কোনো কোনো লেখকের প্রতি। একই সময়ে যখন তিনি সাহিত্যে 'মনের প্রাধান্য' বিষয়ে সোচ্চার, রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতি বিদ্রূপপ্রবণ, তখন 'কল্লোল'-সম্পর্কে তাঁর এই দুর্বলতার কারণ সম্ভবত এটাই যে, তাঁর মনে হয়েছিল, কৃত্রিম সৌন্দর্যপনার বিরুদ্ধে এই সজীব ভাঙচোর কোনো-এক ভাবে হয়তো আঁকাড়া জীবনকে ছুঁতে পেরেছিল। তাই তো 'কল্লোল'-এ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র 'বেদে' পড়ে বিষ্ণু দে মুগ্ধ চিঠি পাঠান কবিতার আবেগে : 'হৃদয়ের মাঝে আছে যে গোপন বেদে/অদ্ভুত তার বিচিত্র কিবা ভাষা...।'[৪] 'কল্লোল'-এর কোনো কোনো লেখকের প্রতি তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা এবং ঐ পত্রিকার দ্বিতীয় যুগে তাঁর কয়েকটি কবিতাও বেরোতে থাকে ঐ পত্রিকারই পাতায়। তার মধ্যে ছিল খলিল জিব্রান-এর 'আরব কবিতার'-র অনুবাদ 'উন্মাদ-বইটির ভূমিকা।[৫] এর ফলে পরবর্তীকালে যখন তিনি 'পরিচয়'-এর আড্ডায় প্রবেশ করলেন, তখন এ-রটনাও তাঁর সম্পর্কে ছিল : 'কল্লোলের যুগের অর্বাচীনতম কবি বিষ্ণু দে।'[৬]

এ-কথা যে মোটেই সত্য নয় তা বোঝা যায়, যখন আমরা তার প্রায় সমসাময়িককালের প্রবন্ধেই পড়ি 'কল্লোল'-যুগের জলো রোমান্টিকতার বিষয়ে তাঁর ঠাট্টাবিদ্রূপ। 'দেশবিদেশের ইমোশ্যনাল একসাইট্‌মেন্ট' সম্পর্কে ব্যঙ্গবান ছোঁড়েন, 'কল্লোল'-এর প্রথিতযশা লেখক সম্পর্কে বলেন, 'বুদ্ধদেব বসু হয়তো intensely feel করিয়াই "বন্দীর বন্দনা" বা "পাপী" লেখেন, কিন্তু তিনি তো সকল কবির প্রতিনিধি নন। হৃদয়কেই বল্লভ সকল কবিই করেন না।' প্রমথ চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'আমাদের ক্যলচার য়ুরোপের ছাড়া কাপড় নিয়ে'[৭] কিংবা একই সময়ে অন্যত্র লেখেন, 'আমরা ভুলে গেলুম যে স্থূলতা ও বর্বরতাই জীবন নয়। এবং বাস্তব ও বাস্তবতায় প্রভেদ আছে।'[৮] সাহিত্যের রুচি বা সাহিত্যিক সমালোচনা কীভাবে 'ব্যক্তিবাদে'র দ্বারা, শুচিবায়ুগ্রস্ততার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে তা উদ্ঘাটিত করে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেন তিনি 'প্রগতি'-র পাতায় : 'মন হয়তো খারাপ থাকে, বাদলের সন্ধ্যায় বসে বসে হয়তো রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা পড়ি। লিখতে শুরু করি, "উর্বশী"-র চেয়ে "বর্ষার দিনে" কত ভালো।...কারণ আমাদের মতামত ব্যক্তিগত। বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো সেগুলো চিরন্তন নয়।'[৯]

এই ব্যক্তিবাদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই তাই তিনি অনিবার্যভাবেই এসে দাঁড়ালেন প্রমথ চৌধুরীর পাশে। রবীন্দ্রনাথের এত ঘনিষ্ঠ, পারিবারিক

আত্মীয়তায় এবং বুদ্ধি ও আবেগের সহমর্মিতায়, কিন্তু তবু গদ্যে ও কবিতায় সম্পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত এই লেখকই তাঁর কাছে সবচেয়ে কাছের লোক মনে হয়েছিল এই শিক্ষানবিশী পর্বে। শৈশবের 'ছন্দমিলের পালাকীর্তন' শেষ করে, 'প্রায় দুশো পৃষ্ঠার কুশলী পদ্যের' খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তিনি প্রথম যখন লেখা ছাপাতে শুরু করলেন তখন তাঁর নিজেরই হিসেব অনুসারে বয়স 'তেরো বা চোদ্দ বছর'—অর্থাৎ ধরা যায় ১৯২৩-২৪ সাল। আমাদের হাতের কাছে অবশ্য সবচেয়ে পুরনো রচনাকাল যেটা পাওয়া যাচ্ছে, তা ১৯২৫—'চোরবালি' গ্রন্থে প্রকাশিত 'গার্হস্থ্যাশ্রম' কবিতার অন্তত কিছু কিছু অংশ নিশ্চয়ই ১৯২৫ থেকেই রচিত হতে শুরু করে, কেননা ঐ গ্রন্থতেই কবিতাটির রচনাকাল দেওয়া আছে ১৯২৫-৩০। কিংবা পরের যে কবিতাটির তারিখ পাওয়া যায়, সেই ১৯২৬ সালে রচিত 'আধুনিক প্রেম', ছাপা হয় ১৯২৯ সালে 'প্রগতি' পত্রিকায়।

কিন্তু ব্যাপকতরভাবে তাঁর লেখা ছাপা হতে শুরু করে ১৯২৮ সাল থেকে —প্রধানত চারটি পত্রিকায়: 'বিচিত্রা', 'প্রগতি', 'ধূপছায়া' এবং 'কল্লোল'। এর মধ্যে 'কল্লোল' পুরনো পত্রিকা, কিন্তু 'বিচিত্রা'-'প্রগতি'-'ধূপছায়া' প্রকাশিত হয়েছে মাত্র এক বছর আগে থেকে—অর্থাৎ সব কটিরই প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১ ২৭ সালে (বাংলা ১৩৩৪)। 'প্রগতি' ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় এবং 'ধূপছায়া' কলকাতা থেকে বেণুভূষণ গাঙ্গুলি ও অরিন্দম বসু-র সম্পাদনায় বেরোতে থাকে। দুটি পত্রিকাই, সর্বতোভাবে, সাহিত্যে যে আধুনিকতার 'আন্দোলন' শুরু হয়েছিল 'কল্লোল'-'কালিকলম'-এর নামে, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল সহযাত্রী হিসেবে। যদিও বিষ্ণু দে খানিকটা নিবিড়ভাবেই যুক্ত ছিলেন পত্রিকা দুটির সঙ্গে—তবু সাহিত্যিক রুচি ও মতামতের মৌলিক পার্থক্যের কারণেই পত্রিকা দুটিতে বিষ্ণু দে-র গদ্য (এবং কবিতা) ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়েছে তাঁর সঙ্গে সম্পাদকীয় মতভেদ। বিশেষ করে প্রায় প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই বুদ্ধদেব বসু-র সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার আবহতেই যে মতভেদের সূত্রপাত হয়েছিল, তার পেছনে যে মৌলিক নন্দনতত্ত্বের ভেদ দায়ী ছিল তা আমরা আজ সহজেই বুঝতে পারি।[১০] 'প্রগতি' ও 'ধূপছায়া' উভয় পত্রিকাতেই উগ্র যদিচ তরল রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রতিবাদ যেমন তিনি করেছেন (মূলত লক্ষ্য ছিল বুদ্ধদেব বসুরই রবীন্দ্রবিরোধিতা), তেমনি ঐসব পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে-আসার চিহ্ন সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল বিষ্ণু দে-রই কাব্যভাষায়।

১৯২৮ এবং ১৯২৯ এই দুই বছরে পূর্বোক্ত পত্রিকা চারটিতে বিষ্ণু দে-র কয়েকটি প্রবন্ধ, বেশ কয়েকটি গল্প এবং কবিতা বেরোতে থাকে। বিষ্ণু দে-র গড়ে-ওঠার ইতিহাসে এটাকে প্রথম ধাপ বলা যায়। কবিতাগুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে লক্ষণীয় যা তা হল, প্রায় প্রত্যেকটিই বিভিন্ন ফরাসী রীতির বিন্যাসে লেখা—শিরোনামের তলায় বন্ধনীমধ্যে লেখা 'ফরাসী Villanelle ছন্দে রচিত', 'Ballade ছন্দে', সর্বাধিক ক্ষেত্রে 'Triolet' এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে 'Rondelet'। স্বভাবতই সকলের মনে পড়ে যাবে প্রমথ চৌধুরীর কাব্য-প্রচেষ্টার কথা। বস্তুত প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণা বা আদর্শেই যে এই বিভিন্ন ফরাসী 'ছন্দে' কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন বিষ্ণু দে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু কবিতা নয়, ঠিক এসময়েই রচিত তাঁর গল্পগুলিও প্রমথ চৌধুরীর প্রতি তাঁর সাহিত্যিক অনুরাগেরই ফসল। কিন্তু এ তো স্বেচ্ছাচারী কোনো নির্বাচন নয়—রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে আত্ম-আবিষ্কারের পথে এ এক জরুরি অনুশীলন।

কেননা সেকালে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবই ছিল, অন্তত কাব্যরচনার ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর কাব্যরচনার পদ্ধতিই ছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে একেবারে ভিন্ন। তিনি নিজেই বলেছেন 'সনেট পঞ্চাশৎ'-সম্পর্কে : 'আমার সনেট যদি কবিতা হয় তাহলে সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী।'[১১] কিংবা অন্যত্র : 'রবীন্দ্রনাথের lyric মূলত গীতধর্মী—তার flow অসাধারণ। সনেট আমার মতে sculpture-ধর্মী—এর ভিতর উদ্দাম flow নেই।' এই 'উদ্দাম flow'-এর বিরোধিতাতেই প্রথম চৌধুরীর কাব্য রচনা। তিনি কোন পরিস্থিতিতে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তা বলতে গিয়ে রবীন্দ্র-অনুকরণের সেই পরিবেশের কথাই তুলে ধরেছেন—'রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম।' স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তারিফ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর 'নির্মমভাবে নিখুঁত' কবিতার, যে কবিতা তাঁর মতে 'বাংলার সরস্বতীর বীণায়' 'ইস্পাতের তার'। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, 'সনেট পঞ্চাশতের কবিতা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, হয়তো রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতিপ্রাবল্যের ব্যতিক্রম বলেই।'

ঠিক কোথায় প্রমথ চৌধুরী আলাদা হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে? প্রমথ চৌধুরীর নিজের কথাতেই শোনা যাক এর ব্যাখ্যা : 'রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় কবিদের কবিতায় emotion-ই হয়তো আর্টকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে আছে। কিন্তু art অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী। আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা

experiment হিসেবে।...আমার সনেটের অন্তরে হয়তো art-এর চাইতে artificiality বেশি। তাই আবেগের বাধাবন্ধহীন উচ্ছ্বাস তাঁর কবিতার লক্ষ্য নয়, তাঁর কবিতার প্রধান লক্ষ্য অবয়ব গঠন, রূপ বা ফর্মের সাধনা। তিনি তাই ফরাসী কাব্যের রূপচর্চাকে আনতে চাইলেন বাংলায়—Triolet, Terza Rima প্রভৃতি রূপাবয়বে। আসলে কৃত্রিম পরিশ্রমী কাব্যরচনার মধ্য দিয়েই ভাঙতে চাইলেন 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকলে'র আবেশ।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার সাফল্যের সীমা শেষপর্যন্ত যতটুকুই হোক, তাঁর এই 'সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী' কাব্যপ্রয়াস বিষ্ণু দে-র মতো পরবর্তী আধুনিক কবিদের শিক্ষাস্থল—তাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক পথপরিক্রমা করতে গিয়ে যে আত্ম-সচেতনতাকে আশ্রয় করেছিলেন, সেই আত্মসচেতনতারই সূত্রপাত প্রমথ চৌধুরীর কাব্যে। 'ভাবালুতার বিস্রস্ত আত্মপ্রকাশের প্রাবল্যের কালে সংযম ও নৈপুণ্যের আশ্চর্য যে-দৃষ্টান্ত একদা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেজন্য উত্তরকালীন কবিরা—যাঁরা স্বভাবকবিত্বে নয়, সচেতন শিল্পকর্মে বিশ্বাসী—এই পূর্বসূরীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, এই আশা পোষণ করা যেতে পারে।'[১২] বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যানুশীলন এই কৃতজ্ঞতারই দৃষ্টান্ত।

অল্প সময়ের মধ্যে ফরাসী 'ভিলানেল', 'বালাদ' ও 'ট্রিওলেট' ছন্দে পরপর যে কবিতা কয়েকটি তিনি লিখেছিলেন, তা আজ পুরনো সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় বিলুপ্ত হওয়ার অপেক্ষাতেই মাত্র রয়েছে। ইতিহাসের খাতিরে এর মধ্য থেকে তিনটি সম্পূর্ণ কবিতা এবং দুটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করলে পাঠকেরা বিষ্ণু দে-র এই অনুশীলন-পর্বের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ পেতে পারেন, যদিও কবি স্বয়ং এই কবিতাগুলির উল্লেখেই লজ্জিত হতেন।[১৩]

স্মৃতি

(ফরাসী Villanelle ছন্দে রচিত)

বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি
তিমির কালো ঘোমটা খুলি এসেছ মনে,—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি।

মনে যে আসো প্রেমের আলো নয়নে ধরি,
আধেকফুট কথা ও লীলা অধর কোণে,—
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি।

কাব্য পড়ি সন্ধ্যা যেত গল্প করি—
মাথাটী বুকে চাহিতে মুখে ক্ষণে ক্ষণে—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি।

বরষা রাতে তন্ত্রী পরে টানিতে ছড়ি—
গুমরে স্বর বাদলহাওয়া মেঘের স্বনে,
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি।

স্নিগ্ধশ্রী ও তনুটী ঘেরি নীলাম্বরি,
গৃহের কাজে ব্যস্ত—শুন, পড়িছে মনে—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি।

মূরতি নাই, স্মৃতি যে শুধু রহিল পড়ি
ঘুরিছে কত কথা ও ছবি মনের বনে!
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি॥

('বিচিত্রা', ফাল্গুন ১৩৩৪ ব. ১৯২৮। পৃ ৪১০)

গাঁয়ের চিঠি

(Ballade ছন্দ)

শরৎ আসে মরত পরে শরৎ দেখি আসে!
শরৎশ্রীতে শ্রী ধরি মাটি, আকাশ মনে টানে!
ভাদ্রপ্রীতি আদর পেয়ে গরবে তটী হাসে
স্বর্ণআভা বিচ্ছুরিছে আধেক সোনা ধানে,
ক্ষেতসুবাস মিঠা কী মেঠো গন্ধ আসে ঘ্রাণে,
আকাশ নীল, শ্যামল মাটি বরষারসে ভরি;—
পুলকে মোর সর্বমন চাহিছে তোমা পানে—
কোথায় তুমি একেলা সখী সহরে আছ পড়ি!
শরৎশ্রী কী ফুটেছে শ্বেতমেঘে ও শ্বেতকাশে!

মেয়েরা ঐ কলস লয়ে চলেছে সব স্নানে,
রাখাল তার গরুর পাল বিচিত্র কী ভাষে
চালায় একা !—শব্দ তার আসিছে ভাসি কানে…

[এর পর আরো ষোল লাইন আছে]

('প্রগতি', কার্তিক ১৩৩৫ ব, ১৯২৮ । পৃ ২৯৯)

তেপাটী

(Triolet)

সন্ধ্যার শ্যাম অন্ধকারে
বাতায়নে তুমি দাঁড়ায়ে সখী !
ধূসর মলিন আকাশ পারে
সন্ধ্যার শ্যাম অন্ধকারে
যে মায়া হেরিছ, কেমন তারে
ধরিলে বয়ানে ? কও ? ভাবো কি,
সন্ধ্যার শ্যাম অন্ধকারে
বাতায়নে তুমি দাঁড়ায়ে, সখী ।

[এরকম ৬টি অংশের একটি]

('কল্লোল', ভাদ্র ১৩৩৬ ব, ১৯২৯ । পৃ ২৮১)

বিদুষী

Austin Dobson-এর অনুসরণে

(Triolet)

প্রেমকলার পাঠশালাতে বিদুষী মোর বিনোদিনী,
বারে-বারে ডাক পড়ে মোর যখন-তখন অন্দরেতে !
স্থানের বিচার ত্যাগ করে তাঁর চুড়ির ডাকা রিনিঝিনি—
প্রেমকলার পাঠশালাতে বিদুষী মোর বিনোদিনী !
—পান নেবে না ? চুরুট ? নভেল ?—সকল ছলায় জ্ঞান গৃহিণী !

সেই কারণেই বাপের বাড়ী মাঝে মাঝে চান যে যেতে।
প্রেমকলার পাঠশালাতে বিদুষী মোর বিনোদিনী।
বারে-বারে ডাক পড়ে মোর যখন-তখন অন্দরেতে।
('প্রগতি', ভাদ্র ১৩৩৬ ব, ১৯২৯। পৃ ৫৬)

ভারতচন্দ্র
(Rondelet)

রায় গুণাকর!
ভাষার প্রদীপে রঙীন দীপালি জ্বালো।
রায় গুণাকর!
বিদ্যা ও উমা সুন্দর ও শিব নাগরী নাগর!
তীক্ষ্ণ তোমার বিদ্রূপে করো সবারে কালো!
ব্যঙ্গ কি খাসা! কি খাসা ভাষায় সবেতে ঢালো?
রায় গুণাকর! (ঐ)

এ ছাড়া এসময়ে তিনি আরো অনেক ট্রিওলেট লিখেছেন, নৈপুণ্যের দিক থেকে সেগুলো বোধহয় আরো পরিপক্ক—অধিকাংশই বেরিয়েছে 'প্রগতি' পত্রিকায়। পরে 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে সেগুলো সাজানো হয়েছে নানা বিন্যাসে —যেমন 'গার্হস্থ্যাশ্রম' বা 'শিখণ্ডীর গান'। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ট্রিওলেট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রচনাগুলোকে বিক্ষিপ্ত না রেখে যে-ভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ করেছেন [কবি] তাতে প্রচুর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।'[১৪]

আসলে ঠিক এই সময়ে তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়েছিল 'ট্রিওলেট'—বোধহয় বহিরঙ্গ রূপসাধনা বা টেকনিকের চর্চা যা বিষ্ণু দে করতে চেয়েছিলেন রোমান্টিক-বিরোধী, প্রেরণাবেগ-বিরোধী প্রতিক্রিয়ায়, তার পক্ষে চমৎকার বাহন ছিল এই ট্রিওলেট। প্রমথ চৌধুরীরও প্রিয় ফর্ম এই ট্রিওলেট। বিষ্ণু দে এর অনুবাদ হিসেবে 'তেপাটী' নামটিও গ্রহণ করেন প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে। প্রমথ চৌধুরীর কথায়: 'ফরাসী কবিতা Triolet-এর ছাঁচে ঢালাই করে আমি এক সময়ে গুটিছয়েক পদ্য রচনা করি এবং তার নাম দিই তেপাটী। সে-সকল তেপাটীতে Triolet-এর ঠিক গড়নটি বজায় রাখতে পারি নি। হাত দুই জমির

ভিতর কুঁচিমোড়া ভাঙা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা যিনি কখনো কসরত করেছেন তিনিই জানেন। তেপাটী লেখাও হচ্ছে লেখনীর একটা কসরত।' বা অন্যত্র বলেছেন: 'Triolet লেখাও কঠিন—তার পুনরুক্তির জন্য।' ভাবোচ্ছ্বাসের 'কবিআনা ঢঙ' যখন প্রবল হয়েছিল, তখন লেখনীর এই 'কসরত'ই ছিল প্রতিবাদের ভাষা—বিষ্ণু দে-র কাছেও। পরন্তু 'ভাবঘন' গুরুভার কবিতার পাশে ব্যঙ্গের হালকা ছটা, বুদ্ধির স্বচ্ছ দীপ্তি আনতে হলেও ফরাসী মেজাজের এই সব চাল খুব কাজের হয়—'বলা বাহুল্য এ কবিতার [ট্রিওলেটের] ভাব-ভাষা দুই-ই নেহাত হালকা হওয়া চাই।'[১৫] ঠিক এই সময়েই বিষ্ণু দে বেশ কতকগুলো গল্প লেখেন—প্রথম চৌধুরীরই আদলে। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি গল্পের ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীর মননশীল ব্যঙ্গপ্রধান 'স্টাইল' আধুনিক আত্ম-সচেতন মনের কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল। সম্ভবত প্রথম যে গল্পটি লেখেন, তা হচ্ছে ১৯২৮ সালে 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত 'পুরাণের পুনর্জন্ম/লক্ষ্মণ'। এ গল্পটি রচনায় একটি ইতিহাস আছে। '"প্রগতি"তে তখন "পুরাণের নবজন্ম" লেখা হচ্ছে—হালের সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে রামায়ণের পুনর্লেখন। প্রভু গুহঠাকুরতাই সে লেখার উদ্বোধন করেছেন। তারই অনুসরণে বিষ্ণু [দে] "কল্লোলে" "পৌরাণিক প্রশাখা" লিখলেন—ভরতকে নিয়ে।'[১৬] এই তথ্য-পরিবেশনের মধ্যে একটু বিভ্রান্তি আছে। 'কল্লোল'-এ ভরত-বিষয়ক রচনাটি বের হয় ১৯২৯ সালে—তার প্রায় দু-বছর আগে, 'প্রগতি'তেই বিষ্ণু দে-র প্রথম গল্পটি বেরোয়। বস্তুত ঐ বছরই 'প্রগতি'র শ্রাবণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল বিপ্রদাস মিত্রের (বুদ্ধদেব বসুর ছদ্মনাম) লেখা 'পুরাণের পুনর্জন্ম/উর্মিলা'। ওটাতে মূল বিষয় ছিল উর্মিলার জীবনের ব্যর্থতা—বলা বাহুল্য 'হালের সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে'। সেটা পড়ে বিষ্ণু দে খুব 'খুশি' হন, বিশেষত এর 'লেখার কায়দায়'। এ-বিষয়ে কবিপত্নীর জবানিতে লেখা (প্রথম বন্ধনীর মধ্যে কবির মন্তব্যসহ) একটি চিঠি থেকে আরো তথ্য উদ্ধার করি: 'প্রগতিতে প্রভু গুহঠাকুরতা "পুরাণের পুনর্জন্ম" বলে একটা স্মার্ট গল্প লেখেন। বোধহয় John Erskine-এর গল্প অবলম্বনে। প্রাচীন গল্প হেলেন অব ট্রয়ের আধুনিক রূপান্তর। বুদ্ধদেববাবুর উৎসাহে সেই বইখানি Book Co. থেকে কেনেন। তখন [বিষ্ণু দে-র] বয়স খুব অল্প—হয় কলেজে উঠবেন বা উঠেছেন সবে। তাতে ওঁর মজা লাগলো, এবং উনি একটু burlesque style-এ sequel একটা লেখেন। সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে, ৪৭নং পুরানা পল্টনে, প্রগতির আপিস এবং ওঁর বাড়িও। তখন ঢাকায়

মোহিতলাল মজুমদারও ছিলেন, বাংলার লেকচারার হয়ে। তিনি নাকি ভেবেছিলেন ("of all men" !) প্রমথ চৌধুরী বেনামে লিখছেন ! ("আমি খুব খুশি হয়েছিলুম, কারণ সবুজপত্রের বিখ্যাত প্রমথ চৌধুরীর smartness আমাদের তখন খুব ভালো লাগত") ।[১৭]

এরকম 'কায়দা'-র লেখা থেকে বিষ্ণু দে-র তৎকালীন ভাবনার কোনো ছাপ আবিষ্কার করা নিশ্চয়ই অবাস্তব হবে, কিন্তু লক্ষণীয় এটুকুই যে উর্মিলার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করতে গিয়ে বিপ্রদাস মিত্রের লেখায় লক্ষ্মণের চরিত্রের যে সরলীকরণ করা হয়েছে, তা থেকে তাকে মুক্ত করে তিনি চরিত্রের নিহিত জটিলতা, হয়তো বলা যায় আধুনিক জটিলতা বানিয়ে তুললেন। কিংবা—ধরা যাক গল্পটিতে 'লক্ষ্মণের খাতা' অংশে কোনো পাঠক যখন পড়েন, 'সীতা ত সে প্যানপেনে আদ্যিকালের সীতা নয়—এমনকি ভীরুকোমল শকুন্তলাও ত নয়—সে হচ্ছে পরিপূর্ণ সুন্দরী, মোহিনী' এবং তার সঙ্গে আরো পড়েন, 'সীতার সঙ্গে (লক্ষ্মণের) মতে মিল্‌ল, অর্থাৎ ফরাসী সাহিত্যের তিনি ভক্ত—এবং সবস cynicism ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ—তা সে ভল্‌তেয়ার, কি সুইফ্‌ট্‌ কি ব্যাবেলে কি ওয়াইল্ড বা শ-রই হোক্ না'[১৮]—তখন সেই পাঠকের মনে হতেও পাবে বিষ্ণু দে-র গদ্যে, গল্পের গদ্যে তো বটেই, শুধু ইংরেজি অন্বয়রীতিই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরো গভীরভাবে শিক্ষিত নাগরিক কথা-বলার ধরনটাও প্রত্যক্ষগোচর। শেষপর্যন্ত অবশ্য দাঁড়িয়ে যায় এর লেখার 'কায়দাটা'-ই, এবং কায়দা-র স্বকীয়তা, যা শুধুমাত্র প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবের নিরিখেই দেখা চলে না। ১৯২৯ সালে 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'ভরতকে নিয়ে' লেখা 'পৌরাণিক প্রশাখা' গল্পটিতেও যেমন, প্রমথ চৌধুরীর 'smartness' তো আছেই, আরও অতিরিক্ত কিছু আছে।

এছাড়াও আরো কতকগুলি গল্প তিনি লিখেছেন—'প্রগতি'-র পাতায় (৪টি) ও 'ধূপছায়া'তে (১টি)। এ-সম্পর্কে তিনি নিজে লেখেন : 'গল্পগুলি বাজে। লজ্জাকরভাবে বাজে' ।[১৯] বিষ্ণু দে-র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে লেখা এই গল্পগুলির সাহিত্যিক মূল্যায়ন আজ অবান্তর—কিন্তু আমাদের কাছে এগুলোর বেশি গুরুত্ব ঐতিহাসিক কারণে, লেখকের তৈরি-হওয়ার সময়ে মনের গড়নের বিচারে। গল্পগুলি প্রত্যেকটিই বিদ্রূপাত্মক ও ব্যঙ্গমূলক। এই বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের লক্ষ্য কখনো শহুরে 'আধুনিক' প্রেমের কৃত্রিম রোমান্টিক ভাবালুতা ('ফিরে-ফিরতি'), বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীর ও বিরহিণী স্ত্রীর ঈর্ষা-সন্দেহ-শয্যামিলনের হৃদয়বিলাস ('বাসররাত্রি'), কখনো-বা একই সঙ্গে স্থূলরুচি ও সূক্ষ্মরুচি উভয় বন্ধুই ('বন্ধু')

কিংবা দুর্নীতিপরায়ণ হিরো ('হিরো')।'[২০] অধিকাংশ গল্পই রচনাবিন্যাসে ও ভঙ্গিতে প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করায়—তাঁর গল্পের মতোই আড্ডার সূত্রে কাহিনীর উন্মোচন।

বিষ্ণু দে-র লেখা এ সময়কার কবিতা বা প্রবন্ধের সঙ্গে এই গল্পগুলির মেজাজ যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি এগুলোর আশ্রয়েও আত্মসচেতনতার অভিযান এগোচ্ছে এমন বলা যায়।

১৯২৮ সালে 'ধূপছায়া' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ'ই বোধহয় বিষ্ণু দে-র প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ—অন্তত এর পূর্বে ছাপা কোনো প্রবন্ধের সন্ধান আমরা পাই নি। পত্রাকারে লিখিত এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিষ্ণু দে বলেছেন, 'সে সময়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির বিষয়ে "শ্যামল রায়" নামে একটা অসাড় প্রবন্ধ লিখি। তার মধ্যে একটা কথা ছিল, আমার মনে আছে যে, ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি করলে plaster দিলে solid বাড়ি তৈরি হবে, গগনবাবুর cubist ছবি two dimensional, যেন টালি দিয়ে বাড়ির দেয়াল তৈরি করা—তার তো আর plasterএর প্রয়োজন নেই। আলোছায়ার খেলা।– তার আগেই cubist ছবি Europe-এ আরম্ভ হয়ে গেছে। ধূপছায়ার সম্পাদক একদিন জানালেন যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট তিন copy ঐ পত্রিকা সমবায় ম্যানসনে পাঠিয়ে দিতে লিখেছেন, ওঁরা দাম দিয়ে কিনে নেবেন, সেখানে গগনেন্দ্রনাথের exhibition হবে।...পর পর বোধহয় তিন পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি নাকি খুলে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আত্মগ্লানিতে আমার আর exhibition-এ যাওয়া হল না।'[২১]

গগনেন্দ্রনাথ-বিষয়ে এই প্রবন্ধটি ছাড়াও এক বছরের মধ্যেই বিষ্ণু দে শিল্প-বিষয়ে আরো দিকনির্দেশক প্রবন্ধ লেখেন—এবার বিদেশী চিত্র ও ভাস্কর্য সম্পর্কে। শিল্পবিষয়ক আলোচনায় বিষ্ণু দে-র যে আগ্রহ ও অধিকার পরবর্তী-কালে আমরা দেখেছি, তার সূত্রপাত তখন থেকেই। শিল্পী-নির্বাচনে এবং শিল্পীর গুণাবলির বর্ণনায় বা মাত্রারোপে বিষ্ণু দে-র অখণ্ড ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ ছিল তখনও। সে দিক থেকেও স্মরণীয় এই অল্পবয়সের প্রবন্ধগুলি। গগনেন্দ্রনাথ-বিষয়ে যে বিষ্ণু দে লেখেন, 'গগনবাবুর ছবি পুরো বাংলার ছবি।...য়ুরোপের কিউবিস্টরা শুধু স্থিতিশীল পদার্থের ছবিই আঁকতে পারতেন। কিন্তু গগনবাবু কিউবিসমে গতি ফোটাতে পারেন। ধরো য়ুরোপীয়

কিউবিস্ট যেন আঁকেন নিশ্চল বাড়ির ছবি—গগনবাবু তার ওপর গতিশীল মেঘও ফোটাতে পারেন'[২২] —তিনিই 'বিচিত্রা'-র চিত্রসংবলিত সুদৃশ্য প্রবন্ধে ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী লরেন্স্ য়্যাটকিন্সন্ সম্পর্কে লেখেন, 'প্রশ্নব্যাকুল গভীর-চিত্ত য়্যাটকিন্সন্ সারা য়ুরোপের চিত্রশালাসমূহ ঘুরেছেন, বড় বড় আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ করেছেন। জীবনের রহস্যে মুগ্ধ হয়ে কত নরনারীর সঙ্গে মিশেছেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য তাঁর পাঠ্যবিষয়। নিজে তিনি কবিতাও রচনা করেছেন ; আর তাঁর জীবনব্যাপী আর একটা সাধনা আছে, সেটি হচ্ছে সংগীত। য়্যাটকিন্সনের শিক্ষা ব্যাপক। তিনি শুধু সাধারণ শিল্পার্থীর মতো ছবি আঁকতে, মূর্তি গড়তেই শেখেন নি। য়্যাট্‌কিন্সনের শিল্প তাই গভীরতার ভক্ত। তাই তিনি কোনো বিশেষ দলের নন। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করে।'[২৩] কিংবা একই পত্রিকায় একই বছর ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী অগষ্টস্ জন্ সম্পর্কে : 'অগষ্টস্ জনের স্বভাব এক সুস্থ সবল মানুষের স্বভাব। তিনি ভালোবাসতে পারেন। এবং যে শিল্পসৃষ্টি তাঁর ভালো লাগে, তার বৈশিষ্ট্য তাঁর মন আপন করে নেয়।...জীবনে যে কারণে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক, শিল্পেও তাঁর সেই প্রবল প্রাণশক্তি তাঁর শিল্পকে শিল্পের জগতে বিশেষ স্থান দিয়েছে।...এবং অগষ্টস্ জনের প্রাণের উচ্ছলতা তাই সার্জেণ্টের মতো সোসাইটিতে তৃপ্তি পায় না। তাই তাঁর চিত্রে জিপ্‌সির বারংবার আবির্ভাব।'[২৪] এই লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে চিত্র-ভাস্কর্য সংগীত ইত্যাদি শিল্পের নানা বিষয়ে চর্চা ও জিজ্ঞাসু আগ্রহই প্রমাণ করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তূয়মান নন্দনতত্ত্বের কাঠামোটিরও যেন আভাস পাওয়া যায়।

ঠিক তেমনি সমসাময়িক কালে রচিত সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও অনুবাদও তাঁর রুচির এই জগতকে নির্দেশ করে। কবিতারচনায় রবীন্দ্রবর্জন ঐতিহাসিক বা শিল্পগত কারণে যাঁর কাছে অনিবার্য, তিনিই কিন্তু অবিচল মাত্রাজ্ঞানে স্থূল, রবীন্দ্রবিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদী। তাই 'প্রগতি'র নিয়মিত লেখক হয়েও তিনি সাড়া দিতে পারেন না 'প্রগতি'তে প্রকাশিত কোনো কোনো প্রবন্ধের উগ্রতায়—'আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির সহিত রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য" রচনা করেন। সাহিত্যের কষ্টিপাথর কি হওয়া উচিত, তাহা এই রচনা পাঠে অতি স্থূলবুদ্ধিও জানিতে পারে। (শ্রাবণের "প্রগতি"তে) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এ রচনা পড়িয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া না বুঝিয়া অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া স্থানকালপাত্র ভুলিয়া খুব জোরালো ভাষা ব্যবহার করিয়া বসিয়াছেন।...

রবীন্দ্রনাথ যে "রূপ" বলিতে রচনার সমগ্র বিশেষত্ব formটি বোঝাইতেছেন সেটুকু বুঝিলে মন্মথবাবু একথা বলিতেন না এবং এ বুদ্ধিহীন রসিকতাও করিতেন না।'[২৫] কিংবা: 'যখন বলা হয়, রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট, তখন কথাটি শুধু ঐটুকুমাত্র নয়। তার সঙ্গে জড়িত আছে বক্তার বা লেখকের মনস্তত্ত্ব- বলার উদ্দেশ্য বা ব্যক্তির মন বা temperament। যেমন জড়িত থাকে যখন কেউ বলেন, "যোগাযোগ" আশ্চর্য সংযত রচনা।... তুলনামূলক সমালোচনা তাই ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথকে বড কি ছোট বা খারাপ কি ভালো, সে কথা অন্যের সম্বন্ধে আলোচনায় তোলা স্থিতধীর পরিচয় নয়।[২৬] দুটি রচনাই 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত কোনো কোনো রচনার প্রতিবাদ—এবং বাদপ্রতিবাদ এই সূত্রে আরো চলেছিল।[২৭]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শিল্পসাহিত্যের নানা বিষয়ের আলোচনায় ও বিতর্কে ক্রমশ বিষ্ণু দে নিজের মননকে শানিত করে তুলছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বৈদগ্ধ্য তাঁর ব্যক্তিত্বের সামগ্রী হয়ে উঠছে।

এর পর 'পরিচয়'-এর আবহাওয়ায় বিদেশী সাহিত্যের পঠনপাঠনের পরিধি গেল বেড়ে। তাঁর কারণ এই বিদেশী সাহিত্যের চর্চার মধ্যেই বাঙালি লেখকেরা আধুনিকতার ইশারা পেয়েছিলেন—তাঁদের নিজেদের পরিবেশে আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন এর বাস্তবতা। এলিঅট তো সর্বপ্রথম—কারণ তাঁকে আবিষ্কারের সূত্রেই সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। একে একে এসে গেলেন তাঁর মনোযোগ ও চর্চার সীমানায় মার্সেল প্রুস্ত, ডি. এইচ্. লরেন্স, ভার্জিনিয়া উল্ফ্-এর গদ্য, আই. এ. রিচার্ডসের সমালোচনা কিংবা পাউণ্ডের কবিতা। বিষ্ণু দে বলেন, 'এলিঅট হচ্ছেন আত্মসচেতনতারই মহাকবি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে আত্মসচেতন মানস । আত্মসচেতনতার সাহিত্যরূপ অবশ্য গদ্যে দেখা গেছে প্রুস্তে, জয়সে, কাফকায়, পাস্টেরনাকে, খানিকটা ভার্জিনিয়া উল্ফে।'[২৮]

অতএব 'পরিচয়ে'র ১ম সংখ্যায় (১৯৩১) বেরোল তাঁর কবিতার সঙ্গে সঙ্গে মার্সেল প্রুস্তের অনুবাদ—'প্রুস্তের আটভাগে প্রকাশিত "অতীতের অন্বেষণে" নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড থেকে এ কয় পৃষ্ঠা নেওয়া।'[২৯] ঐ একই বছরে (এবং দু-বছর পরে আবার) বেরোল ডি. এইচ্. লরেন্স সম্পর্কে তাঁর সানুরাগ শ্রদ্ধা—'তাঁর মধ্যে জ্বলন্ত যে প্রাণ তার আগুন'-এর অনুভব। অলডাস হাক্স্লি বা রোনাল্ড বট্র্যাল বা অডেন গ্রেগরি পার্স্‌ন্স্ এবং বিশেষ

ভাবে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ সম্পর্কে পুস্তক-সমালোচনা লেখেন 'পরিচয়'-এর পাতায় পর পর। এলিঅট-সম্পর্কে তাঁর প্রথম আলোচনা বেরোয় বোধহয় ১৯৩২ সালে এবং ১৯৩১ সালে 'দি রক' ও 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'-এর বিষয়ে আলোচনা। এজ্রা পাউণ্ড এবং আই. এ. রিচার্ডসও সমালোচিত হয়েছেন ১৯৩৪-৩৫ সালে।[১০]

এই পরিবেশ-বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, একদিকে পশ্চিমী নিত্যনতুন তীব্র আঙ্গিকসাধনার মধ্যে যেমন বিষ্ণু দে খুঁজে নিতে চান আত্ম-পরিচয়—বুর্জোয়া আঘাতের উত্তবে ভঙ্গুরতার বা বিচ্ছিন্নতার আত্মসচেতন প্রত্যাঘাতে—তেমনি অন্যদিকে বিষয়নিষ্ঠা বা আবেগনিষ্ঠার মধ্য দিয়েই পেতে চান খণ্ডচৈতন্যের যন্ত্রণাবোধ।

কিন্তু এই আঙ্গিক-চেতনা ও যন্ত্রণাবোধ বা বিচ্ছিন্নের বোধ আসল রূপ পায় এ-সময়কার কবিতা-রচনায়। ব্যঙ্গে, কখনো আত্মসচেতন আবেগ-অনুভূতির উল্লাসে বা কখনো একাকীত্বের তীব্র বেদনাবোধে কবিতাগুলো পরিকীর্ণ। অভিজ্ঞতার এই দ্বন্দ্ব এনে দেয় নতুন ভাষা, নতুন উচ্চারণ, নতুন বিন্যাস—আধুনিক কাব্যনন্দনের চাপে নতুন ধারণা আঙ্গিকের ও বিষয়ের। ফলে অনভ্যস্ত পাঠককে হোঁচট খেতে হয় বারবার। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো সদা-উদ্‌গ্রীব চলিষ্ণু পাঠকেরও রসগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়, এমনই মৌলিক এব নবীনত্ব।[১১]

এই মৌলিক ব্যবধানের জন্যই বিষ্ণু দে যেমন শুরু করতে পারেন রবীন্দ্রনাথের 'অনভ্যস্ত' 'আদর্শ' থেকে, তেমনি এই ব্যবধান নেহাতই ভঙ্গি বা ছদ্মবেশ নয় বলেই সাবালকের মতো গ্রহণ এবং ব্যবহার করতেও পারেন রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ। যিনি কাব্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ থেকে সবচেয়ে আলাদা, তিনিই সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রবল ভক্ত পাঠক। বোঝা যায়, সম্পূর্ণ নতুন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতায়, তৎকালীন সাহিত্যিক গয়ংগচ্ছতার বিরুদ্ধে বিষ্ণু দে-র কবিতা যে 'অভিনবত্ব' সৃষ্টি করেছিল, তারই সুস্থ বিকাশ পদ্যের 'লঘুরস' থেকে ক্রমশ আত্মসংকটের সাক্ষাৎকারে, 'অনিদ্রাতাড়িত স্নায়ুর জ্যাবদ্ধ' উল্লাসে ও বিষাদে। এই বিকাশ আরো পরে কীভাবে সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এবং 'শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্বে' এগিয়ে চলল—'অবিচ্ছিন্ন কাব্যে'র ধারা শুরু হতে পারল এই দ্বিধাহীন স্বাতন্ত্র্য থেকেই, তার ইতিহাস তো অন্য।

১. বিষ্ণু দে, 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা'। লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৬৬। পৃ ৩।

২/৩/৭/২৫ বিষ্ণু দে, 'নব সাহিত্যতত্ত্ব'। 'ধূপছায়া', আশ্বিন ১৩৩৫ ব।

৪/১৬ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ'। ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৩৫৭ ব, পৃ ২৮৫।

৫. বিষ্ণু দে, 'আরব্ধ কবিতা'। 'কল্লোল', বৈশাখ ১৩৩৬ ব।

৬. হিরণকুমার সান্যাল, 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র'। প্যাপিরাস, ১৯৫৫। পৃ ৭২।

৮/৯/২৬ বিষ্ণু দে, 'আপন মনে'। 'প্রগতি', ভাদ্র ১৩৩৬ ব।

১০. 'প্রগতি'-র ৩ বর্ষ ৩ সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৩৬ ব) বিষ্ণু দে-র 'আপন মনে' প্রবন্ধটির সঙ্গে-সঙ্গেই ঐ সংখ্যাতে বুদ্ধদেব বসু-র দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রতিবাদ ছাপা হয়েছে—এই পুরনো বাদানুবাদের মধ্যেই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য খুব স্পষ্ট।

১১. এই অনুচ্ছেদে এবং পরের অনুচ্ছেদে প্রমথ চৌধুরীর যে সমস্ত উক্তি বা তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—এ সবেরই উৎস পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা' (বিশ্বভারতী, ১৩৫৮ ব, পৃ ১৪৫-২০৪)।

১২. ঐ।

১৩. বস্তুত triolet দুটিতে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব খুবই প্রত্যক্ষ। এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য স্বয়ং বিষ্ণু দে নির্বাচিত প্রমথ চৌধুরী-র 'ত্রিওলেত' শিরোনামের অন্তর্গত ৪টি কবিতা (বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা'। সংস্করণ, ১৯৫৩, পৃ ২৪-৫)। এই কবিতাগুলির ছায়া এখানে বিষ্ণু দে-র উপর পড়েছে বলে মনে হয়।

১৪. বুদ্ধদেব বসু, 'চোরাবালি'। 'কালের পুতুল'। কবিতাভবন, ১৯৪৬। পৃ ৮৭।

১৫. দ্র. ১১নং টীকা। আগের তিনটি উদ্ধৃতির-ই উৎস এই।

১৭/১৯/২১ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে লিখিত প্রণতি দেবী-র অপ্রকাশিত চিঠি। দ্বিতীয়টিতে : চিঠিতে সংযোজিত মন্তব্য বিষ্ণু দে-র।

১৮. বিষ্ণু দে, 'পুরাণের পুনর্জ্জন্ম'। 'প্রগতি', ফাল্গুন ১৩৩৪ ব।

২০. প্রত্যেকটি গল্পই খুব ছোট আকারে—৪/৫ পৃষ্ঠার। 'ফিরে-ফিরতি' ('প্রগতি', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ ব) গল্পে সৃষ্টীশ ও সুব্রতা এবং সৃষ্টীশ ও অরুণার অসহ্য মন-দেওয়া নেওয়ার খেলা—নাগরিক কৃত্রিম 'flattery' এবং 'rivalry'—তার বর্ণনায় লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তি, যদিচ সিনিসিজমে ভরপুর, দ্রষ্টব্য। 'বাসর-রাত্রি' ('প্রগতি', আষাঢ় ১৩৩৫ ব) গল্পে বিলাত-প্রত্যাগত স্বামী সুরেশের জন্য স্ত্রী সুষমা-র ব্যাকুল প্রতীক্ষা, সুষমাকে দেখে সুরেশের আশাভঙ্গ, সন্দেহ, বিষাদ ইত্যাদি বহুবিধ ভাবালু হৃদয়চর্চার বিবরণ এবং অবশেষে মিলন—সমস্ত বর্ণনাতেই ঠাট্টার সুর তীব্র। 'বন্ধু' ('প্রগতি', অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ব) গল্পে স্কুলের বন্ধু ভগ্নহবির প্রায় আদিম ভালবাসারিটিকেই শুধু লেখক ঠাট্টা করেন নি—ঠাট্টাটা আর্টিস্ট-বন্ধু বসন্ত এবং নিজেকেও। প্রমথ চৌধুরীর ঢঙে রেষ্টুরেন্টের আড্ডার গল্পে কাহিনী বা চরিত্রগুলো প্রকাশ্য হয়েছিল। 'হিরো' ('প্রগতি', আষাঢ় ১৩৩৬ ব) গল্পটিতেও—আগের মতোই আড্ডার সূত্রে লেখা—প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব খুব স্পষ্ট। তারুণ্যের স্বপ্নখচিত দিনে লেখকের হিরো সীতেশ কিভাবে নিকৃষ্ট কুৎসিৎ বিবেকহীন চরিত্র রূপে

প্রকাশিত হল, তার অনায়াস বিবরণ।

২২. বিষ্ণু দে, 'শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ'। 'ধূপছায়া', আষাঢ় ১৩৩৫ ব। শ্যামল রায় ছদ্মনামে পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ।

২৩. বিষ্ণু দে, 'লরেন্স্ স্ন্যাট্‌কিন্‌সন্'। 'বিচিত্রা', বৈশাখ ১৩৩৬ ব।

২৪. বিষ্ণু দে, 'অগষ্টস্ জন্'। 'বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৩৬ ব।

২৭. 'ধূপছায়া', শ্রাবণ ১৩৩৫ ব।

২৮. বিষ্ণু দে, 'এলিঅট', 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'। সিগনেট, ১৩৫৯ ব, পৃ ১১৬।

২৯. বিষ্ণু দে, 'বিচ্ছেদ' (অনুবাদ)। 'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৩৮ ব।

৩০. এই সময়ের বিষ্ণু দে-র গদ্যরচনা :

'ডি. এইচ্. লরেন্স' (পুস্তক-সমালোচনা), 'পরিচয়', কার্তিক ১৩৩৮ ব (১৯৩১)।
'অলডাস্ হাকস্‌লি' (ঐ), ঐ, মাঘ ১৩৩৮ ব (১৯৩২)।
'রোনাল্ড বট্‌র্যাল' (ঐ), ঐ, শ্রাবণ ১৩৩৯ ব (১৯৩২)।
'এলিঅট, অডেন, গ্রেগরি, পার্সন্‌স্' (ঐ), ঐ, কার্তিক ১৩৩৯ ব (১৯৩২)।
'আধুনিক স্থাপত্যের অর্থ' (ঐ), ঐ, মাঘ ১৩৩৯ ব (১৯৩৩)।
'ডি. এইচ্. লরেন্স' (ঐ), ঐ, মাঘ ১৩৩৯ ব (১৯৩৩)।
'ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ ও ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি' (ঐ), ঐ, বৈশাখ ১৩৪০ ব (১৯৩৩)।
'এজ্রা পাউণ্ড', 'সোভিয়েট সাহিত্য' (ঐ), ঐ, কার্তিক ১৩৪১ ব (১৯৩৪)।
'রিচার্ডসের কল্পনা' (ঐ), ঐ, শ্রাবণ ১৩৪২ ব (১৯৩৫)।
'টি. এস্. এলিঅট' (ঐ), ঐ, কার্তিক ১৩৪২ ব (১৯৩৫)।

অবিচ্ছিন্ন কাব্য

১৯৩৩—১৯৫০

'তীর্থযাত্রী হৃদয় আমার'

'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি'—একই সময়সীমার মধ্যে রচিত বিষ্ণু দে-র প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে কবির আত্মবিকাশের একেবারে প্রাথমিক স্তরের চিহ্নগুলো সাজানো রয়েছে পর পর : বয়ঃসন্ধির আশানিরাশা, সত্তার গোড়াকার সংকট এবং সেই সংকট নিরসনের প্রাথমিক উদ্যোগ ও সাফল্য। বিশেষ করে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থে তারুণ্যের মথিত আবেগ তোলপাড় করে তুলেছে সংশয়ের ও সংকটের এই চেহারাকে। অর্থাৎ এটা যেমন অপরিণত তারুণ্যের ও সংকটসঙ্কুল ব্যক্তিত্বের কাব্য, তেমনি আবার এখানেই ইশারা পাওয়া যায় কীভাবে যৌবনারম্ভের এই স্তরকে তিনি পার হয়ে যাচ্ছেন, পরিণতি অর্জন করতে চলেছেন, বা বলা যায়, এমন সব চাবি খুঁজে নিচ্ছেন, যা নিয়ে যেতে পারে কাব্য-আকাঙ্ক্ষার অন্য প্রকোষ্ঠে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থটি সেই ভেতবকার সংগ্রামের ও বিকাশের ইতিহাস।

এই গ্রন্থের পাতা উল্টে কবির যে ছবি পাঠকের সামনে থেকে যায়, তা হচ্ছে বয়ঃসন্ধির পর্বে এক ইন্দ্রিয়-সজাগ তরুণ কবির উল্লাস ও বিষাদ, নৈঃসঙ্গ্য ও তীব্র সংবেদন কীভাবে দানা বাঁধছে এবং মুক্তির পথ খুঁজে নিচ্ছে। সবল যৌবনের যা যা লক্ষণ থাকে, তা সবই আছে : মনের স্বাস্থ্য ও তেজ, উপলব্ধির অপরিপক্ক কিন্তু সম্ভাবনাময় রূপ, প্রেমানুভূতির তীব্র আকুতি অথচ বিষাদ ও নৈঃসঙ্গ্য। সব মিলিয়ে যৌবনের একটা গোটা বিকাশোন্মুখ চেহারা। অনুভূতির উল্লাস যেমন, তেমনি ব্যক্তির বিষাদ ও একাকীত্বের বোধও সুস্থ যৌবনেরই লক্ষণ। শুধু চিনে নিতে হয়, সেটা বড় কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিনা কিংবা তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার অন্তর্নিহিত কোনো চাপ আছে কিনা।

বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থে যে কাব্য-আবেগের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বিষয় ও উপকরণের যতটা অভিনবত্ব, তার চেয়ে বেশি অভিনবত্ব বা স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, এই প্রথম পর্যায়েই, যৌবনোচিত সংবেদনের সীমানার মধ্যেই, তাঁর প্রকাশভঙ্গি বিস্ময়কর রকমের আত্মসচেতন। এই আত্ম-সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করে কবিতায় ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শব্দাবলি বা বাক্‌প্রতিমা বা বাক্যগঠনের ধাঁচ। বাংলা কবিতার টিপিক্যাল রাবীন্দ্রিক শব্দ-উচ্চারণ, শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনেকটা ত্যাগ করলেও, এমনকি বিষ্ণু দে-র সমসাময়িকেরাও আঁকড়ে ধরে ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং অন্যান্য আরো অনেকেরই প্রথমযুগের কাব্যভাষাতে ভাষার ঐ অভ্যাস সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে এমন বলা যায় না। কাব্য ভাষার আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁদের বোধ তখনও অনেকটাই রক্ষণশীল। বিষ্ণু দে তুলনায় কাব্যিক ভাষার বর্জনে ভাষার মধ্যে দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের সঞ্চারে বোধহয় অধিকতর নিশ্চিত। যে-কথা সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হিরণকুমার সান্যাল বলেছিলেন, তা অনেকের সম্পর্কেই খাটে : '...অনেক কবিতাতেই কী মেজাজে, কী সাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল। সুধীন কাব্যরচনার হাতে-খড়ি করেছিল রবীন্দ্র-নাথের হরফেই হাত বুলিয়ে, বিষ্ণু দে-র মতন নতুন বর্ণমালা উদ্ভাবনের চেষ্টা না করে।'[১] বুদ্ধদেব বসু-র 'মর্মবাণী' (১৯২৪), জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক' (১৯২৭) বা সুধীন্দ্রনাথের 'তন্বী' (১৯৩০)—এই প্রথম রচনাগুলির সঙ্গে বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর (১৯৩৩) তুলনা করলেই তাঁর ভাষার এই নবীনতা বোঝা যায়।

ভাষার দার্ঢ্য ও পরিচ্ছন্নতা, শব্দ-সমাবেশের আত্মসচেতন ঝাঁকুনি ও আকস্মিকতা—এরকম নানা লক্ষণ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকেই গঠিত হতে শুরু করেছে। ইতস্তত উদাহরণেও তাই পেয়ে যাই এই সব শব্দ-সমন্বয় :

> সিল্কমসৃণ শাদা আর ছোট পাণ্ডু ললাট / বক্ষে শুনেছি গ্রহদের বেগ / সফরী চোখের সরল চাহনি / তোমারই প্রতিমা দেখি নগরীর পটে অবিশ্রাম / সাতটি দিন ও রাত্রি একটি কবিতা আমার / নির্ণিমেষ দেখি তুমিনিট, স্তব্ধতার শব্দ মাঝে একা / নিদ্রা আনে নবহর্ষরথে নবজাত পৃথিবী আমার / অগ্নিশিখা ঢাকো নীল মেঘে / অসিধার কঠিন আকাশ / নগ্নতায় দীপ্ত তনু / অজ্ঞাত ধমনী / সৃজনের রূঢ় প্রেমাবেগ / গলন্ত তামার দীপ্ত রক্তিম চুম্বন / শব্দখর কুৎসিৎ নগর / পদতলে স্টীলনীল পারহীন

গভীর সাগর / স্নায়ুআলোড়িত উতলা কম্পন / আকাঙ্ক্ষার আমার আকাশ / বাসনার আশ্চর্য সিমফনি / মরেছে জোয়ার / গোধূলির দেহহীন আলো / দিশাহারা অস্তরাগ / অরণ্যের বিদেশী নিশ্বাস / স্তব্ধতার দীপ্তি / স্নানস্বচ্ছ লঘুদেহ / আলোক সোনাটা।

উদাহরণগুলির একেকটা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সচেতনতাই প্রমাণ করে। কোথাও শব্দের নির্বাচনে বা ঈষৎ স্থানপরিবর্তনে, কোথাও বাক্‌-প্রতিমার কল্পনায় বা আবিষ্কারে ঐ তীক্ষ্ণ সজাগ আধুনিকতার সূত্রপাত।

এই সুস্থ নতুনত্বের সৎ তাগিদেই ভারতীয় ঐতিহ্যাগত পুরাণ-উপমার পাশে সাবলীলভাবে এসে যায় প্রতীচ্য পুরাণের উল্লেখ। অবয়বের এই আধুনিকতাকে সমসাময়িককালে বুঝে ওঠা হয়তো একটু মুশকিল, একটু সন্দেহ থেকেই যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের চিঠিতেও যেন এই সংশয়ের সাক্ষাৎ পাই।[২] কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই সহাবস্থান কোনো আন্তরিক তাগিদ থেকে নয়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রসঙ্গেও সে-কথা ওঠে। বিষ্ণু দে নিজেই সে-প্রসঙ্গে অনেক পরে লেখেন, 'অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত এই দুয়ের মধ্যে নির্ভয় যোগাযোগে আধুনিক শিল্পীর প্রেরণা অর্জন করে একাধারে তার আন্তরিকতা ও তার বিশিষ্ট আততি। তার প্রেরণার সততাই আধুনিক শিল্পের দুঃসাহসী অভিযানের মূল শক্তি। অনেকে ভাবেন, একালের শিল্পীরা-লেখকেরা জোর করে যেন চালাকি করে তাঁদের ধাক্কা দেন। আমার এক বন্ধুর উদাহরণ দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করি। তিনি মনে করেন, ধরা যাক, "উর্বশী ও আর্টেমিস"-এ এই যোজনা ঐ শ্রেণীর ব্যাপার। কারণ তাঁর কাছে উর্বশী বেদ থেকে কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ, কিন্তু আর্টেমিস তাঁর সাহিত্যিক হিঁদুয়ানিতে অপরিচিত লাগে। .. কিন্তু কবিতাটিতে এবং সেই থেকে বইটির নামকরণে উর্বশী-প্রতীকের কেন্দ্রের বিপরীত কাব্যাবেগ দানা বেঁধেছিল আর্টেমিসের রূপে, শুচি কৌমার্যের তনু দেবী, চন্দ্রের হিম-অধিষ্ঠাত্রী, শিকারের দেবতা আর্টেমিসেই। এবং এর জন্য শুধু ইংরেজি কাব্যলোকই যথেষ্ট। তা ছাড়া হয়তো ভারতীয়-গ্রীক যোজনাও মনের পিছনে ছিল।'[৩] কবির বন্ধুর কাছে আপত্তিজনক ঠেকেছিল—কিন্তু আমরা জানি, 'উর্বশীর মায়া'-র জগৎ ছেড়ে যে কবি নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রার ব্রত গ্রহণ করেছেন, স্বপ্নে রেখেছেন কৌমার্যের তনু বলীয়ান রূপ - তাঁর অভিজ্ঞতায় উর্বশীর পাশে আর্টেমিস কতখানি আন্তরিক ও সংগত। সুতরাং তথাকথিত অভিনবত্ব বা নতুনত্ব মূলত আত্মসচেতনতারই

নামান্তর—আর এখানে তো কবির আত্মসচেতনতারই শুদ্ধ তীর্থযাত্রা।

আত্মসচেতনতার তৃতীয় লক্ষণ হিসেবে পাই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া বা ব্যক্তিকেন্দ্রের বাইরে যাওয়ার অবিরল অভীপ্সা কবির মনে। ভাষাগত শৈথিল্য বা আত্মসর্বস্ব বিষাদকে ঝেড়ে ফেলে মনের যে ক্ষিপ্রতা কবিতার শরীরে একটা আঁটসাঁট ভাব ও মধ্যপদলোপী দুরূহতা এনে দেয়, তার মূলেও এই খোলস ছেড়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা। এই নিরন্তর ছাড়িয়ে যাওয়া, বলাই বাহুল্য, পরিণতির দিকে যাত্রা। এ-কারণেই তো অশোক সেন 'উর্বশী ও ও আর্টেমিস'-কে বলেছেন 'প্রত্যক্ষের বা উপলব্ধির যাত্রারম্ভ'।[৪]

—

এই সীমাতিক্রমী চলিষ্ণুতার স্পষ্ট প্রমাণ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রতিমার বা অনুষঙ্গের পুনরাবর্তন। হয়তো কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে 'বলাকা'-র কথা, যদিও বলাই বাহুল্য অনেক কিছুই সেখানে আলাদা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বা নক্ষত্রলোকের এই সব প্রতিমা বা নিছক শব্দই এমন একটা ব্যাপ্তি এনে দেয়, যা 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর ব্যক্তিযন্ত্রণায় কাতর কবির পক্ষে ছিল অত্যাবশ্যক। এই শব্দপ্রাচুর্য থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যায় অবশ্যই।

> বক্ষে শুনেছি গ্রহদের বেগ ('পলায়ন') / তোমারই অস্তিত্ব সৌরকেন্দ্র ('কাব্যপ্রেম') / অগ্নিশিখা ঢাকো নীল মেঘে / তোমার নেব্যুলা চোখ নক্ষত্রের জীবনে আমার…বিপ্লবের নৃত্য যে জাগায় / শূন্যতার আকাশ-কিনারে / ঢেকে দাও মুখ ঢাকো ছায়াপথ তোমার আঁচলে / তোমার নক্ষত্রচোখ দূরে নিয়ে যাও ('প্রেম') / আকাশের নক্ষত্র-আভা ('উর্বশী') / মেঘের তরঙ্গে ভেসে মৃত-স্বপ্ন আমার প্রিয়ারা ‥ চলে যাক সপ্তর্ষির পারে ('পর্যাপ্তি') / নক্ষত্রদেয়ালি নেই ('রাত্রিশেষে') / নভচারী উৎক্রোশ / তোমার হৃদয়ে তারা ঘোরে নানা রূপে রূপে নক্ষত্রসভায় ('প্রজ্ঞাপারমিতা‥')।

বিষাদ ও নৈঃসঙ্গ্যের পাশে-পাশে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রেরণা যদি না থাকে তবে ব্যক্তিময়তা চেহারা নেয় নিছক আত্মরতির (ঠাট্টা করে যে কথা কবি বলেছেন, 'হে স্যর্সি, বেঁধেছ মোরে, আরো বাঁধো')—কল্পনা ও অনুভূতির পরিণতি ঘটে বিকারে। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখেছি। কিন্তু তরুণ বিষ্ণু দে নির্মোহ আত্মজিজ্ঞাসার নির্ভরতায় ব্যক্তিময়তার

শূন্যগর্ভ লোভ এড়িয়ে অত অল্প বয়সেই উপার্জন করতে চেয়েছেন পরোক্ষতা—বিষাদ ও নৈঃসঙ্গ্যকে টেনে নিয়ে গেছেন কোনো দার্শনিকতার মামুলি সমাধানে বা আপ্তবাক্যে নয়, পরিপূর্ণ নেতির দিকে। একেই বলা হয়েছে 'কঠোর নেতির সাহস ও সংযম্'।[৫] স্বাভাবিক যা ঘটে থাকে, অর্থাৎ 'ব্যক্তিচিত্রকে জগৎচিত্র ভাবার' ভ্রান্তি (বিষ্ণু দে-র নিজেরই ভাষায়) তাঁকে পেয়ে বসে নি—বরং বয়ঃসন্ধির ও অনুভূতিপ্রবণ প্রথম তারুণ্যের বিষাদযন্ত্রণার শুদ্ধ রূপ আবিষ্কারে মগ্ন থেকেছেন। যৌবনজ্বালা তিনিও ভোগ করেছেন, কিন্তু পরম ধৈর্যে তাকে রূপান্তরিত করেছেন নেতির যন্ত্রণাময় উপলব্ধিতে। তাই আগের ঐ আলোচকের ভাষাতেই বলা যায়, কবি 'নেতির পূর্ণতা চান স্নায়ুতে পেশীতে, শরীরে মননে, নিরালম্ব অস্তিত্বের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতে।' এবং এই নেতিই অগ্রসর হবার সোপান—প্রগতির প্রথম সিঁড়ি।

বলাই বাহুল্য এই নেতির একটা বড় আধার এ-সময়ে প্রেম। প্রেম সম্পর্কে যা কিছু রোমান্টিসিজম, যা কিছু মায়া-মোহ, প্রেমের চিরন্তনতা বিষয়ে যা কিছু স্বপ্ন বা কাতরতা—সবকে তিনি ত্যাগ করলেন। উর্বশীর মদালস সঙ্গ ত্যাগ করে গ্রহণ করলেন আর্টেমিসের কঠোর নিঃসঙ্গতাকে। পুরূরবা উর্বশীকে চিরকাল ভালোবাসার কথা বলেছিল। কবি জানালেন, 'আমি নহি পুরূরবা।' এবং পরে মিতভাষণের তীব্রতায় বললেন: 'ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।'

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর ১৯৩০-৩১ সাল নাগাদ কবিতাতে দেখা যায় এই বিরাগ ও শূন্যতাবোধ খুবই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। প্রেম সম্পর্কে অবিশ্বাস বোধহয় এ-সময়ের সব আধুনিক কবিরই বৈশিষ্ট্য। এখানেও সংযত ভাষায় তাঁর 'বিবমিষা' খুব প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায়।

শেষ পর্যন্ত দেখি, এই নেতিকে যে বলা হয়েছে 'প্রগতির প্রথম ক্ষোভ' বা আরেকটু বেশি অর্থসমারোহে; 'রাত্রিশেষে আসে অনাগত দর্শনের প্রভাত' —তা খুবই ন্যায্য।[৬] এই নেতির অর্থ নিঃশেষও নয় বা মনোবিকারের সূত্রপাতও নয়। এই শুদ্ধ নেতি—'নেতির নির্মোহ যন্ত্রণা'—আসলে ইতিবাচক একটি অভিজ্ঞতাই—নিয়ে যায় কবিকে প্রতিবাদে ও বিক্ষোভে—সাবালকত্বে। তাই এই যৌবনোচিত সংবেদনের—'সবল, চরিত্রদীপ্ত, সুকুমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি'-র —বস্তুত আত্মসচেতনতারই—পরিণতি প্রতিবাদে ও বিক্ষোভে। এই প্রতিবাদেরই একটি আদর্শ প্রতিমা নিঃসঙ্গ একাগ্র তীর্থযাত্রীর মধ্যে—কবির কথায় 'বলিষ্ঠতা নিঃসঙ্গ চলার'। তাই বিলাপে শেষ নয়, বিরাগ ও বিষাদ

তাকে নিয়ে যায় শূন্যতা ও নেতির শুদ্ধতায় এবং তা থেকে স্নাত হয়ে বেরিয়ে আসেন তিনি তাঁর 'ক্ষুরধার' ব্রতে। এই কঠিন ব্রত আর কিছুই নয়, ব্যক্তি-সর্বস্বতার মোহ ঝেড়ে ফেলে নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে চলেছে যে তীর্থযাত্রী, তাঁর ব্রত।

'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থে যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বা প্রতিমা বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো সাজিয়ে নিয়ে বসলেই বোঝা যায় কিভাবে এই আত্মসচেতনতা পর্যায়ক্রমে কাজ করেছে। পুরনো জগতকে ছেড়ে—'পুরাতন ভগ্ন অলঙ্কার'-কে ছুঁড়ে ফেলে—নতুনের দিকে যাত্রার সঙ্কল্প যে তীর্থযাত্রীর, স্বভাবতই তাঁর শব্দব্যবহারে আবেশ বা মোহের কথা, কামনাতাড়িত দেহ বা শরীরের কথা, স্বপ্ন ও মায়ার কথা বারবার আসবেই, বর্জনীয় উপাদান হিসেবেই আসবে। তাই প্রথমেই লক্ষণীয় ঘুরেফিরেআসা শব্দ : স্বপ্ন কিংবা দেহ বা শরীর কিংবা আবেশ বা মোহ ইত্যাদি। এই শব্দগুলি সমস্ত গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে—যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত সৈন্যের বাতিল অস্ত্রশস্ত্রের মতো। একত্র জড়ো করলে সেগুলো এরকম দেখাবে :

- স্বপ্ন স্বয়ম্বর/স্বপ্নের নিবিড় কুয়াশা/চিত্রকর ভাস্করের স্বপ্নমূর্তি/স্বপ্নে আজ দেখেছি তোমাকে/স্বপ্নের আদি লোক/আদি স্বপ্ন/স্বপ্নছায়ে গেছে দিন. লঘু দিন/রূপকথা-স্বপ্ন বয়/তোমার চেতনাঘর স্বপ্নে আজ করেছে রঙিন।

  যে মায়া বিছায়/যে মায়া ছড়ায় চেতনায়/লাবণ্যের মায়া আজ ধরেছে আমায়/আমার চেতনা ছেয়ে মায়া জাগে/উর্বশীর মায়া লাগে।

  গোধূলি রঙিন তনু/তোমার দেহের মাঝে/দেহে তব গোধূলির ছায়/ উরুবন্ধে বাহুবন্ধে বাঁধো/উর্বশীর দেহের আস্বাদ/উর্বশীর স্তন উর্বশীর পাণ্ডু উরু শুভ্র বাহু/নারীদেহরঙ্গিমা/পরশকম্পিত দেহ।

  শ্বেতচন্দন লেপ/কুমারী ভঙ্গিমা/ফুলের শয়ান ড্যানায়ে/গন্ধে আতুর/ ভারাক্রান্ত মোহ/রাধিকা চাঁদ/সবুজ কুঞ্জবন/সুঠাম সুশ্রী মেদসুকোমল প্রিয়া/সুমধুর কাকলি/বাসনাবিলাস/উপবন পূর্ণিমা/দোল রাত্রি/ কোজাগরী যামিনী জাগর/আবিরে মাতাল রাত্রিদিন/কোজাগরী শশী/ সমুদ্রবীজন-স্নিগ্ধ/দক্ষিণের কোমল বাতাস/আনন্দিত মোহ/সন্ধ্যার এ

ম্লান ক্লান্তক্ষণ/সন্ধ্যার কবিত্বময় কোমল আলো/রোমাঞ্চনিবিড় স্বরে সঙ্গীতমায়ায়/রূপকথা-স্বপ্ন/সন্ধ্যার বর্ণের ছটা/তন্দ্রালস সন্ধ্যা/সবুজের বাস/সবুজ সমুদ্রে ওঠে অগণন ঢেউ।

তোমার সর্পিল কেশ/তোমার কেশের গন্ধ/হ্রস্ব বন্ধহীন কেশে অন্ধকার কুঞ্চনে কুঞ্চনে/শীতল আঁধারে স্বরভি চুলের।

ইচ্ছে করলেই এ ধরনের পুনরাবৃত্ত শব্দ বা প্রতিমার তালিকা বাড়িয়ে যাওয়া যায় এবং দেখানো যায় কিভাবে 'সবুজ', 'সন্ধ্যা', 'কোজাগরী', 'গোধূলি', 'কেশ' শব্দগুলি নানা সমাসসম্বন্ধে ঘুরে ফিরে আসছে।

কিন্তু এ গ্রন্থে আসল কথা তো স্বপ্নভঙ্গের কথা—কারণ উর্বশীর মায়ার জগৎ, দেহের কামনার হাতছানি, সন্ধ্যার কবিত্বময় আলো-কে উপেক্ষা করেই তো তাঁর জয়। স্বপ্নের জলপরী যে নেয়াডের (naiades) কথা বারবার আসে—সেই হাস্যলঘু নেয়াডের দিন আজ শেষ।

স্বপ্নে তারা হারায় দীপ্তি/তোমারই স্বপ্ন দেখেনি গর্ভস্থ নিখিল/স্বপ্নদের সমাধি গহ্বর/স্বপ্নগুলি পুরাতন ভগ্ন অলঙ্কার/স্বপ্ন সব ঠেলে দাও প্রভাতের গণিকার মতো/স্বপ্নের প্রাসাদ আজ ভেঙে দিয়ে তাই। ইত্যাদি।

কিন্তু রোমান্টিক যুগের ঐ স্বপ্নকে ফেলে কবি কোথায় যাবেন? এমন এক জগতে যেখানে মোহের আবেশ নেই, রূপের মায়াজাল বা 'দেহের অন্তহীন আমন্ত্রণ বীথি' নেই? রবীন্দ্রনাথ তো এই সৌন্দর্যবিলাসী জগতেরই একজন—তাই কবি ঘোষণার ভঙ্গিতে জানালেন, 'হেথা নাই স্বশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্রঠাকুর।' সহজ রোমান্টিকতার অনায়াস সুখ ছেড়ে কবি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন দুঃখ ও অনিশ্চয়তাকে—একাকীত্বকে—দুশ্চর তপস্যাকে। এরই প্রতিনিধি হিসেবেই যেন কয়েকটি শব্দ এ-গ্রন্থে সবচেয়ে বেশি ফিরে ফিরে আসে—অন্ধকার, সমুদ্র, রাত্রি—বা কখনো সব কটিই একসঙ্গে : রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্র—এবং নিদ্রাহীন নিঃসঙ্গতা।

অন্ধকারে রাত্রি লেপে দাও/স্থিরতা-নিঃশব্দ অন্ধকার/অন্ধকারে হৃদয়/অন্ধকার জল/অন্ধকার জনহীন রাত জাতিস্মর ওঠে অন্ধকার/উগ্র অন্ধকার/গর্ভ অন্ধকার/অরণ্যের অন্ধকার/কণ্টকিত অন্ধকার/রাত্রির আঁধার/জনহীন স্তব্ধ অন্ধকার/অজ্ঞতার এ গূঢ় অন্ধকার/জনতা আঁধার।

সমুদ্রের অন্তহীন বুক/লবণাক্ত জল/সাগরের দেহ / সাগরের অভিসার/ সমুদ্রের স্নায়ু আজ অবসন্ন/শূন্যতার অশেষ সাগর/সমুদ্র মরুভূ হল আজ।

রাত্রির স্তব্ধতা/রাত্রির ঘোমটা-ঘেরা সমুদ্র/অন্ধকা'র সমুদ্র।

বিনিদ্র আমার ভয়/নিদ্রাহীন ভয়/অনিদ্রার ঘন কালিমা/অনিদ্রার শূন্য / নিদ্রাহীন অন্ধকার / নির্নিমেষ অনিদ্রা / কত রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে/নিদ্রাহীন উত্তপ্ত শয্যা।

মোহ ও আবেশের রোমান্টিক জগত ছেড়ে আসার পর কবির মনে যে তীব্র নৈরাশ্য ও বিবিক্তি— হিম-অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা—এবং তার ভেতরের টেনশন জাগে, যাকে বলা হয়েছে নেতির নির্মোহ যন্ত্রণা, তার স্পষ্ট ও গভীর প্রতিমা এই অন্ধকার রাত্রির সমুদ্র। কবি এক কথায় তা বলেও দেন: 'সাগরের অভিসার আমার চৈতন্যে নিত্য চলে'—এবং এ-যুগে অন্তত সাগরের রূপ ঐ রকমই। ফলে এটা শুধু নেতি হয়েই থাকে না। পাশাপাশি নিদ্রাহীনতার পুনরুক্তি কবির মনের এই ক্লিষ্ট স্নায়ুকে, জাগ্রত বিক্ষোভকে, আত্মসচেতনতার যন্ত্রণায় দীর্ণ মনকে তুলে ধরে।

এই পরিবেশে সাবেকি প্রেম বা চিরন্তন প্রেম পরিত্যক্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! বারবার সে-কথা ওঠে:

প্রেম আজ ঘরছাড়া/প্রেম আর সাথী মোর নয়/আজ আর প্রেম নয়/আমার হৃদয়ে আজ প্রেম নেই/সে ছায়ায় প্রেম নেই।

সে কারণেই কবি 'ক্ষণিকের মর-অলকা' বা 'ক্ষণিকের আনন্দ-আলো'-র কথা বলে চিরন্তনতাকে উপহাস করেন—'মুহূর্ত-বিম্বে চিরন্তনেরই ছবি' দেখতে চান।

ফলে নিঃসঙ্গতাই কবির পাওনা হয়। 'সঙ্গীহীন দিন মোর/সঙ্গীহীন রাত্রি মোর।' অবশ্য এই নিঃসঙ্গতা শুধু পাওনা বললে ভুল হবে, আকাঙ্ক্ষাও বটে। 'শব্দখর কুৎসিৎ নগরে'—'মানুষের অরণ্যে'— যে ভিড় ও বেসুর, তা তাঁকে ক্লিষ্ট করে, তাকে ছেড়ে আসতে পারায়ও আনন্দ তাঁর। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই, আজ এই একাকীত্বে, নিজেকে মনে হয় 'বিদেশী পথিক'। প্রথমাবস্থায় ভয়ও জাগে— একাকীত্বের ভয়—পুরনো জমি ছেড়ে এসেছেন, নতুন জমিও অর্জিত হয় নি।

হাস্যহীন জাগে শুধু ভয়/মর্মরিত ভয়/বট আর অশথের ছায়াঘন কালো ভয়গুলি / ভয়ের আবেগে ছেঁড়া / জলস্থলব্যাপী ভয় দেহ মন নিয়ত কাঁপায়।

কিন্তু এ ভয় তো পালানোর ফিকির নয়, আত্মসচেতনতারই রূপান্তর। তাই যাত্রা থামে না—কঠিন নিঃসঙ্গ যাত্রা—'সমুদ্রের শ্বাস টেনে বাক্যহীন চলেছি একেলা।'

ক্রমশ এই নিঃসঙ্গ পরিবেশই প্রত্যক্ষ মূর্তি পেল 'মধ্যাহ্নের খরসূর্যে' বা নগ্ন পর্বতে বা মরুভূমিতে—কিংবা আরো স্পষ্টতর ভাবে দধীচি বা বজ্রপাণির উপমায়। বিশেষ করে খর সূর্য ও নগ্ন পর্বতের প্রতিমা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে এই স্তরে।

> মধ্যাহ্নের খরসূর্য / মধ্যাহ্নের খররৌদ্রকর / খর রৌদ্রালোক / রৌদ্রালোকে তীর হল শুষ্ক মরুভূমি/বৈরাগিনী বালুকা।
>
> উলঙ্গ পর্বতে কভু উর্বশীর পড়ে নাই শ্বাস/কৃষ্ণ পর্বতের অঙ্গে নাই সবুজের বাস / শুভ্র ঋজু পর্বতশিখর / পর্বত আমাকে দিল আকাশের বৈরাগ্য মিতালি / পর্বতের শুভ্র দৃঢ়তা / জনশূন্য অরণ্য ও পর্বত বন্ধুর।

এই কঠিনের সাধনায় আরাধ্য সেই 'অর্ধনারীশ্বর', সব দ্বিধা ও দ্বৈতের অবসান, যার কাছে পৌঁছুবার জন্য প্রয়োজন হয় পৌরুষ যাত্রা—'পেশীরূঢ় বাহু দিয়া ভেদি চলি পর্বতশিখর'। এবং 'দধীচি অস্থি', বিশেষ করে 'কঠোর কঠিন বজ্রপাণি'-র অনুষঙ্গ বারবার আসে, রং-ও এ সময়ের 'পিঙ্গল'।

শেষ পর্যন্ত এই নেতির সমুদ্র থেকে উঠে আসে, বৈরাগ্যের আকাশ থেকে নেমে আসে—'বালিয়াড়ি পার হয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত চোখে'—'সুদীর্ঘ সুঠাম নগ্ন তনু বলীয়ান', তার মধ্যেই কবি শুনতে পান প্রাণের স্পন্দন, আদিম ও অন্তহীন সংগীত, শরতের সূর্যের মতোই যে স্বচ্ছ, সেই অগুণ্ঠিত নারী, গ্রীক দেবী আর্টেমিসই যার প্রতীক। এ রূপে কোনো মোহাবেশ নেই, আবেগোচ্ছলতা নেই, আছে নিঃসঙ্গ সৌন্দর্যের শুদ্ধতা।

> সদ্যস্মিত রজনীগন্ধার মতো একা,
> শুভ্র মরুভূর মাঝে একান্ত বিস্ময়
> তুমি এলে তরুণ তমাল…
> এলে তুমি নীরব নির্ভরে
> তনু সজ্জাহীন। ('প্রত্যক্ষ')
> অকস্মাৎ আবির্ভূত চোখে

রৌদ্রে ও স্বর্ণে মেশা পরিপূর্ণ তনু বলীয়ান। ('সাগর উত্থিতা')
স্নানশুভ্র কুমারী... ('ছেদ')

কবি কি তবে পৌঁছে গেলেন জীবনের 'প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞা'-য় ? ভয় কেটে গেল ? প্রেমিকের হাত থেকে পেলেন 'নির্ভরের দান' পুষ্পস্তবক—'চিরজীবী নোজগে আমার'। নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনার যোগ্য প্রতিমা পেলেন এই 'স্নানশুভ্র কুমারী'-র মধ্যে। ঠিক যেমন বারবার ব্যবহৃত বাহু' শব্দটি রূপ পায় নৈঃসঙ্গ্যের অবসানে নির্ভরতার প্রতিমা রূপে।

বাহুটি জড়িয়ে তাকে ব'লি··· ('প্রজ্ঞাপারমিতা · ')
বাহুটি শিথিল বেখে (ঐ)
অকস্মাৎ ডাক্‌লে আমায়,
দু-হাত ছড়িয়ে দিলে ('ভয়')
ঢালো রৌদ্রে,
আলোক ছড়াও...
তার উত্তোলিত বাহুতে নিটোল। ('আলোক ছড়াও')

তীর্থযাত্রী একদা পান্থশালা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল ক্ষুরধার পথে, অবিচল প্রতিজ্ঞা নিয়ে, অসিধারব্রত সেই যাত্রা। প্রিয়াব চুলের গন্ধ, মাতাল দিনরাত্রিব মাযা, কোজাগরী পূর্ণিমার বাত, নেয়াডেব লীলা বা গোধূলিব প্রেমকে অস্বীকার করে সে বেরিয়ে এল একা। তারপর মরুভূমিব মধ্যে কঠিন রূঢ় সূর্যালোকে কিংবা নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সমুদ্রের পাবে নিদ্রাহীন তাব যাত্রা। অবলম্বন শুধু বলিষ্ঠ পৌরুষ। অকস্মাৎ শরতের ঝকঝকে সূর্যালোকের স্পষ্টতায় পাওযা গেল নগ্নতনু তরুণতমাল সেই প্রত্যঙ্ককে। অতীতের মোহকে ছেড়ে তিনি পেলেন বাস্তবের নিরাবরণ নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধি। বারবাব যে 'সবুজে'-ব কথা বলা হযেছিল স্বপ্ন-আবেশে (সবুজ কুঞ্জবন/সবুজ সমুদ্রে ওঠে অগণন ঢেউ/সবুজের বাস), তা ঘুচে গিয়ে এল রুদ্র বজ্রপাণির 'পিঙ্গলিমা' এবং সবশেষে 'শবতেব দিনে'-র 'নীল' (নীল মেঘ/ঘননীল আকাশে/পদতলে স্টীলনীল পারহীন গভীর সাগর)। এই পরিক্রমার ইতিহাসকে কি চিত্রিত করা যায় না এইভাবে ?

সবুজ পাণ্ডু → নীল
'ধূসর
পিঙ্গল

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত	খর রৌদ্র	শরতের সূর্য
নেয়াডের লীলা		
পুরাতন ভগ্ন অলঙ্কার	বজ্রপাণি	নগ্নতনু
উর্বশীর মায়া		আর্টেমিস
শেফালি		চিরজীবী নোজগে (nosegay)

১. হিরণকুমার সান্যাল, 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র'। প্যাপিরাস, ১৯৫৮। পৃ ৭৩।

২. 'উর্বশী ও আর্টেমিস' হাতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ পর-পর দুটো চিঠি লেখেন বিষ্ণু দে-কে (১৩ ও ১৭ জুলাই, ১৯৩৩)। দ্র. 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৫২ ব।

৩. বিষ্ণু দে, 'মস্কভা-পিকাসো সংবাদ'। 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা'। মনীষা, ১৯৬৭। পৃ ১১৩-১৪।

৪/৫/৬. 'অশোক সেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। 'সাহিত্যপত্র'। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬ ব। শেষ দুটি ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদের পরের উদ্ধৃতির উৎসও এই।

'কোথায় ঘোড়সওয়ার ?'

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ ছিল নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রীর অকপট আত্মোদ্ঘাটন, 'চোরাবালি'-তে সেই তীর্থযাত্রীরই আত্ম-আবিষ্কারের স্বরূপ ও সংকট বিন্যস্ত হয়েছে নানা ভাবে, নানা ভাষায়। আবিষ্কারের উপকরণ তো একটা নয়, তার নানা রেখা নানা বর্ণ। কবিতার বিষয়ও তাই বিস্তৃত। 'চোরাবালি'-তেও 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর অনুভূতি ও বিষয়ের পরিমণ্ডলই আছে—একই কালে উভয়ের বেশ কিছু কবিতা রচিত বলে তা স্বাভাবিকও বটে—কিন্তু সেগুলোতে এসেছে যেন নতুন মাত্রা, নতুন স্বর। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর একমুখী আবেগতীব্রতা এখানে বহুমুখী অন্বেষণে ছড়ানো। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর অভিজ্ঞতার ঈষৎ ব্যক্তিগত এখানে হয়ে উঠেছে অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক। অর্থাৎ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ নেতির যে প্রখর রূপ দেখা গিয়েছিল, তা এখানেও আছে—কিন্তু আগের মতো এখন তা যেন অতটা ব্যক্তি-আচ্ছন্ন নয়। আবার 'চোরাবালি'-তে নেতি থেকে মুক্তির যে আভাস আছে, তা 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ সম্পূর্ণ

অপরিচিত না হলেও, ঐ পরিণতির সাক্ষ্য বেশি 'চোরাবালি'তেই। সে-কারণেই উভয় গ্রন্থ মিলে অভিজ্ঞতার একটা পরম্পরা ও পরিপূরকতা এনে দেয় – অভিজ্ঞতার গোড়াকার সততা ও সমগ্রতা—তাকেই বলা হয়েছে 'দুটি বইয়ের সমগ্রতা'।[১]

আর একটি কারণেও 'চোরাবালি' বেশি উচ্চাভিলাষী ও জটিল। আধুনিক মানুষের আত্মসচেতনতার পরিণামে কবিতার রূপকল্পে যে লক্ষণগুলি আসতে বাধ্য, তা 'চোরাবালি'-তে আরো বেশি স্পষ্ট। আত্মসচেতনতা-অর্জনের যে ভাষা 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ সরল আবেগে উচ্চারিত, 'চোরাবালি'-তে যেন সেই ভাষাই বহুরঞ্জিত, ঐ উপার্জিত আত্মসচেতনতারই বহিঃপ্রকাশে—শব্দের সংকোচনে, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগে বা প্রচলিত শব্দের অভাবিত বিন্যাসে, কাব্যোক্তির যুক্তিপরম্পরা ভাঙায়, উল্লেখ-উদ্ধৃতির, বিশেষত বিদেশী শব্দ বা নাম বা পুরাণের যথেচ্ছ ব্যবহারে। এ সমস্ত যে 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'-এ ছিল না, তা নয় – তবে 'চোরাবালি'-তে তা সংখ্যা ও নৈপুণ্য উভয় দিক থেকেই গরীয়ান্। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুয়ের অভিজ্ঞতা ও প্রতীকের সমাবেশের যৌক্তিকতার কথা আগেই উঠেছিল, ঐ গ্রন্থে বিদেশী পুরাণের উল্লেখও আমরা অনেক পেয়েছি – কিন্তু 'চোরাবালি'-তে তার প্রয়োগ যেন আরো বাধাহীন।

'চোরাবালি'-র অধিকাংশ কবিতা যখন লেখা হচ্ছে, তখন বিষ্ণু দে ইংরেজিতে এম. এ ক্লাসের ছাত্র। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষকতার কথা তিনি একাধিকবার বলেছেন। ঐ সময়ে তাঁর বিদেশী সাহিত্যের পড়াশোনা ও অধিকারের খবর শিক্ষকদের কানেও পৌঁছেছিল। তাই 'চোরাবালি'-তে ('উর্বশী ও আর্টেমিস'-এও) বিদেশী পুরাণ বা দেবদেবী, বিদেশী সাহিত্যের কাহিনী বা চরিত্র বা নানা বাক্‌প্রতিমা ও উল্লেখ অজস্রভাবে যে এসেছে, সেটা তারই প্রভাবে ঘটেছে, এমন বলা যেতে পারে না কী? বিশেষ করে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নাম তো আমরা করতেই পারি, যাঁকে বিষ্ণু দে উৎসর্গ করেছেন 'চোরাবালি' গ্রন্থ এবং যিনি ছাত্রের আধুনিক কাব্যরচনার সপক্ষে প্রায় সমসাময়িককালেই লিখেছিলেন: 'আমরা অনেক সময় আক্ষেপ করি ইহা বিদেশী প্রভাবান্বিত, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে এই বিদেশী প্রভাব আমরা বাস্তব জীবনের সর্বাধিক ক্ষেত্রে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছি এবং মানবমনের স্বাস্থ্য তাহার সততায় ও অখণ্ডতায়।'[২]

'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ প্রধানত এসেছিল গ্রীক ও রোমক পুরাণের দেবদেবী, ভারতীয় দেবদেবীর মতোই সংখ্যায়। বিভিন্ন অনুষঙ্গে এসেছে জলপরী নেয়াড, স্ফিংস একাধিকবার, ড্যানায়ে, ডায়ানা (ইতালীয় দেবী, গ্রীক আর্টেমিসের অঙ্গাঙ্গী), এথিনা, ওরায়ান-প্রিয়া উষা, ভিনাস, এরস-মাতা ইত্যাদি। পুরাণের চরিত্রও এসেছে : হেক্‌টর বা ক্লিয়োপেট্রা। অন্যান্য কাব্যের অনুষঙ্গে ট্রিস্টান বা ইসোল্ড। নানা জ্ঞানে বা বিদ্যায় ম্যামন, নেআণ্ডরতাল্‌। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ যাকে বলেছেন 'সততা', বা কবি নিজেই যাকে বলেছেন আধুনিক মনের দুঃসাহসিকতা —'চোরাবালি'-তে তার প্রকাশ আরো নির্ভীক।

'চোরাবালি'-তে অবশ্য প্রতীচ্য-পুরাণের দেবদেবীর চেয়েও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীচ্যের প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্যের নানা চরিত্র, নানা অনুষঙ্গী ভাষা। এক 'শিখণ্ডীর গান'-এর 'কথকতা'তেই ঠাট্টার আবহাওয়ায় এসে গেছে কত চরিত্র—গ্রীক-রোমক পুরাণ থেকে তো বটেই, মধ্যযুগীয় ইওরোপীয় গীতিকা থেকেও। আধুনিক যুগের সাহিত্য, দর্শন, মনস্তত্ত্ব কিছুই বাদ পড়ে নি। ডন্‌জুয়ান, প্লেটো, ডিয়োটিমা, সক্রাটিস, বর্ট্রাণ্ড রসেল, বেন্‌ লিন্‌সে, ওঅর্ডসওঅর্থ, কোলরিজ, শ্লেগেল, হেগেল, ডরথি, জীন্‌স ইত্যাদি কত নাম! আবার তার পাশেই হেলেন, অরফিউস্‌, পেনেলোপি, ব্রুন্‌হিল্ড, সীগ্‌ফ্রীড, ফ্রান্‌চেসকা। যে-কোনো ক্রম অনুসরণ করলেই এত নামের ভিড়ে পড়তে হয়। অন্যান্য বহু কবিতাতে আছে চসার, শেক্‌সপীয়র, বায়রন, ব্রাউনিঙ, ওয়াল্টার পেটার বা প্রি রাফায়েলাইট ইত্যাদি নানা যুগের সাহিত্য থেকে চরিত্র ও উল্লেখ।

বিদেশী পুরাণ বা চরিত্রের ব্যবহারের দিক থেকে দুই গ্রন্থের মধ্যে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ তারা অনেকটাই সম্পূরক ভাবনায় বা আবেগে এসেছে, কিন্তু 'চোরাবালি'-তে প্রায়ই যেন তা আসে ব্যঙ্গ বা পরিহাসের সূত্রে। ইংরেজিতে যে কটি প্রকারভেদ আছে, হিউমার উইট বা স্যাটায়ার, সেই সোজা বা বাঁকা সব রকমের পরিহাসই 'চোরাবালি'-তে আছে। এই বৈদেশিক চরিত্র বা উল্লেখ বা তার অনুষঙ্গ 'চোরাবালি'র পরিবেশটাকেই যেন বেঁধে দিয়েছে। অসংখ্য খুঁটিনাটিতেই তা ধরা আছে। তাই এখানে কোনো কবিতাংশ শুরু হয় 'শুরু'-র ফরাসী ভাষান্তর 'দেবুঁতাং' দিয়ে, বা অন্য কোনো শুরু-র নাম 'রিফ্লেক্স' বা 'এটাক্‌সিয়া' বা 'জ্যোকন্দা'। এখানে ছড়ানো আছে : 'টাহিটির মেয়ে', 'আর্কেডিয়া', 'মোনালিসা', ব্রাউনিং-

দম্পতি 'এলসি ও বব'। 'বুদোয়ার' বা 'কামারাদেরি' তো আকছার। অবশ্যই প্রত্যেকটি শব্দ বা উল্লেখের পেছনে থাকে পঠনের ইতিহাস বা তার প্রয়োগে বাক্-নৈপুণ্য।

ক্রমশই দেখা যায় এই ব্যঙ্গ-শ্লেষ এ-কাব্যে আরও গভীরতর বোধে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শুধু ঠাট্টা পরিহাস নয়, কবি তারও উপান্তে চলে যান বৃহত্তর কোনো দায়বোধে। স্পর্শ করেন আয়রনির বহুস্তর জটিলতাকে। তখন হেসে উড়িয়ে দায় শেষ করা যায় না ব্যক্তি বা পটভূমির অসামঞ্জস্যকেও চিনে নিতে হয়। যদি তাতে বিক্ষোভ ও বিষাদের আক্রমণ ঘটে যায়, তবুও। পরিহাসবোধ তখন নতুন মাত্রা পায়, অন্যান্য দায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কবি জানেন, সমাজ ও ব্যক্তির যে বিভাজন ঘটে গেছে ঐতিহাসিকক্রমে, তাতে শুদ্ধ পরিহাস ক্রমশই হয়ে উঠছে অলীক, প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তির অভ্যন্তরে কাজ করে যায় বৈপরীত্য—আশার পাশে আশঙ্কা, উজ্জ্বল হাসির পাশে ট্র্যাজেডির বিষাদ, 'মেঘের রেশমি আড়ালে বজ্রের যাওয়া আসা'। এই বৈপরীত্যের চেতনা, পরিণামী চিন্তা, দ্বান্দ্বিক বোধ যখন জোট বেঁধে থাকে, তখন আয়রনির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব।

অবশ্য এই বোধ একদিনে আসে নি—তাঁর আত্মসচেতন যাত্রার স্বল্প ইতিহাসেও তা এসেছে অভিজ্ঞতারই মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এর স্বরূপ একটু পিছিয়ে গিয়ে আমাদের বুঝে নিতে হয়। বাল্যে বা শৈশবে বিষ্ণু দে যে ব্যঙ্গ-মূলক কবিতা লিখে সাহিত্যজীবন শুরু করেন, তার মধ্যে বেশ কিছু ছিল 'ট্রিওলেট'। সেগুলো প্রধানত প্রকরণের বহিরঙ্গ চর্চাই বটে, কিন্তু ক্রমশই তাতে তুমুল পবিবর্তন ঘটে যায়, যদিও পূর্বযুগের সেই চর্চার টুকরোটাকরা তিনি পরবর্তীকালেও ব্যবহার করেন নতুন বিন্যাসে। যে কারণে এই পরিবর্তন মূলত ঘটে, তা হচ্ছে সামাজিক মাত্রার সংযোগ।

'চোরাবালি'র পরিপ্রেক্ষিতটারই তার ফলে বদল হয়ে যায়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর নির্বিশেষ আবেগ একটা স্থানগত ও কালগত শরীর পায় এখানে। এর জগৎটাই হয়ে ওঠে কংক্রিট, প্রত্যক্ষ।

বিষ্ণু দে-র যে-জগৎ তখন সবচেয়ে চেনা, যার ভেতর তাঁর জন্ম ও অভিজ্ঞতা, সেই বিশ-ত্রিশের দশকের কলকাতার মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন 'চোরাবালি'-রও জগৎ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের সময়ের কলকাতার বাস্তবতাই

এই ব্যঙ্গ কবিতাগুলির পরিবেশ।। এই সময়ে, ভারতবর্ষের একটি অংশ হিসেবেই বাংলা দেশকেও নৈরাশ্য ঘিরে ধরেছে—বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশেরও সংকট। এই সংকটের আঘাত শ্রমজীবী মানুষের উপর যেমন পড়েছে, মধ্যবিত্ত শহরবাসী শিক্ষিত শ্রেণীকেও তা রেহাই দেয় নি। এক হিসেবে মধ্যবিত্ত মানুষের দুর্দশা তো আরো মর্মান্তিক—বেকারির যন্ত্রণা সবচেয়ে তীব্রভাবে স্পর্শ করে তাদেরই। 'চোরাবালি'-র 'বেকারবিহঙ্গ' কবিতার আত্মঘাতী ব্যঙ্গে তার আভাস আছে।

অবশ্য এরকম একতরফা ছবি তো সমাজের পুরো চেহারা হতে পারে না। তাই পাশাপাশি বৈভব সৃষ্টির নতুন চোরাপথও তৈরি হচ্ছিল। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে একদল মানুষ প্রায় রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠেছিল। অর্থ-নৈতিক মন্দার দিনেও টাকা খাটিয়ে আরো বড় হবার ফিকির তাদের জানা। সেই প্রথম ব্যাপকভাবে সমাজে চালু হল 'দালাল', 'ফড়িয়া', 'ভেজাল', 'কালোবাজারি', 'তেজারতি' ইত্যাদি শব্দগুলি।[৩] উচ্চবিত্ত কলকাতার জীবনে, তার দৈনন্দিনতায় যে চকিত নাট্যরঙ্গ, তাই বারবার ফুটে ওঠে 'চোরাবালি'-র সামাজিক প্রতিমার জগতে। লেকে ভ্রমণ সকালসন্ধ্যায়, সিগারেট না খেয়েই লিলির হাসি, ছোট্ট ফ্ল্যাট, ঘুঘু ও ঘুঘুনীর জীবন, পার্টি, পার্টির উচ্ছল পরি-বেশে পিককণ্ঠী শমিতার বাগ্মিতা, রেস বা সিনেমার বার বা হাইকোর্টের শেয়ার-বাজারে নিত্য দেখাশোনা, কার্নিভাল এ-জীবনে ব্যস্ততা আর শ্রান্তি আর ক্লান্তি, বাতাস 'চুম্বনতাড়নাকম্প্র'। বিকারগ্রস্ত উঁচ্‌কপালে ইংরেজিয়ানা বা সংস্কৃতিপনার এই পরিবেশ সমাজের যে-অংশে মুখ্যত প্রতিফলিত হয়েছে সেই কপালফেরা বিত্তবান ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, তাদের ভুঁইফোড় চরিত্রহীন কাপুরুষতা ও নীরক্ত জীবনচর্চা 'চোরাবালি'-তে তীব্রভাবে পাওয়া গেল।

এই কৃত্রিম স্বার্থপর ক্লীব বৃহন্নলার জগতের চরিত্রায়নে যে অসামান্য বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়, পরিহাসতীব্র সামাজিক বোধের স্পষ্টতায়, তা কারো কারো মনে হতে পারে আংশিকভাবে শেক্‌সপীয়রীয়, এমনকি একজনের অন্তত মনে হয়েছে চ্যাপলিনের কথাও[৪], কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ এ-ধরনের কবিতা 'যেখানে অর্থবৈচিত্র্য বা বিষয়াতিক্রমের অবকাশ অত্যল্প' তার প্রতি অনাগ্রহ থাকার জন্যই মন্তব্য করেন : 'ক্রেসিডা বা ওফেলিয়ার মতো এই নিঃসম্বল লিলি-রমা-অলকার ভাগ্যে বিষ্ণু দে-র করুণাকণা জোটে নি···এবং ফলে এরা তাঁর বিশ্ববীক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে নি, শুধুই জুগিয়েছে তাঁর নেতিবাচক অবজ্ঞার

উপলক্ষ্য।'[৫] কথাটা কিছু দূর পর্যন্ত সত্যি, কারণ 'ক্রেসিডা' বা 'ওফেলিয়া'-তে ব্যঙ্গ-শ্লেষকে ছাড়িয়ে ঐ উভবলী আয়রনির যে গভীরতা আছে, তা হয়তো লিলি-রমা-অলকার কবিতাতে ততটা পাওয়া যায় না। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য, 'নেতিবাচক অবজ্ঞা'-র মধ্যেও কখনো নিহিত থাকতে পারে স্তরান্তরের স্বপ্ন ও জিজ্ঞাসা। কেউ-কেউ যে এ-কবিতাগুলিতে 'বায়রনি চটুলতা' পেয়ে যান[৬], সেই বায়রনের মধ্যেই তো আবার আজকের সমালোচক সন্ধান করেন ব্রেশটীয় ভেরফ্রেমডুং-এর বীজ। তাই সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'বোঝা যায় না বিষ্ণু দে কখন হাসছেন, কাঁদছেন বা কখন'[৭], তখন তার জবাবে সমকালীন কোনো পাঠক নাকি ব্রেশটের উক্তির প্রতিধ্বনিতেই মজা করে বলেছিলেন, তিনি কাঁদছেনও বটে, হাসছেনও বটে। তবে সে হাসি-কান্নার স্বরূপটা অবশ্যই স্পষ্টতর 'ক্রেসিডা' বা 'ওফেলিয়া'তে, বা তার ব্যঞ্জনা আরো গভীরত পায় পরে, তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের বাঁকবদল বিস্তারে।

এই ব্যঙ্গমুখর সমাজচিত্রণের একটা বড় সূত্র ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রমবর্ধমান যৌনপ্রাধান্য, যৌনসর্বস্বতা বা যৌনবিকার। বলা বাহুল্য, ফ্রয়েডের প্রসঙ্গ ও প্রভাবের কথা এখানে ওঠে। ফ্রয়েডের মধ্যস্থতাতেই জানতে পারা যায় কিভাবে এই অসংহত সৃজনসম্ভাবনাহীন পরিবেশে প্রাণাবেগ বা লিবিডো 'অবদমনের বাঁকা খেয়ালে' যৌনবিকৃতিতে পৌঁছয় এবং তার অপ্রতিরোধ্য জের শুধু চেতনে নয়, অবচেতনের অজ্ঞান অনালোকিত জগতেও। সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকেই ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্ষয় ও চ্যুতিকে দেখেছেন এই বিচ্ছিন্ন রিরংসামুখরতার প্রতীকেই। যে-কবির বিষয় আমাদের এই চেনা বিপর্যস্ত সমাজের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বাস্তবতা, তাঁর কবিতাতে তো সুতরাং প্রবলভাবে থাকতেই পারে যৌনকাতরতার ভারসাম্যহীন ছন্দহীন এই বিশ্ব।

প্রেমের এই যে বিকার, তার বর্ণনা শুরু হয়েছে ঠাট্টা দিয়েই। সতেরো বছর বয়সে 'আধুনিক প্রেম' নামে যে-কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন, যা পরে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র অনুষঙ্গে 'মন-দেওয়া-নেওয়া' নামে গ্রন্থস্থ হয়, তাতে প্রেম ও শরীরধর্মের সমীকরণ করেন বুর্জোয়া আধুনিকতায় দীক্ষিত ও পরিস্নাত কোনো যুবার ভাষ্যে। বলা বাহুল্য, পরিবেশটা সে-যুগের ঐ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত কলকাতার ড্রইংরুম সংস্কৃতি যার পরিণামে কেবল 'বেজায় ক্লান্ত শ্রান্ত লাগে'। মন-দেওয়া-নেওয়া র ঐ প্রায় অকালপক্ক উপলব্ধিই 'প্রথম পার্টি' কবিতায় যেন

ঈষৎ আত্মজৈবনিক ভাবালুতায় গল্পের প্রত্যক্ষ রূপ পেল, পার্টির যে-পরিবেশে আছে 'সুরেশের সুবর্ণের অশ্লীল নিশ্বাস' 'সুবর্ণের সুরেশের কদর্য নিশ্বাস'। কবি জানেন, 'এই অবসর ক্ষয়ের ধরন' আসলে 'কাপুরুষতার প্রাণহীন গূঢ় ছদ্মবেশ', 'অহিংসার বৃহন্নলা রূপ'। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে জেগে থাকে শুধু তারুণ্যের উদ্‌গ্রীব, প্রতীক্ষারত 'স্নায়ুশিরা'।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ধনতান্ত্রিক সমাজে বিকারই পরিণাম স্নায়ুর এই সজীবতার। তাই 'যযাতি' কবিতায় বারবার বলা হয়েছে 'যযাতি-শিরা' বা 'যযাতি-শিরার প্রবল গান', যে গান আসলে 'প্রলাপ-কল্প'। অতৃপ্তকাম যযাতির মধ্যে যে অশান্ত ভোগতৃষ্ণা অনির্বাণ জলতে থাকে, সেই 'স্নায়ুদাবদাহ'ই আজকের জীবনের সত্য—হয়তো বৃহৎ সমাজের বিচারে খুবই খণ্ডিত ও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু কবির চেনা এই জগতের বাস্তবতায় তা-ই সত্য। 'আধুনিক' জীবন তো এই খণ্ড অভিজ্ঞতারই জীবন, তাই স্নায়ুদাবদাহ যেন আধুনিক বুর্জোয়া জীবনেরই মর্মার্থ।

স্নায়ুর এই পীড়া চারিয়ে যায় অন্তর্জগতেও, মানবিক অবচেতনায়। 'সন্ধ্যা' কবিতায় 'জাতিস্মর' বন্ধুদের অতীতস্মৃতি, মনের গহ্বরের গন্ধর্ব-কিন্নর, যারা 'উলুপীর জ্ঞাতি' তারা হাত ছুঁয়ে যায় চেতনার। উলুপী পাতালের নাগরাজ-কন্যা, যাঁর ছিল এমনকি ব্রহ্মচারী অর্জুনকে বাঁধবার মতো আকর্ষণীশক্তি—অবচেতন কামনার প্রতীক কি সে? বেশ কয়েকবার যেমন উলুপীর উল্লেখ পেয়ে যাই, তেমনি অন্তত তিনবার আসে গ্রীক-রোমক পুরাণ থেকে প্রসার্পিনা এ-গ্রন্থে। প্রসার্পিনা-ও অবশ্যই পাতালের রাণী, হেডিসের স্ত্রী। ফুলচয়নরতা প্রসার্পিনাকে চুরি করে পাতালে নিয়ে যান হেডিস। পাতালের দেবী প্রসার্পিনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যারা তার মধ্যে আছে আত্মমুগ্ধ নার্সিসাস। প্রসার্পিনার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে সৌন্দর্য ও মোহ, কিন্তু তার প্রকাশ দিবালোকের উজ্জ্বলতায় নয়, পাতালের অনালোকিত ছায়াচ্ছন্ন ভুবনে—'সন্ধ্যা' কবিতায় যেমন বলা হয়েছে, 'জনহীন শব্দহীন ছায়াচ্ছন্ন ঘরে'।

এই যে মোহ—যা আসলে 'ফাঁকা লিবিডো'-র প্রকাশ, তার চাপে সমস্ত সম্বিৎ যেন ভেসে যায়, ক্ষুরধার আত্মসচেতনতা ক্ষয়ে যায়। জেগে থাকে শুধু 'ভস্মলোচন তৃষারা'। 'অপস্মার' কবিতায় মৃগীরোগের প্রতীকে এই 'ব্যভিচারে'র বর্ণনা করা হয়েছে (অপস্মারের অর্থ যেমন মৃগী রোগ, তেমনি আলঙ্কারিকভাবে ব্যভিচার)। শুধু প্রশ্নে-প্রশ্নে কবিতাটি শেষ হয়। আজকের রোগ কি

রোগগ্রস্ত পূর্বপুরুষেরই দায়ভাগ? আর রোগগ্রস্ত বিকার ও ব্যভিচারেই কি সব শেষ হবে? প্রাণের পরাজয় ঘটবেই?

প্রেমের রুগ্নতা অবশ্য শুধু যৌনকাতরতা বা যৌনসর্বস্বতাতেই নয়, দেহধর্মের আপাত অস্বীকৃতিতেও, সূক্ষ্ম রুচিবাগীশতাতেও। সে-কারণেই বর্তমান জগতের রিরংসাপ্রাধান্য যেমন, তেমনি ভিক্টোরীয় বা পেটারীয় ধূসরতার নন্দনও তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যঙ্গের বিষয়। এই জীবনবিমুখ বৈদেহী সৌন্দর্যবোধ যৌনসর্বস্বতারই অঙ্গপিঠ—কবির উপমায় বলা যায় পঞ্চশর দগ্ধ হয়ে সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময়। ঠাট্টা করে বিষ্ণু দে বলেন, 'শহরের বুকে পাঁচতলায়' 'ছোট্ট ফ্ল্যাট' নিয়ে, গোলমালকে 'পায়ের ম্যাট' করে, 'ঘুঘুনি ও ঘুঘু'-র মতো জীবনযাপন এবং খাবার সময় চর্বচোষ্যের 'বর্বরতা'-র বদলে 'নব্য সুষ্ঠু নিরাপদ ভোজ' গ্লুকোজ খাওয়া।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়, মধ্যভিক্টোরীয় রুচিবাগীশতা বা 'মরীয়া লিবিডো'-র বিকার, যাকে কবি প্রত্যাখ্যান করতে চান, তার সঙ্গে কবির তৎকালীন মানসিক টেনশন ওপ্রতীক্ষার অন্তরালে যে যৌনসচেতন সুস্থ জিজ্ঞাসা আছে, তাকে এক করে ফেললে চলবে না। এই জিজ্ঞাসাই তাঁকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায় অন্তর্জগতের বা মনোজগতের উঁচুনিচু নিদ্রাজাগরণময় বাস্তবতার ভেতর দিয়ে—সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য তাঁর বহু কবিতায়। এরই চাপে সমস্ত পরিবেশ তাঁকে তীক্ষ্ণ সজাগ করে তোলে :

> সমস্ত পৃথিবী আজ আকাশবাতাস
> আমার সমগ্র মন, প্রতি স্নায়ুশিরা
> শহরের উপকণ্ঠে জ্বালে অন্তহীন দূর আকাশের নীলে
> কোলাহলহীন কোন্ অলৌকিক দেয়ালির আলো!
>
> ('প্রথম পার্টি')

এই অভিজ্ঞতা ও প্রতীক্ষা যে ব্যর্থ হয় নি, প্রাণের পরাজয় যে ঘটে নি, তার প্রমাণ, সেই প্রাণধর্মের স্তব বেশ কয়েকটি কবিতায়। যেমন 'পঞ্চমুখ'। কিংবা 'মহাশ্বেতা'। 'মহাশ্বেতা' কবিতায় আর্টেমিসই যেন ফিরে এল ভারতীয় রূপে—আত্মসচেতনতার সংগ্রামে কবির সেই পরম প্রাপ্তি সৌন্দর্যের নগ্নতনু রূপ। মহাশ্বেতা বাণভট্ট ও ভূষণভট্টের 'কাদম্বরী' থেকে উঠে এসেছে। সংস্কৃতকাব্যে শৃঙ্গাররসের অতিরেক তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু তারই মধ্যে

মহাশ্বেতার সৌন্দর্যবর্ণনা ও চরিত্রায়ন বিষ্ণু দে-র তৎকালীন প্রতীচ্যকল্পনায় আক্রান্ত ও আর্টেমিস-রূপমগ্ন কাব্যভাবনায় খুবই সংগতিপূর্ণ। 'কাদম্বরী'-র প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ[৮] থেকে মহাশ্বেতা-র এই বর্ণনার সামান্য দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

> চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়ছে দেহের জ্যোতিঃ।
>
> শুভ্রতার যেন এক জীবন্ত মূর্তি।
>
> আকাশ-পথে থম্‌কে-যাওয়া যেন শরতের একখানি মেঘ। ··
>
> কী সৌন্দর্যের শুভ্রতা !...
>
> ধীরে ধীরে চন্দ্রাপীড়ের মন অপ্রাকৃত সৌন্দর্য থেকে প্রাকৃতে এল নেমে। প্রাকৃতেও সে সুন্দর।···
>
> এ সেই রকমের সৌন্দর্য যেন ধর্মের হৃদয় থেকে বেরিয়ে এসেছে—বজ্ররসে যেন স্নাত, শঙ্খেতে যেন উৎকীর্ণ।...
>
> ধীরে ধীরে আমার [মহাশ্বেতার] কিশোর তনুতে হল যৌবনের আবির্ভাব। ··
>
> আমি আমার মায়ের সঙ্গে স্নানে এসেছিলুম এই অচ্ছোদসরোবরে।··· স্নান সমাপন করে সখীদের সঙ্গে এমনি—ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম এই অচ্ছোদতীরে।

এই অংশগুলিতে 'মহাশ্বেতা'-কবিতার চিত্রকল্পকল্পনার সাদৃশ্যই শুধু লক্ষণীয় নয় (অচ্ছোদনীরে করো তুমি যেই স্নান, ভাস্কর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি, তোমার প্রাকৃত বাহু. ইত্যাদি), সামগ্রিকভাবেই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'র যুগের সৌন্দর্যচেতনারও সামীপ্য আছে এখানে—এমনকি শরতের বর্ণনা পর্যন্ত (বিষ্ণু দে-র কবিতায় প্রথম থেকেই শরতের অনুষঙ্গ মুক্তির বার্তাবহ)। 'মহাশ্বেতা' কবিতা থেকেই এই তালিকা আরো বাড়ানো যায়—'স্বপ্ন-সারথি', 'স্বপ্নবাণী', স্তনচূড়ার ছায়া, শরীরে হিমগিরির গান, নয়নের মদিরেক্ষণ মায়া, ইত্যাদি সমস্তই 'কাদম্বরী'-র জগতের শব্দগুচ্ছ—ঠিক যেমন কাদম্বরী'-তে মহাশ্বেতার বর্ণনা 'এত লাবণ্য এত শুভ্র জ্যোতিঃ' বিষ্ণু দে-র কবিতার পাঠকের খুব চেনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা তো বলাই বাহুল্য আধুনিক কবি এগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করেন, এর ভেতরে এমন তাৎপর্য বা মাত্রা বা তীব্রতা প্রবেশ করিয়ে দেন যে সব কিছুর মধ্যে বিদ্যুৎ-

স্পর্শ ঘটে যায়। আর তারই ফলে আর্টেমিস ও মহাশ্বেতা এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে।*

অবশ্য অন্যদিক থেকে, বাংলা কবিতার জগতে আর্টেমিসের প্রবেশ আকস্মিক ও বিস্ময়কর হলেও 'চোরাবালি'-র মহাশ্বেতা যেন এক-অর্থে আরো গভীর তাৎপর্যময়। মহাশ্বেতার পৌরাণিক উল্লেখে দুটি অনুষঙ্গ: স্মৃতি এবং প্রতীক্ষা। পুণ্ডরীকের জন্য মহাশ্বেতার প্রতীক্ষা। 'চোরাবালি'-র দিগন্তে সব সময়ই নানা ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়ে আছে এই প্রতীক্ষা।

'পঞ্চমুখ' কবিতাতে অভিজ্ঞতার সেই পরিণতিতেই—দিনরাত্রিজাগর প্রতীক্ষার শেষে—মুক্তি আসে অমৃতজ্যোতি তনু রূপে।

> প্রেম যে আমার হল প্রতীক্ষায় প্রস্তুতিতে
> দিন রাত্রি আজ চিরজাগা।
> একদা আমারই হবে জয়।
> বারবার বাতাসের হাতে লেগে লেগে,
> পুঞ্জীভূত বাতাসের বেগে
> ঝরে যাবে বিড়ম্বনা, মুক্তি পাবে মানসবলাকা।
> হৃদয় তোমার প্রিয়া আমার মনের নীলে মেলে দেবে পাখা।
> তোমার ও দীপ্তি মুক্তি পাবেই আমার চিত্তে, কোনো তরুণ তমালে,
> একদিন, একরাতে, কোনো এককালে।

'তরুণ তমাল'-কে চিনতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হবার কথা নয়। এখানেও আছে 'মানসবলাকা'-র কথা, সেই মুক্তগতির কথা—'উভচর' কবিতায় যেমন

---

* 'কাদম্বরী'-র এই সামীপ্য শুধু 'মহাশ্বেতা'-তেই নয়, কোনো পাঠকের লোভ হতেই পারে 'চোরাবালি'-যুগের লিবিডোর বাঁকা-পথের আধুনিক মনস্তত্ত্ব-স্বীকৃত ব্যাখ্যার আলোকে 'কাদম্বরী'-র অন্য কোনো কোনো অংশ, যেখানে বর্ণিত হয়েছে 'নবযৌবনের ক্ষুধা'-র 'উন্মাদিনী পরিণতি' এবং বানভট্ট যাকে বলেছেন 'মানসিক অসুস্থতা', তার তুলনামূলক পাঠ। চন্দ্রাপীড়ের কামনাতপ্ত কিন্তু অচরিতার্থ মিলনাকাঙ্ক্ষার পর 'ধীরে ধীরে চন্দ্রাপীড়ের সত্তায় এক উৎকট পরিণতি ঘটতে লাগল। কামনাজর্জর চিত্তে যতই হয় অদ্ভুত স্বপ্নের বিলাস, গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত, দুর্বিনীত চিন্তার উত্থান, ততই হতে থাকে পারিপার্শ্বিক জ্ঞানলোপ। / চারিদিক অন্ধকার করে রাত্রি আসে; চন্দ্রাপীড় ভাবে—তার হৃদয়ের কালিমায় কালো হয়ে গেছে শর্বরী।.../নিদ্রা-বিহীন শয্যায় রাত্রি কাটে চন্দ্রাপীড়ের।' গন্ধর্বলোকে মর্ত্যের মানুষ চন্দ্রাপীড়ের অভিজ্ঞতা যেন স্বপ্নলোকে ভ্রমণ—যেখানে দেখা মেলে অসামান্য রূপসী কিম্পুরুষ বা কিন্নর, সুন্দরী গন্ধর্ব কন্যাদের, মাতাল হয় মন তাদের মোহাবিষ্ট সান্নিধ্যে। 'সন্ধ্যা' কবিতায় কি তারই অনুষঙ্গে 'হৃৎপিণ্ডান্ত মগ্ন মদনের মদনৃত্য' বোঝাতে কবি লেখেন: 'গন্ধর্ব কিন্নর।সন্ধ যারা করে স্বপ্নশৈলে বাস'?

'উধ্বলোকের উদ্ধত গতি' বা 'পাখির আবেগে'র কথা। তাই 'উভচর'-এর 'মেরুচারিণী'-ও মহাশ্বেতা বা আর্টেমিসের সগোত্র।

অবশ্য ধ্রুপদী সৌন্দর্যকল্পনায় তিল তিল করে গড়ে তোলা মহাশ্বেতার আদর্শায়িত রূপ যেমন চোখের সামনে আছে, তেমনি আবার কবি বারবার নেমে আসেন বাস্তবের জমিতে বা হয়তো বলা যায়, সেই মৌল প্রতিমাকে বাস্তবের চেনা রূপে সামনে আনেন। 'পঞ্চমুখ' কবিতার ৫নং অংশটিতে মহাশ্বেতা ছেড়ে তিনি মন দেন 'স্নিগ্ধদেহ, সামান্য উৎসুক' সাধারণ কোনো মেয়েতে। 'সামান্য যে মন তার? তবু তাকে লেগে থাকে ভালো।'

মানি যে সে সাধারণই মেয়ে,
মহাশ্বেতা নয়, তবু তার কথা মনে লাগে ভালো।

রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে এ মেয়ে আমাদের খুব চেনা, পরে বিষ্ণু দে-র কবিতায় যার আলেখ্য বারবার আসে, আরো সামাজিক তাৎপর্যে, কবির চেতনায় একটা স্থায়ী প্রতিমা হয়ে ওঠে, তার জন্ম এই কবিতাটিতেই।

এইভাবে এ-যুগের 'ঘৃণার শ্বেতোর্মিস্পর্শ' ও 'উচ্ছল ক্লান্তি' কিংবা 'অশ্লীল নিঃশ্বাস' ঠেলে-ঠেলে তিনি যতই গতির ছোঁয়া পান, প্রেমের আদর্শ ও দৈনন্দিন বাস্তবকে বিরোধ ও ঐক্যের তাৎপর্যে এক সুতোয় বাঁধতে শুরু করেন, ততই তার নির্ভরতা গাঢ় হতে থাকে এই নবলব্ধ আত্মসচেতনতায়।

এই আত্মসচেতনতাই প্রতিফলিত কবিতার শরীরের প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্যে। শব্দব্যবহারের ধরনে, স্তবক সাজানোয়, বাক্‌প্রতিমার নির্বাচনে সব-কিছুতে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এই দেখা গিয়েছিল সংহত ও পরিচ্ছন্ন ও সংক্ষিপ্ত শব্দ-ব্যবহার। 'চোরাবালি'-তে দেখা যাচ্ছে সেই সংহত ও ছোট বাক্য বা বাক্যাংশে বিরাটকে ধরে রাখার অসামান্য নৈপুণ্য এবং তা থেকেই গড়ে উঠছে উচ্চারণের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর/কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর কথারা
আমার গৃহহারা/রাত্রি ও আমি একা/তপস্যা আজ নিদ্রার আরাধনা/জন্মে
প্রায়ে মরণে জীবন শেষ/প্রেম যে গোষ্পদ জল শুষ্কপ্রায় গ্রামের ডোবার।

ইংরেজিতে যাকে এপিগ্রাম বলে, সেই তীক্ষ্ণ স্মরণীয় ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তি ছড়িয়ে থাকে এ-সময়ের কবিতায়—ফলে আত্মসচেতন ব্যঙ্গমুখর কথনভঙ্গিতে বা ছন্দেও একটা আলাদা টান ও দোলা আসে।

সভ্য তো বটে, শরীরধর্ম লোপাট আজ।
আদিম স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি নেই।
তবুও তোমাকে খুঁজে ফিরি দেখ কলকাতায়!
রিজর্ভ ব্যাঙ্কে কেন যে তোমার চুক্তি নেই! ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ')
জানি লক্ষ্মীর বসতি বাণিজ্যেই,
সেই সাধনায় মেনেছি সতর্ত হার।
সরস্বতীর পঙ্কজে লাগে কাঁটা।
বিরাট বিশ্বে কবে হারিয়েছে খেই…('বেকারবিহঙ্গ')

আবেগের এই চাপ প্রকাশ পেয়ে যায় নানাভাবেই— কখনো অবিরল প্রশ্ন-সঙ্কুলতায়, কখনো রাবীন্দ্রিক কবিতাংশ বা চরণের বাঁকা ব্যবহারে, কখনো বিদেশী নাম বা ছিন্ন প্রসঙ্গের সমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত উল্লেখে। এর ভালো উদাহরণ 'কবিকিশোর'-এর অন্তগত 'প্রলাপকম্পন'। কবিতাটি শুরুই হয়েছে 'সোনারতরী'-র 'নিদ্রিতা' কবিতার প্যারোডি হিসেবে, আর তার সঙ্গে অদ্ভুত নৈপুণ্যে মিশিয়েছেন-কবি হোরেস থেকে ডাউসন পযন্তসমাদৃত সাইনারা-র বিধুর সৌন্দয। ঠিক এরকমই প্রকরণ-চাতুর্যে ঠাট্টার অমোঘ পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে 'শিখণ্ডীর গান'-এ। 'চোরাবালি'-র বহু কবিতাতেই। কোনো-কোনোটা শেষ হয়েছে প্রশ্নে-প্রশ্নে, মন্থিত আবেগের আরোহণে, 'ঘোড়সওয়ার'-ই বোধহয় তার চূড়ান্ত উদাহরণ।

'চোরাবালি'-র যে চারটি কবিতা সর্বাধিক পঠিত, তারা কবির আত্ম-সচেতনতার যে সংকট, তার সমাধান-প্রচেষ্টারই তিনটি স্তম্ভ বলা যায়। আত্মসচেতনতার লক্ষ্যই হল, রুগ্ন পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির যে সংঘাত, তাকে কিভাবে আত্মস্থ ও অতিক্রম করা যায়। কিভাবে মুক্ত করা যায় এই অর্গলকে, এই বন্ধনকে। 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে অনুভূতির পুরনো ও রাবীন্দ্রিক ঐক্যকে ভেঙে ফেলে আপাত-অসংহতির শিল্পবিন্যাসে তিনি মুক্তি খুঁজলেন। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় প্রতীকের শুদ্ধতায় বা স্বাবলম্বনে। এবং 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'-তে পরোক্ষ ও পরিচিত প্রসঙ্গের স্বকীয় ব্যবহারের কৌশলে, ট্র্যাজিক আয়রনির বিন্যাসে, দ্বান্দ্বিক সত্যের ক্রম-উপলব্ধিতে। এই যুগের কাব্যসাধনার ফলশ্রুতি হিসেবেই তাই ঐ চারটি কবিতা স্বতন্ত্র মনোযোগ পেতে চায়।

১

টপ্পা-ঠুংরি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'বঞ্চিত' ও

,অপরপক্ষ' কবিতা দুটির যেন পুনর্লেখন।[৯] রবীন্দ্রযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের বাস্তব ও নন্দনের পার্থক্য ফুটে উঠেছে এই পুনর্লেখনে। এই সূত্রেই এলিঅটের কবিতার প্রকরণগত প্রভাবও এখানে লক্ষণীয়। কলকাতার নাগরিক জীবনের খণ্ডতা, অসংলগ্নতা ও ভঙ্গুরতা মূর্ত 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার যুগোচিত আবেগসারল্য এখানে নয—আমাদেব খণ্ডিত বর্তমান ফুটে উঠেছে এব বক্রোক্তিতে, বহুমাত্রার বিন্যাসে, জটিল প্রকরণে। তার ফলে হয়ে উঠতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ওপব নির্ভর করেও সম্পূর্ণ মৌলিক একটি আধুনিক কবিতা। কবিতার প্রতিটি অংশে, উপমায়-প্রতিমায়-উল্লেখে পুরনো কবিতার ছিন্ন চবণ, টুকরো শব্দ বসিয়ে-বসিয়ে কখনো প্রতিতুলনায়, কখনো সার্থক অনুষঙ্গে, বিচিত্র মেজাজ তৈবি হযেছে—আবেগ ও মননেব এক জটিল মিশ্রণ, ব্যঙ্গ ও সাবল্যেব বুনট।

দুই কবির কবিতা পাশাপাশি রেখে পডলে বোঝা যায় ঠিক কোথায় কী ভাবে আধুনিক কবি সরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। শুধু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উদ্ধৃতিতে তার আভাসমাত্র এখানে দেওয়া যায়।

আরম্ভেই এই পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি
পোস্টকাড খানা আয়নার সামনেই,
কখন এসেছে জানি নে তো। ('বঞ্চিত')

আধুনিক কবি লিখলেন :

তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছডটানা লয়ে
পিদ্‌সিকাতোব আকস্মিক ঘূর্ণি,
বেডিওর ঐক্যতানে বিস্মিত আবেগ। ('টপ্পা-ঠুংরি')

শুধু বিদেশী শব্দে উপমাপ্রয়োগই নয, নাটকীয় তীব্রতা একেবারে প্রথমাবধি উত্তুঙ্গ হযে উঠল।

স্টেশনে যাওয়ার ব্যস্ততা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় লিবিক পুঙ্খানুপুঙ্খে বলা হয়। বিষ্ণু দে-র কবিতায় কিন্তু নাটকীয় তীব্রতা ও প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠার বৈপরীত্যে সমস্ত পরিবেশ মন্থর। পোস্টকার্ড এল যেন 'পিদ্‌সিকাতোর আকস্মিক ঘূর্ণি', (ছডের বদলে আঙুলের ব্যবহারে যেমন সৃষ্টি হয় আবর্তের), কিন্তু 'দিন কাটল যেন ঝিল্‌হাবিলম্বিতে' (কাফি বা খাম্বাজের মতোই ঠুংরি অঙ্গের সুরে)। সমস্ত

কবিতার বিন্যাসেই এই বিলম্বিত লয় এবং তার মাঝে মাঝেই আকস্মিক ঘূর্ণি বা আবর্ত। এই সাংগীতিক বিন্যাসের কারণেই কি কবিতার নাম 'টপ্পা-ঠুংরি'?

তারপর লিপিকার জগৎ, বলাকার জগৎ, কখনো বা লৌকিক ছড়া—টুকরো টুকরো দু-এক লাইনে অনুষঙ্গ আসে—কখনো ব্যঙ্গে, কখনো সহকারী অনুভূতিতে।

যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা বা প্রস্তুতি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মনের উদ্বেগ রূপ পায় চারপাশের স্থির বা চলমান দৃশ্যের বর্ণনায়—কখনো কখনো নিরপেক্ষ উদাসীন স্বভাববর্ণনায় কখনো-বা প্রতিফলিত দৃশ্যের উপমায়। কিন্তু সব মিলিয়ে সংলগ্নতা হারায় না।

স্টেশনে এসে দেখি গাড়ি আসেই না,
জানি নে কতক্ষণ গেল—
পাঁচ মিনিট, হয়তো পঁচিশ মিনিট!··
গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর, বেজে উঠছে বাঁশি,
উড়ে আসছে কয়লার গুঁড়ো,
কেবলই মুখ মুছছি রুমালে।
কোন্-এক স্টেশনে
বাঁকে করে ছানা এনেছে গয়লার দল। ('বঞ্চিত')

কিন্তু বিষ্ণু দে-র জগতে সমস্ত সংলগ্নতাই ছিন্ন। কখনো ঠাট্টা সোচ্চার হয় আবেগের উচ্চারণে, পর মুহূর্তেই স্বর নেমে পড়ে পদাতিক গদ্যে।

বাসের একি শিংভাঙ্গা গোঁ!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।
স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে, স্বৈরাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।

চলমান দৃশ্যের বর্ণনা বিষ্ণু দে-তেও আছে, কিন্তু এ বর্ণনা নিসর্গশোভার তাৎপর্যহীন অলংকরণ মাত্র নয়—এখানে এসে যায় 'বড়বাজারের উপলউপকূলে/ জনগণের প্রবল স্রোত'-এর বর্ণনা, নাগরিক জীবন—ছেঁড়া নোংরা ভিড়, দুঃস্থ কেরাণী জীবন, 'বড়বাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশ'। একটু যেন আবেশও তৈরি হয় এই 'অমর আকাশ'-এর বর্ণনার সময়। কিন্তু মুহূর্তেই সেটা

বানচাল হয়ে যায় কেজো গদ্যের আক্রমণে। তারপর ঠাট্টার মতো আসে

হে বিরাট নদী
স্টিমারের বাঁশি
খালাসীর গান
সব পেয়েছির দেশে
ককেনের দেশে·· ইত্যাদি।

'অপরপক্ষ' কবিতায়ও আছে রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যামের বর্ণনা, যেন কিছুটা স্নিগ্ধ কৌতুকে।

টাক্সি ছুটল বে-আইনি চালে।
হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড,
হাওড়া ব্রিজ, ন মিনিট বাকি।
দুর্ভাগ্য আর গোরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় করে। ('অপরপক্ষ')

কিন্তু বিষ্ণু দে-বর্ণিত confusion—'ট্র্যাফিকের এটাক্সিয়া'—যেন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, এটা হয়ে ওঠে পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা, তা থেকে হয়তো বড়-অর্থে সময়েরই বর্ণনা।

ট্র্যাফিক থমকে দাঁড়ায়, উঁচোট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায়
পণ্টুনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে,
পিঁপড়ের সারি

গৌড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর!
পাঁচ মিনিট, পাঁচমিনিট মোটে।
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও...('টপ্পা-ঠুংরি')

সব প্রতীক্ষা ও আয়োজনের অবসান নৈরাশ্যে—উভয় কবির কবিতাতেই। কিন্তু 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে মানসিক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য মূর্ত হয় কবিতার যুক্তিপরম্পরার বিপর্যয়ে, মনস্তাত্ত্বিক অসংলগ্নতায়।

দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল···
ডাকলেম নাম ধরে,
কী জানি ছাড়া আর কোনো কারণ নেই
যেন পাগলামির।
ভগ্ন আশা শূন্য প্লাট্‌ফরম্ জুড়ে ভূলুণ্ঠিত। ('অপরপক্ষ')
এল ট্রেন
মন্থিত করে রক্তের জোয়ার ··
হায়রে! আশার ছলনে ভুলি।
কোথায় তুমি! ট্রেন তো এল।
কয়লাখনি ধসে পড়ুক
ধর্মঘট নাই বা থামল,
ট্রেন তো এল! ('টপ্পা-ঠুংরি')

'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি 'টপ্পা-ঠুংরি'-র বছরেই (১৯৩৫) লেখা। 'টপ্পা-ঠুংরি'-তে যে বিচ্ছিন্নতা বা অসংলগ্নতা বা নৈরাশ্য রূপ পেয়েছিল, এ-কবিতাটি যেন তা থেকেই মুক্তির নির্দেশ। 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতাটি শেষ হয়েছিল এই আত্মকথনে :

হায় রে!
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে ?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায় ?

আত্মসচেতনতার এ এক ঘোর সংকট। আবেগের ব্যক্তিসর্বস্বতার নানা

ঝুঁকি। কিন্তু লিবিডোকে কি শেষ পর্যন্ত, কোনো বুর্জোয়া খেয়ালে বা রূপদী অবদমনেই শুধু চালাতে হয়? পরিত্রাণ নেই? এই লিবিডোরই, বাঁকা নয়, যেন সোজা অবাধ প্রকাশ দেখা গেল 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায়। এ তো জানা কথা, ফ্রয়েড যার মধ্যে যৌনতার প্রাধান্য দেখতেন, মনোবিজ্ঞানী য়ুং সেই লিবিডো বা প্রাণাবেগকে আরো ব্যাপক পৌরাণিক ভিত্তিতে চিনেছেন। এমনকি আদিম উপজাতিরা উদ্যত বর্শা হাতে যখন ছুটে যেত ঝোপে-ঢাকা মাটির গর্তের দিকে, য়ুং-এর কাছে তাতে শুধু যৌনতারই প্রকাশ ছিল না, যৌনতাকে শস্যফলানোর আবেগে রূপান্তরিত করার মানসও থাকত।[১০]

'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় যখন পড়া যায়,

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?
নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠাপড়া?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি?

তখন সুধীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে একে 'রিরংসার রূপক'[১১] বলার লোভ জাগেই যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই সুধীন্দ্রনাথের ঐ শব্দ দুটোকে মন থেকে তাড়াতে পারেন না।[১২] ঘোড়সওয়ার ও চোরাবালির অবয়বগত বৈশিষ্ট্য মনে রাখলে একের জন্য অন্যের প্রতীক্ষা, প্রার্থনা বা মিলনাকাঙ্ক্ষায় হয়তো সত্যিই ওরকম অনুষঙ্গ মন থেকে তাড়ানো সহজ নয়। 'চোরাবালি' শব্দটির মধ্যে যৌন শারীরিকতার কিছু ইশারাও হয়তো ভেবে নেওয়া যেতে পারে। কবি যখন বলেন 'পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে/আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে', তখন 'চোরাবালি'-যুগের যৌন-আবেশের বিকারও উঁকি মারে যেন এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই। আবার এই কামনা তো বাসর-গড়ার মায়াকে এড়িয়ে সর্বগ্রাসী আত্মাহুতিও চায়, ললাটে সূর্যের তিলক পড়াতে চায় ঘোড়সওয়ারকে। তবে কি কামনার দুটি রূপই হানা দেয় কবিতায়?

সুধীন্দ্রনাথই অবশ্য 'রিরংসার রূপক'-এর ঐ ব্যাখ্যাকে নাকচ করে য়ুং-এর কথাই তুলেছেন।[১৩] য়ুং-এর ব্যাখ্যাতা বলেন, 'লিবিডোর স্বাভাবিক গতি হচ্ছে সামনে-পেছনে, ওঠা-পড়ায়—প্রায় ভাবা যায় যেন জোয়ারভাটা।'[১৪] জনসমুদ্রে যখন জোয়ার নামে, কবির হৃদয়ে যদি তখন ভাটার টানে চড়াই পড়ে থাকে—তবে সে-ও তো লিবিডোর গতিরই একটি দিক, অন্ধকার দিক। সামনে এগোনোর জন্য পিছু হটা। কিন্তু অন্য গতি তো শুরু হবেই, মুক্তির জন্য সামনে

এগোনো। জনসমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্নতার পর ঐক্য। কবিতার শুরু লিবিডোর পশ্চাদ্‌গতির ও বিচ্ছিন্নতার বাস্তবতায়, কিন্তু ক্রমশই পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত হতে থাকে। সেই পূর্ণতাই কবিতার ঈপ্সিত, যে-পূর্ণতায় জনসমুদ্রের জোয়ার কবির হৃদয়কেও উদ্বেলিত করে। সেই প্রাণাবেগ, যার ছোঁয়ায় হৃদয়ের 'আঘির চড়া'—ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা—ঘুচে যায়।

তাই এই সর্বজনপ্রশংসিত কিন্তু বিতর্কমূলক কবিতাটি প্রসঙ্গে যে-ব্যাখ্যাই আসুক – সুধীন্দ্রনাথ-উত্থাপিত 'রিরংসার রূপক' অথবা 'প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধারোপ'[১৫]—কিংবা মার্টিন কার্কম্যানের ব্যাখ্যানুসারে বার্তাবহ বিপ্লব[১৬]—কিংবা রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধার—কোনো ব্যাখ্যাই হয়তো অসংগত নয়। এবং এরকম যে নানা ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছে, তার কারণ 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির স্বাবলম্বী ও স্বাধীন প্রতীক হিসেবে সার্থকতা। প্রতীকের এই অর্থবিস্তার ও সার্বজনীনতাই বোধহয় য়ুং-এর ব্যাখ্যায় সমর্থিত।

এই কবিতার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ঘোড়সওয়ার প্রতিমাটিকে পরবর্তী রূপান্তরের আলোয় যদি দেখা যায়, তবে হয়তো বিষ্ণু দে-র কবিতার বিচারে তার প্রাসঙ্গিকতা একটু বাড়ে বই কমে না। পরবর্তীকালে এই প্রতিমায় যে অন্য সামাজিক তাৎপর্য এসে গেছে, তার কোনো সম্ভাবনাই কি ছিল না এখানেও?

> ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল
> নাসাপুট উদ্ধত!
> সে কোন পাহাড়ে চলেছে, নীলকমল
> বলো কি তোমার ব্রত? ('বৈকালী' ২, 'পূর্বলেখ')
> আকাশে বাতাসে ঘুরুক গুপ্তচর
> তাই কি পক্ষীরাজের থামবে ওড়া?
> মাঠে বাটে ঘোরে বরকন্দাজ শত
> তাই থমকাবে তোমার প্রাণের ঘোড়া? ('ছড়া : লালতারা',
> 'সন্দ্বীপের চর')

> সমষ্টির গুরুভারে অহল্যার স্বকীয় মর্যাদা
> এনে দিক সবাইকেই বিপ্লবী; লঘিমা দুর্বার
> লাখো লাখো ঘোড়সওয়ার সমুদ্রের ঢেউ—
> সফেন চঞ্চল নৃত্যে সমুদ্র ছাড়া কি কিছু কেউ?
> ('বহুবড়বা', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')

প্রাণের ঘোড়া এখন বরকন্দাজের হুমকি অগ্রাহ্য করে জনসমুদ্রে মিশে গেছে বিপ্লব-ভাবনার দুর্বার হালকা হাওয়ায়। আগে ছিল 'চোরাবালি'-র পক্ষ থেকে আহ্বান, এবার ঘোড়সওয়ারের পুরুষকারের ব্রত উদ্‌যাপন। প্রতীকের আড়াল থেকে সামাজিক প্রতিজ্ঞাগ্রহণের স্পষ্টতায়। প্রতীকেও কি নিহিত ছিল না এই পুরুষার্থ ?

কবিতাটির অর্থ-উদ্ধারে এই আপাত দুরূহতা সত্ত্বেও ব্যাপক পাঠকসাধারণকে কোথায় যেন ভেতরে-ভেতরে ধাক্কা দেয়। হয়তো যে-কারণে কবিতাটি জনপ্রিয়, তা হল এর এই কেন্দ্রীয় পরাক্রান্ত আবেগ, যে আবেগ প্রতিটি বাক্‌প্রতিমায়, প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি শব্দে সঞ্চারিত। এর ধ্বনি, শঙ্খ ঘোষ যাকে বলেছেন 'একই কবিতায়...বিভিন্ন স্পন্দসঞ্চার'[১৭], বিষয়ের চাপকে পৌঁছে দেয় পাঠকের মনে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির সাক্ষ্যেই এ-কবিতাকে 'ড্রিম পোয়েমের সগোত্র' এবং 'অবচেতনের চাপে' 'অনর্গল উৎসারিত' বলে বর্ণনা করেছেন।[১৮] হয়তো 'পরিচয়'-এর প্রথম ভাষ্যটি তাই ('পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৪৩ ব)। কিন্তু পরে গ্রন্থস্থ হবার সময় দেখা গেল বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।[১৯] অর্থাৎ শব্দকে অমোঘ করার এই সাফল্য কিছুটা অন্তত দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্যেই ঘটেছে। শব্দের অনিবার্য প্রয়োগে ও তাকে নিরন্তর শাণিত করার শ্রমে সমস্ত কবিতায় প্রতীক্ষার সুর এমন আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে, প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠা ও আবেগে কাঁপছে শব্দগুলি, যে, কবিতাটির টেনশন বা চাপ কারোর পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়।

> নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠা পড়া...
> আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর...
> কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরো থরো...
> কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার...

কামনার এই আগ্রাসী আচ্ছন্নতার মধ্যে হঠাৎ পাওয়া গেল মুক্তির সন্ধান—'চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার।' তুরঙ্গ তো অসুস্থ প্রেতচ্ছায়া-কামনার চোরাগলি এড়িয়ে সুস্থ কামনার টানে বৈতরণী পার হবে। 'পরিচয়'-এর পাঠান্তরে এর ইঙ্গিত আরো জানা হয়ে যায়, যখন ঈষৎ অর্থান্তরে তিনি বলেন, 'চেয়ে দেখ দূরে অমরলোকের দ্বার।'

এই ব্যাকুল কামনা বা প্রতীক্ষার পর মিলন ঘটবে যখন, তখন বলার থাকবে শুধু : 'হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো।' লক্ষণীয় যে, সমস্ত কবিতায়

এই 'হাল্কা হাওয়া'-র সম্ভাবনা বা চাওয়াপাওয়ার কথা বলা হয়েছে বারবার।

হাল্কা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো। …

হাল্কা হাওয়ায় হৃদয় দুহাতে ভরো …

পাহাড় এখানে হাল্কা হাওয়ায় বোনে…

হাল্কা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে লোকনিন্দার দিন…

লিবিডোর মুক্তি বা চরিতার্থতার পর শারীরিক টেনশন-মুক্তির সূচক এই 'হাল্কা হাওয়া'? বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে জনসংযোগের, আনন্দ বা প্রীতির সেই আকাঙ্ক্ষিত জগৎ, যার জন্য প্রাণাবেগের আকুল উচ্ছ্বাস? 'চোরাবালি'-তেই তো তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আনন্দের লঘিষ্ঠ হাওয়া'? এর পর থেকে এই অনুষঙ্গে 'হালকা হাওয়া' তার কবিতায় আজীবন উঁকি দিয়ে গেছে।

'ওফেলিয়া' এবং 'ক্রেসিডা' দুটি কবিতার পেছনেই শেক্সপীয়রের নাটক এবং অন্যান্য বহু রচনা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে, অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি অসামান্য মৌলিক দুটি কবিতা রচনা করেছেন—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র ভাষায় 'নৈরাত্ম্য উপকরণে এতখানি স্বকীয়তার সৃষ্টি।'[১০] এই অর্থেই তিনি কবিতা দুটিকে বলেছেন 'সংক্ষিপ্ত সামান্যীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ'। আরো বলেছেন, গীতি-কবিতা ও নাট্যের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এখানে। 'ওফেলিয়া'কবিতায় শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের পুনর্বর্ণন করে কবি ব্যাপকতর সত্যের কথাই বলেছেন—'প্রেমিকসাধারণের সুদীর্ঘ জীবনকাহিনীর সারসংগ্রহ' শুধু নয়, তাদের অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডিকেও। ওফেলিয়া তাই বিষ্ণু দে-র কবিতায় সার্বভৌম বিপ্রকর্ষের প্রতীক।' প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে ট্র্যাজেডির মহিমা আরোপের জন্যই তিনি হ্যামলেটের মধ্যস্থতায় এই কথা বলেছেন এবং 'তাঁর ব্যক্তিগত অভাববোধের গোষ্পদে শেক্সপীয়রের বিশ্বমানবিক ছায়া পড়েছে।' 'ক্রেসিডা' কবিতাতেও আছে এই নাট্যরচনার প্রচেষ্টা—তিনি এখানে 'বাদী, বিবাদী ও অনুবাদী ভাবের নাটকীয় প্রতিসাম্য ঘটিয়েছেন।' কবিতা দুটি সম্পর্কে এই হল সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

সন্দেহ নেই, 'চোরাবালি'-তে প্রেম সম্পর্কে অবিশ্বাস এবং মোহবর্জন যে বহু সমাজব্যঙ্গমূলক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সেই মনোভাব থেকেই কবিতা দুটি রচিত। অবশ্য উচ্চারণরীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাতে সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র

তৎকালীন কাব্যাদর্শের পরিচয়ই মেলে। নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে বিশ্ববীক্ষা নয়, বরং কোনো 'নৈরাত্ম্য উপকরণে'র মধ্যেই স্বকীয় অভিজ্ঞতার সমীকরণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। 'কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবনা' ('কাব্যের মুক্তি', সুধীন্দ্রনাথ)। এবং তখন এই কাব্যাদর্শের তাগিদেই মননজাত উল্লেখের ঘটা এবং সেই সূত্রে দুর্বোধ্যতাও খানিকটা অনিবার্য। ইংরেজি সাহিত্যের এই দুটি নারী চরিত্রের মধ্য দিয়েই বিষ্ণু দে তাঁর সেকালীন উপলব্ধির কথা বলতে চেয়েছেন, তার কারণ 'বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্তা' এই চরিত্র দুটিই হতে পারে, দীপ্তি ত্রিপাঠীর ভাষায়, তাঁর ঐ তৎকালীন চিন্তার সার্থক 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভ'।[২১]

হ্যামলেটের জবানিতেই কবিতাটি বলা। ওফেলিয়া হ্যামলেটের মন ভুলিয়েছিল, তার মনে জাগিয়েছিল উদ্ধত প্রেমের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কিন্তু হ্যামলেট দেখতে পায়নি মেঘের রেশমী আড়ালে বজ্রের যাওয়া-আসা—ফলে যা ঘটবার ঘটল: 'অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকেই।' হ্যামলেটের মোহ, প্রেম সম্পর্কে আশা এবং সম্ভাবনা বারবার জাগছে বহু প্রতিমার মধ্যে—মাঝে-মাঝেই সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে বটে— কিন্তু শেষপর্যন্ত এই আলোছায়ার লীলা ভেঙে যায় চূড়ান্ত বিনাশে। সমস্ত কবিতাটিকেই বলা যায় আলো-আঁধারী প্রতিমার মালা। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'ও-দুটি কবিতায় ['ক্রেসিডা'-র কথাও বলছেন] কেন যে এক স্তবকের পর আর-এক স্তবক আসছে, সেটাই আমার কাছে রহস্য।'[২২] এখন কিন্তু আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই আপাত বিচ্ছিন্নতা বা অসংলগ্নতা হ্যামলেটের চিত্তবিক্ষোভের সূত্রেই এসেছে। কবিতাটিতে সব সময় নাটকের কালানুক্রম বা যুক্তিবিন্যাস মানা হয় নি। হ্যামলেটের মনে আস্থা ও সন্দেহ গুচ্ছে-গুচ্ছে আসা-যাওয়া করেছে এবং তারই শব্দচিত্র ও প্রতিমা অসম্বদ্ধভাবে, অন্তত আপাত অসম্বদ্ধতায়, এসেছে। এটা আরো প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন দেখি 'পরিচয়'-এর পাঠে (কার্তিক ১৩৪১ ব) যে স্তবকবিন্যাস, তা এ-গ্রন্থে কিরকম ওলোটপালোট করে সাজানো হয়েছে।[২৩] সময়ক্রম এখানে বড় কথা নয়, তাকে খানিকটা ভেঙে দেওয়াই যেন উদ্দেশ্য।

শেক্সপীয়র-সমালোচক উইলসন নাইটের প্রভাবের কথা বলেছেন সুধীন্দ্রনাথ।[২৪] ওফেলিয়া প্রসঙ্গে উইলসন নাইট বলেন, 'Flowers, music, water-life, love : all blend in Ophelia'। বস্তুত কবিতার শুরুতেই প্রথম স্তবকের নান্দীমুখে এই গান, ফুল, সংগ্রামী ও দুঃসাহসী প্রেমের প্রতিমা

আসে। কিন্তু তারপরই হ্যামলেটের পীড়িত স্নায়ু, তার বিনিদ্র অন্বেষণ, এ যুগের নায়কেরই বিচ্ছিন্নতার বোধ—'কথারা আমার গৃহহারা'—'ঝোড়ো হাওয়া' আর 'কালো কালো বুনো মেঘে'র প্রতিমা। উইলসন নাইট বলেন, 'Hamlet is a dark force in the world'। যে-কোনো জীবনরূপেই তার বিরোধিতা—তার সন্দেহের রং কালো। পুরো একটা স্তবক জুড়ে অন্ধকারের প্রতিমা—হেডিসের মতো আঁধার—'জীবনের কৃষ্ণ যবনিকা'। কিন্তু তার পাশাপাশি বৈপরীত্যে আসে নয়নের দীপশিখা, প্রেমের আলো—'বহ্নি তব দিক্ দীপশিখা'—'darkness and light are contrasted'।

কিন্তু হ্যামলেটের একাকিত্ব ঘোচে নি—সে তার প্রখর আত্মজ্ঞান নিয়ে একা।

> রাত্রি রয়েছে পাশে—
> তুষারশীতল কঠিনোজ্জ্বল ক্ষুরধার তরবারি।
> রাত্রি ও আমি একা।

তার জীবনের সমস্ত মূল্যবোধে নাড়া খেয়েছে, অনেক বড় ব্যাপারে সে বিচলিত বিপর্যস্ত। 'শরতের শাদা খামকা-খুশিরর মেঘে' কি নির্বোধের মতো খুশি হওয়া সম্ভব? আসে ওফেলিয়ার মৃত্যু—'flowery and watery death of Ophelia'—হ্যামলেটের পরাজয় দুঃসাহসী প্রেমের পরাজয়, সংগীতের পরাজয়।

জীবনের প্রতি অবিশ্বাসে হ্যামলেট ওফেলিয়াকেও সন্দেহ করে—'আমার মন ভোলালে ওফেলিয়া'। মনে পড়ে স্বপ্নের মতো, ওফেলিয়ার প্রেম—'নীল রহস্য নয়নে' 'স্নিগ্ধ গভীর দীর্ঘ'—সে প্রেমে হ্যামলেটেরও উজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়, মনে হয় 'হ্রদ ভেঙে আবর্ত হবে মন্দাকিনী' এবং তার জলে হবে হ্যামলেটের ব্রত-উদ্‌যাপন, 'অপস্নদীক্ষা'। হঠাৎ প্রসার্পিনার উপমা কি প্রেমের উজ্জীবনকে শ্লথ করে দেয়- প্রেমের অধোগতির সূচনা? হ্যামলেট কি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে?

আবার অবিশ্বাস, সন্দেহ—কিছুতেই এড়ানো যায় না ট্র্যাজেডি। মেঘের রেশমী আড়ালে আর খুশি থাকা যায় না, তার পেছনে-পেছনেই বজ্রের সংকেত। ট্র্যাজিক আয়রনির ইঙ্গিত। ফলে সমস্ত সর্বনাশ নেমে আসে শেষের তিনটি লাইনে। 'পরিচয়'-এর পাঠে ছিল 'ট্রয়ের প্রাচীর হল চুরমার এল্‌সিনোরেই'—গ্রন্থে এটা বদলে হল বটে 'অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকেই'—কিন্তু ট্রয়ের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে পরাজয়ের মাত্রাকে তিনি সীমাহীন করে তুললেন। প্রেমের পরাজয়ের মধ্যেই যেন বিশ্বের পরাজয়।

'ক্রেসিডা'-য় কিন্তু কালানুক্রম, অর্থাৎ ট্রয়লাসের অভিজ্ঞতার কালানুক্রমিক বিন্যাসকে মানা হয়েছে বলেই মনে হয়। তার সবচেয়ে বড় যুক্তি হল এই যে, ঘটনার মধ্যপর্বে ক্রেসিডার বিদায়-সর্বনাশ ও অন্তিমপর্বে হেনরিসনের কল্পনাকে পর্যায়ক্রমেই অনুসরণ করা হয়েছে—যদিও যখন যেমন ভেবেছেন চসার, হেনরিসন বা শেক্সপীয়রকে তাদের রূপায়ণের ভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি ব্যবহার করেছেন অবিরোধে।

'ক্রেসিডা' কবিতাটিও ট্রয়লাসের জবানিতে বলা। তাই ট্রয়লাসের পরিচয়-দানেই কবিতার শুরু—অনুভূতির আবেগের কল্পনার জগতের অধিবাসী সেই প্রেমিক নায়ক, যার অনুভূতি-কল্পনা-আবেগ নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং বিনিদ্র প্রতীক্ষার চাপে অস্থির। এই জাত প্রেমিক, কিন্তু প্রেমের আধার নেই বলে যার হৃদয়ে শূন্যতার হাহাকার—ঠিক যেন নদী পার হবে বলে যাত্রী খেয়াঘাটে পৌঁছে দেখছে মাঝি নেই, চোখ ঝলসে যায় তীরের ধু-ধু-করা বালিতে, কোনো আশ্রয় নেই, সান্ত্বনা নেই।

ক্রেসিডার সান্নিধ্যে এই ঝলসানো দিনে শান্তি এল। যে 'বালুকাবেলা'-র কথা এবং বালুকাবেলায় 'চোখ পুড়ে মরে দূরে' র কথা আগের স্তবকে, অপ্রেমের যুগে, বলা হয়েছিল, আজ সেই চোখে নেমে আসে জুড়িয়ে-যাওয়া স্নিগ্ধতা। 'পুড়ে মরে'-র স্থানে 'ঝরে সান্নিধ্যের ধারা'—জলের আভাস পাওয়া গেল। শুধু দিন নয়, রাত্রিও—আরেকটু পরে যে কথা বলা হবে সেই 'সর্বসমর্পণ', ট্রয়লাসের। গ্রীষ্মের দাবদাহের যেটুকু স্মৃতিও ছিল পরের লাইন দুটিতে (১০-১১), সবটাই মুছে গেল—'শ্রাবণের ধারাজল', 'তালীবনদীঘি', 'অবিরাম কল্লোল' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছে সজলতা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। প্রেমের স্নিগ্ধ সজলতায় হৃদয় মুখর ট্রয়লাসের।

এবার প্রশ্ন অন্য দিক থেকেও। ক্রেসিডার চোখে কি দ্বিধা? একই সঙ্গে সে চোখে ভীরুতা, অথচ ট্রয়লাসের প্রতি আশ্বাস—'থমকানো চোখ' ও 'বরাভয়' শব্দ দুটির বৈপরীত্যে। এ কি প্রেমিকার স্বাভাবিক ব্রীড়া? অনভিজ্ঞা কুমারীর লজ্জা? কিন্তু ক্রেসিডা প্রসঙ্গে চসার থেকে শেক্সপীয়র সকলেই বলেছেন, অভিজ্ঞতার প্রতিমূর্তি এই নারী। 'অনন্ত স্মৃতি' বা ঔপনিষদিক শব্দ নিজকৃতকার্যের অর্থসূচক 'ক্রতুকৃতম'—শব্দ দুটি পর পর নায়িকার এই বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরে। এ হেন ক্রেসিডাকে জয় করে নেওয়ার গৌরবধ্বনি ট্রয়লাসের কণ্ঠে, স্তবকের শেষ চরণে।

এবার সর্বসমর্পিত প্রেমের যাত্রা শুরু। শুধু নদী পার হওয়া নয়, সাগর পাড়ি দেওয়ার সাহস এসে যায় প্রেমিকের। 'ভীরু দুর্বল মন' একটি স্তবকে উচ্চারণ করেই পরের দুটি স্তবকে বেপরোয়া সাহসিকতার উল্লেখ প্রেমিকের মনকে ফুটিয়ে তোলে। সকল প্রেমিকের কাছে দৈব তো অনুকূলই—'মহাকালে'র 'দক্ষিণ কর' ছড়ানো। এই দৈবানুকূল্যের ভূমিকার কথাও বলা হয়েছে ট্রয়লাস-ক্রেসিডার সব কটি ভাষ্যে—বলা হয়েছে 'ট্রয়লাসে ভাগ্যই সর্বব্যাপ্ত'।

পরের অংশেই, দু-লাইনের মধ্যে (১৯-২০), ট্রয়লাস-ক্রেসিডার এই ব্যক্তিগত প্রেমকে স্থাপন করা হল ইতিহাসের বৃহত্তর পটে। এবং হেলেনের নামোচ্চারণ সেখানে অনিবার্য—কারণ তাকে নিয়ে ট্রয়ের যুদ্ধের তোলপাড়। ইতিহাসের সেই ত্রিভুবনব্যাপী আলোড়নের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা তীব্র হয়ে ওঠে, তা যেন ট্রয়লাসের ব্যক্তিগত প্রেমকেও শঙ্কিত করে।

পরের একটি নিঃসঙ্গ চরণে ২১), রাবীন্দ্রিক উচ্চারণে, সেই প্রেমের সর্বনাশের সব কথা যেন বলা হয়ে যায়। 'ঝঞ্ঝার করতাল' শুধু ট্রয়ের লড়াইয়ে নয়, ট্রয়লাস-ক্রেসিডার 'রজনীগন্ধা-বনে'-ও 'ঝড়'। তবে কি ক্রেসিডার আকস্মিক বিদায়ের কথা জানা গেল এবার? আর তার পরিণাম? ট্র্যাজেডির হাহাকার ধ্বনিত হল এই একটিমাত্র চরণেই।

পরের তিনটি লাইনেও (২২-২৪) দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি ও ইতিহাস দুয়েরই সমান্তরাল সর্বনাশের ইঙ্গিত প্রাকৃতিক টেনশনের মধ্যে আভাসিত করার চেষ্টা। ঝড়ের ইঙ্গিত বৈশাখের আকাশে, যুদ্ধক্ষেত্রেও 'রথচক্রের ধূলি', আবার ট্রয়লাসের অনুভূতিতেও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। তাই প্রথম স্তবকে যে নায়ক বলেছিলেন 'স্বপ্ন আমার কবিতা', আজ সেই 'স্বপ্নগোধূলি'-র মায়া অদৃশ্য, তার জায়গায় প্রবল রক্তাক্ত যুদ্ধের নিয়ামক পরিণতি, স্বপ্নকে ম্লান করে দেয় 'খর রক্তের কোলাহল'।

ফলে শুধু বৃহৎ পটভূমিতেই নয়, ট্রয়লাস-ক্রেসিডার চিত্তজগতেও ঘোর বিশৃঙ্খলা। আকাশে বিভিন্ন বর্ণের মেঘ—লাল নীল ধোঁয়াটে মেঘের দ্রুত আনাগোনায় বিপর্যয়ের ইঙ্গিত। শেষ পর্যন্ত কালো মেঘ আসে সর্বনাশের বার্তা নিয়ে, কল্কির মতো। বিদ্যুতে বজ্রপাতে এলোমেলো বাতাসে সেই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ঘনীভূত হয়। তার মধ্যেই ক্রেসিডার কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে, ভোলা যায় না, যদিও পরিবর্তন আসন্ন।

প্রেমের স্বর্ণযুগ শেষ। আবার জনহীন 'তপ্তমরু'—প্রেমের আগে যেমন ছিল 'কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলা'। তবে তখন ছিল পাশে সাহসী বন্ধু ও দার্শনিক

উপদেষ্টা প্যাণ্ডার, যে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে প্রেমের চরম প্রাপ্তিতে। কিন্তু আজ যখন ক্রেসিডা চলে যায়, তখন প্যাণ্ডারের ভূমিকা আর কোথায়? এখন শুধু ভবিষ্যতের নৈরাশ্য ও অপার ক্লান্তি। প্যাণ্ডারের সঙ্গে আগে তা নিয়ে সংযোগ চলতে পারত, কিন্তু এখন কী লাভ? ক্রেসিডাকে ভালোবেসে ও বিশ্বাস করে তিনি ঠকলেন। আজ সেই ভ্রান্তির মানসিকতায় যদি তিনি বৈতরণীর পারে গিয়ে ওঠেনও, সেই উত্তরণ প্রেমের নয়, সুখের নয়—ক্লান্তির ও নৈরাশ্যের।

অ্যাপোলোর অবৈধ সন্তান হেলেনের জন্মের সঙ্গে বা তাঁকে নিয়ে স্বর্গমর্ত্য-ব্যাপী আলোড়নের সঙ্গে ট্রয়লাসের প্রেমের ব্যর্থতা-সাফল্যের যোগ কোথায়? কিন্তু যোগ আছে নিশ্চয়ই—ট্রয়লাসের জীবনে যে ফুল ফোটে, সেই শিউলি শুকিয়ে যায়—তাঁর জীবন যুক্ত হয়ে যায় ট্রয়ের যুদ্ধে যে মৃত্যুসাধনা চলেছে তার সঙ্গে—তান্ত্রিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করে বলা যায়, জবার সঙ্গে তুলনায় ট্রয়লাসের জীবন, যা মৃত্যুর জন্য উৎসর্গীকৃত।

ক্রেসিডাকে ভোলা অসম্ভব মনে হয়েছিল—এখন দেখা যাচ্ছে 'সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে'। আর ক্রেসিডা তো এখন উজ্জীবন আনে না—তাই জীবনের তাগিদেই সেই মৃত প্রেমকে ত্যাগ করা শ্রেয়। নিজেকে ছাড়িয়ে যে সূর্যালোক, জীবনের অঙ্কুর সেখানেই, উজ্জীবনও সেখানেই। প্রেম আজ হেলেনের মধ্যে প্রতীক লাভ করেছে, যে হেলেন শুধু সর্বনাশই ডেকে আনে, সর্বনাশ প্রেমিকের জীবনে, ট্রয়ের জীবনেও।

ভাগ্যের ওয়াপড়া এইভাবে ঘটে—প্রেমিকের ভাগ্যে প্রেমের আকুলতা আসে, আবার 'মুখর সে গান' ভেঙে যায়। কিন্তু আজ বোধহয় এই রঙ্গ ত্যাগ করে বোঝাপড়ার সময় এসেছে। 'ভূমিশায়িনী শিউলি' কি সেই প্রেমেরই পরিণতি, যা ক্ষণস্থায়ী? নাকি বিশ্বাসঘাতিনী ক্রেসিডার পরিণাম?

শত্রুশিবিরে ক্রেসিডা অন্যের কণ্ঠলগ্ন, তার শরীরে চোখেমুখে ভোগের চিহ্ন। অথচ ট্রয়লাসের মনে যে প্রেমের বীজ তা আজ বিকশিত। আসল পরাজয় তো ট্রয়লাস বা ট্রয়েরও এখানেই যে ক্রেসিডা বিশ্বাসঘাতিনী, ক্রেসিডার 'সারা শরীরে নগ্নভাষা'।

কিন্তু পরাজয়ের আত্মবিলাপে অন্তত এ কবিতা শেষ হয় নি। এরপর থেকেই ট্রয়লাস পেয়েছে অন্য উত্তরণ। সুধীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন, শেক্সপীয়রী মুমূর্ষা' নয়, 'চসরী জিজীবিষা'।[২৫] তাই পর পর তিনটি স্তবকে ট্রয়লাস ফিরে পান তাঁর আত্মস্থতা—সব জাগতিক শোকের অকিঞ্চিৎকরতার ঊর্ধ্বে। নিজেকে

বর্মে ঢেকে ফেলেন, যেখানে ক্রেসিডার বর্শা ব্যর্থ হয় আঘাত হানতে—'বর্শা তোমার হয়ে গেল খান্‌-খান্‌।'

পরের তিনটি স্তবকে (৮৯-৯০ লাইন) 'হেনরিসনের পদাঙ্ক' অনুসরণ করে তিনি যুদ্ধবিজয়ী ট্রয়লাসকে ফিরিয়ে আনেন। ট্রয়লাসের জয়গান চতুর্দিকে, আর কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হৃতসৌন্দর্য 'বেহিসাবী ক্রেসিডা'—নতমস্তক, দীন প্রার্থী। ট্র্যাজিক আয়রনির এ অন্য হিসেব ক্রেসিডার জীবনে।

সুতরাং সহজেই বলা যায়, ক্রেসিডার চলে যাওয়ার কথা, মাত্র দুটি লাইনে। পরের দুটি লাইনে আরো উত্তরণের কথা—অন্য জীবনের কথা। 'কালো সন্ধ্যায়' 'শ্বেতবাহু' সেই মুক্তির নির্দেশ? 'রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী' কে জানি না। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নবোঢ়ার বাহুবন্ধন'।[২৬] এ কি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব সংযোজন? চসর, হেনরিসন বা শেক্সপীয়র কারো লেখাতেই তো অন্য নারীর উল্লেখ নেই।

তবে কি 'তুমি' (পুরনো ক্রেসিডা, ট্রয়লাসের প্রেমিকা ক্রেসিডা) এবং 'রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী' (ফিরে-আসা ভিখারিণী কুষ্ঠরোগগ্রস্তা অপরিচিতা ক্রেসিডা) ব্যক্তি হিসেবে একই? কালো সন্ধ্যায় 'শ্বেতবাহু' কি ক্রেসিডার ঐ কুষ্ঠরোগেরই ইঙ্গিত? প্রেমের-বিশ্বাসের জগতকে ঢেকে দিল ঐ বিশ্বাসঘাতিনী, হেনরিসনের ভাষ্যে শাস্তি-পাওয়া নারীর হাত দুটি।

তারপর দীর্ঘ একটি ছেদ। ক্রেসিডা যখন সম্পূর্ণ বর্জিত, প্রাক্তন, তখনই ট্রয়লাসের কাছে সে মাঝে-মাঝে ফিরে আসে। বারবার মনে পড়ে তার অতীতের সাহচর্যের মাধুর্য। কিন্তু ফেরার উপায় নেই, তাগিদও নেই, বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—শুধু ছিন্ন পড়ে থাকে বড় জোর একটি নিঃসঙ্গ লাইন :

'স্মরণে তোমার হানে আজো তরবারি!'

১/৪. অশোক সেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। 'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩৬ ব।

২. রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। 'পরিচয়', অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ ব।

৩. দ্র. 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ কর্তৃক লিখিত "আর্থিক উন্নতি"-র তিন বৎসর'। বিনয়কুমার সরকার, 'বাংলায় ধনবিজ্ঞান', ১ম ভাগ (১৯২৫-৩১)। চক্রবর্তী চ্যাটার্জী, ১৯৪০। পৃ ৫১৪-৪৬।

৫/৭/১১/১৩/১৫/২০/২৪/২৫/২৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'চোরাবালি'। 'স্বগত', ভারতীভবন, ১৩৪৫ ব। পৃ যথাক্রমে ২১৫, ২১৫, ২১৩, ২১৩, ২১৩, ২১১, ২১০, ২১১, ২১১। ২০নং অংশটি যে অনুচ্ছেদে আছে, তার সব কটি উক্তিরই উৎস এই।

৭. বুদ্ধদেব বসু, "চোরাবালি"। 'কালের পুতুল', কবিতাভবন, ১৯৪৬। পৃ যথাক্রমে ৯১, ৮৮-৯।

৮. প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, 'কাদম্বরী'। বেঙ্গেভিউ পাবলিশার্স, ১৩৫৬ ব (২য় সং)। পৃ ১০৪-৫, ১১২-১৩।

৯. এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন অশ্রুকুমার সিকদার ('রাবীন্দ্রিক আধুনিক'। 'চতুরঙ্গ', মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩ ব)। কিন্তু ঐ প্রবন্ধে তিনি একটি ভ্রান্ত অনুমান জ্ঞাপন করেছেন বলেই মনে হয়। অবশ্য এই ভ্রান্তির অনেকগুলি কারণ আছে। গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুটির রচনাকাল নেই, কিন্তু 'পাত্র ও পাত্রী' নামে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। অন্যদিকে, বিষ্ণু দে-র 'টপ্পা-ঠুংরি' 'কবিতা' পত্রিকায় ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু এর রচনাকাল 'চোরাবালি' গ্রন্থের সিগনেট সংস্করণে আছে ১৯৩৫ (ভারতীভবন-১ম সংস্করণে রচনাকাল নেই)। এ থেকে অনুমান করা অসংগত যে, প্রকাশের পূর্বে বিষ্ণু দে-র কবিতাটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ভাষায় কবিতাটি পুনর্লেখন করেছেন। বরং রহস্য উদ্ধার যদি করতেই হয়, এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে, 'টপ্পা-ঠুংরি'-র রচনাকাল ভুলবশত ১৯৩৫ দেওয়া হয়েছে, কিংবা বিষ্ণু দে-ই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা-দুটি পড়েছিলেন। দুজনের ব্যক্তিগত, সামাজিক বা সাহিত্যিক অবস্থান থেকে এই অনুমানই সংগত।

১০/১৪. Fried Fordham, *An introduction to Jung's psychology*. Penguin, ১৯৫৩। পৃ যথাক্রমে ২১৩, ১৮। অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

১২. রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', ১১শ খণ্ড। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি। বিশ্বভারতী, ১৩৮১ ব। পৃ ২৫৫।

১৬/১৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঘোড়সওয়ার'। 'অমৃত', ১ ফাল্গুন ১৩৫৬ ব।

১৭, শঙ্খ ঘোষ, 'বক্তুর ছন্দের দুর্গে'। 'ছন্দের বারান্দা', চিত্রক, ১৩৫৬ ব। পৃ ৮৮।

১৯/২৩. অরুণ সেন, 'বিষ্ণু দে : কবিতার পাঠান্তর'। 'পরিচয়', শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৬ ব

২১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'বিষ্ণু দে'। 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়'। নাভানা, ১৯৫৯। পৃ ২৯৮।

'সহস্রবাহু নীড়ে খুঁজি ভাষা'

'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি'-র পর, বিষ্ণু দে নিজেই ইঙ্গিতে বলেছেন, 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থটি একটি নতুন ধাপ, বাঁকবদল।[১] রাজনৈতিক চেতনার প্রথম কাব্য। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ দেখেছি কবি 'ব্যক্তিচিত্রকে জগচ্চিত্র ভাবার' মোহময় জগৎ ছেড়ে কিভাবে তীর্থযাত্রীর কঠিন ও নিঃসঙ্গ নিষ্ঠায়

পৌঁছুতে চেয়েছেন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ উপলব্ধির জগতে। 'চোরাবালি'-তে সেই উপার্জনেরই বহুচারী অনুশীলন। 'চোরাবালি'-র কাব্যভাষায় পরোক্ষচর্চার সাফল্য, বা সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নৈরাত্ম্য সিদ্ধি'—তার পরও সেই বিজিত রাজ্য ত্যাগ করে তিনি যে নতুন অনুসন্ধান ও উচ্চারণের ঝুঁকি নিলেন, তার পেছনের তাগিদটা এই নবলব্ধ সমাজচেতনাই। কিন্তু দেখবার বিষয় কিভাবে এই নতুন রাজনৈতিক সংলগ্নতা ও অঙ্গীকারকে প্রথমে কিছুটা তাত্ত্বিকভাবে হলেও পরে নিজের পূর্বতন ও বর্তমান অভিজ্ঞতার নানা আবেগের সঙ্গে ক্রমশ মিলিয়ে নিলেন, বা বলা যায়, কিভাবে তিনি ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ পরোক্ষকে এক বৃহৎ তাৎপর্যে মেশাতে চাইলেন, অর্থাৎ তাঁর কাব্যজীবনের যা অন্বিষ্ট তার সূত্রপাত হল—এ সবেরই জমি এই 'পূর্বলেখ'। সব কটি কবিতাতেই এই সাফল্য সমান ঘটেছে এমন নিশ্চয়ই বলা যায় না। বরং কিভাবে রাজনৈতিক সংলগ্নতার চাপের মধ্যেও তিনি ক্রমশ ব্যক্তি ও ব্যক্তিনিরপেক্ষর সমন্বয়ের কঠিন জগতে পৌঁছলেন সেই চেষ্টারই ইতিহাস এখানে।

কখনো সনেটের সংবৃত গাম্ভীর্যে ও খানিকটা স্বেচ্ছাকৃত ছককাটা বিন্যাসে, কখনো রাজনৈতিক রূপকের অতি-প্রত্যক্ষ উপস্থাপনায় যে সামান্য মতবাদনির্ভর-তার দূরত্ব থেকে যায়, তা এ-গ্রন্থেরই কোনো কোনো কবিতায় আবার আস্তে আস্তে সরেও যায়। বহু সংগ্রামের পর যেন কবি সহজ হয়ে ওঠেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাপে নবলব্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে—বা উল্টোটাও —সামাজিক-রাজনৈতিক নতুন প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগতকে চিনতে শুরু করার অভিযানে।

'সপ্তপদী' কবিতাটি এরকমই চরিতার্থতার একটি উদাহরণ। তবে সবচেয়ে সফল বোধহয় তিনি 'পদধ্বনি' ও 'জন্মাষ্টমী'-তে। ফলে কোনো-এক সমসাময়িক পুস্তক-সমালোচনার লেখকের ভাষায় প্রথম কবিতা 'বিভীষণের গান' এ-গ্রন্থের 'ফতোয়া কবিতা' হতে পারে[২]—কিন্তু ফতোয়ার উঁচুগলা খাদে নামিয়ে তিনি তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞতার সঠিক উচ্চারণ খুঁজে পেলেন কিন্তু এই দুটি কবিতাতেই। 'পদধ্বনি'-কে এমনকি পূর্বযুগের প্রেমের অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলে ধরে নিতেও বাধা থাকে না। আবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, কোথায় যেন প্রেমের অভিজ্ঞতার জগৎ পার হয়ে অন্য এক ইঙ্গিতকে খোঁজা হচ্ছে। উলূপীর প্রেমের 'তিমির পঙ্ক' ও উর্বশীর প্রেমের 'আতিশয্যের ভার' পার হয়ে-হয়ে যখন পৌঁছনো গেল সুভদ্রার প্রেমের পরিপূর্ণতায়—'সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত

মোহানায়' — চকিতে পেয়ে গেলাম যখন বিষ্ণু দে-র আসন্ন পরিণত-কাব্যজগতের নব-আবিষ্কৃত ভাষা — তখন কিন্তু পালাবদলেরও শুরু। এসে যায় 'দস্যুদল' — নতুন জগতের নতুন শক্তি। কবিরও জন্মান্তর ঘটে। 'বিভীষণের গান'-এ-ই তো কবি বলেছিলেন, 'স্বধর্মে আজ সন্দিহান।' কবির অন্বয় একবার যেন অর্জুনের সঙ্গে, আরেকবার এই নতুন দস্যুদলের সঙ্গে। অর্জুনের সঙ্গে অন্বয়ের ট্র্যাজিক আয়রনি-তেই শেষ নয়, বিভীষণের মতো তাঁর শ্রেণীবদল ঘটে — দস্যুদলের আবির্ভাব ঘোষণাতে তাই তাঁর কণ্ঠে এত উৎসাহ। আর তখনই সব তাৎপর্য বুঝে নিতে আমাদের জরুরি হয়ে পড়ে এই রাজনৈতিক মাত্রার — ধনতন্ত্রের সিদ্ধির উত্তরাধিকারী, অথচ ধনতন্ত্রের কবরের ওপরই যার আবির্ভাব, সেই সমাজতন্ত্রের জয়গান।

'জন্মাষ্টমী'-তে এই রাজনৈতিক মাত্রা আরও স বদ্ধ, আরো পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় নিশ্চিত। অর্জুনের ক্লান্তি, গ্লানি ও পরাজয়বোধ এখানে শহুরে জীবনের অতীত রোমান্টিক মায়ার উদ্‌গীরণে এবং বর্তমান অবক্ষয় ও খণ্ডতার মধ্যে ছড়িয়ে যায়— প্রেমের বদলে সামাজিক পটভূমির বিস্তারকে মুখ্য বিষয় করার ফলে। আর দস্যুদল বা কিরাতের আবির্ভাব নিরঙ্গ রূপ পায় বেঠোফেনের সিমফনির সাংগীতিক বর্ণনায়। এও তো কবিরই অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত অগ্রগতির এই অভিজ্ঞতার ইতিহাসের সূত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে আসে বৃহৎ সামাজিক-রাজনৈতিক পট। কবির অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে বড় অভিজ্ঞতারই অণুবিশ্ব—তাৎপর্য পায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বৃহৎ মাত্রার আলোকে।

কবির এই অগ্রগতির সাক্ষ্য বা দিকবদলের ঘোষণা গ্রন্থে-বিন্যস্ত প্রথম কবিতা থেকেই প্রায়। কিন্তু উপমাটা 'বিভীষণের গান' কবিতায় বড় বেশি সোজাসুজি ও কিছুটা উগ্র। ধনতন্ত্রের মৃত্যুসংকট ও বিভীষণের দলবদল বা শ্রেণীবদল খানিকটা যান্ত্রিক সমীকরণের কারণেও বোধহয় একটু কম অভিনব। তবু একদিকে 'অতিপুষ্টির অতিসার রোগে বর্ণহীন' এবং 'শোথাতুর' স্বর্ণলঙ্কা, আর অন্যদিকে 'প্রবল মরণে এ রোগ হানো' বা 'প্রাণপ্রবাহের সঞ্জীবনী তৃষা'— রোগ এবং রোগমুক্তির এই প্রতিমার বিন্যাসে কবিতাটিতে যে সংহতি আসে, তার আকর্ষণ সন্দেহাতীত। সর্বোপরি আছে : 'মুক্তির আশা, শ্যাম জলধর'— এ গ্রন্থের সবচেয়ে আদৃত প্রতিমা।

এই বাঁকবদলের কাহিনী, 'বিভীষণের গান'-এ যা ছিল রূপকের আড়ালে,

তা-ই যেন কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতায়[1] স্বীকৃতি পায় এবার 'পূর্বলেখ'-র দ্বিতীয় কবিতা, অর্থাৎ 'চতুর্দশপদী' কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতায়।

নাট্যকাব্যে সাঙ্গ হল নেপথ্যবিহার।
ভগ্নদূত ফিরে এল চংক্রমণ-শেষে।
তুষারকৈলাসে ক্ষান্ত ভ্রমণস্পৃহার
কেলাসিত অভীপ্সাও পরাক্রান্ত দেশে।
শান্ত হল কৈশোরের নিঃসঙ্গ বিচার,
বলিষ্ঠ বিলাসে ক্লান্ত স্বয়ম্বব মন।
যাযাবর অহংকাবে আপন ইচ্ছার
নিরালম্ব সীমা পেল বিহঙ্গ যৌবন।

ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে আগের যুগের কাব্যসন্ধান বিষয়ে তীক্ষ্ণ আত্ম-সমালোচনা। কবির কাছে আজ সব বাতিল—নাট্যকাব্যের পরোক্ষতা, নিছক শিল্পিত প্রয়াসের শৌখিনতা ও হিমশীতল শুদ্ধতা, আত্মনির্ভর বুদ্ধি ও আবেগের উপর আস্থা, সব কিছুই। যৌবনধর্মে আত্মবিশ্বাসের অহংকার তাকে অস্থির করে তুলতেই পারে—কিন্তু তার ইচ্ছার সীমাবদ্ধতাটাও জানা হয়ে যায়, কেননা সে ইচ্ছার কোনো অবলম্বন নেই, শিকড নেই। তাই 'ভগ্নদূত ফিরে এল চংক্রমণ শেষে।'

এই আত্মসমালোচনার অষ্টকের পরেই আছে, যে-জগতকে তিনি এবার বরণ করতে চলেছেন, তার মানচিত্র, সনেটের দ্বিতীয় স্তবকের পাঁচ লাইনের পরিমিতিতে :

হে আদি জননী, আজ তীর্থযাত্রী ফিরে
তোমার সহস্রবাহু নীড়ে খুঁজি বাসা।
অজানা অনুজদল আছে বটে ঘিরে,
তবুও অতীত স্মৃতি, ভবিষ্যৎ আশা
তোমারই আননে দেখি, বিশ্বরূপ মাঝে।

'নিঃসঙ্গ বিচার'-এর পরেই 'সহস্রবাহু নীড'-এর বৈপরীত্যটা লক্ষণীয়। নিঃসঙ্গ ক্লান্ত তীর্থযাত্রী তুষারকৈলাসে ব্যর্থ ভ্রমণ সেরে ভগ্নদূতের মতো ফিরে এল নতুন আশ্রয়ে। এ আশ্রয় জনগণসঙ্ঘের মিলিত ঐক্যে—কবির কাছে অনেক কিছু অপরিচিত ঠেকে, তিনি তো অভ্যস্ত 'নিঃসঙ্গ বিচারে'-র ভুবনে—কিন্তু আজ তিনি এই সত্যে পৌছেছেন যে এখানেই অতীতের ক্লান্তি ও ব্যর্থতার অপনোদন,

এখানেই অতীতের যা কিছু উপার্জন তার সার্থকতা। ভবিষ্যতের আশাও এখানে। তাই এই আশ্রয়েই কবির মুক্তি। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের মতো নতুন এই উপলব্ধির জগতেই তিনি দেখেন সমগ্রের রূপ। এই আশ্রয়কে যে তিনি 'আদিজননী' বলে সম্বোধন করেছেন, তাতেও কি পাই য়ুং-এর 'গ্রেট মাদার'-কে ? বোঝা যায় কবি দেশের মাটির ভেতরে শিকড় চালাতে যান. দেশমাতৃকার সঙ্গে পরিচয়টা করতে চান গাঢ়।

ফরাসী কবি র‍ঁ্যাবোর উদ্ধৃতিতে যে কবিতার শিরোনাম ('Oisive Jeunesse…'), তাতেও আছে এই আত্মসমালোচনা এবং নতুন সমাজচৈতন্যে বাঁকবদলের কাব্যসিদ্ধান্ত—তবে রূপকের পরোক্ষতায় নয়—সেই সমালোচনা ও প্রতিজ্ঞা বিস্তারিত হল এই কবিতায় খানিকটা সামাজিক পটভূমির স্পষ্টতায়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ র‍ঁ্যাবোর 'নরকে এক ঋতু' থেকে ইন্দ্রিয়তীব্র কয়েকটি লাইন অনুবাদ করেছিলেন বিষ্ণু দে। এবার র‍ঁ্যাবো এসেছেন যৌবনের অনুভূতি-সর্বস্ব বদ্ধতা থেকে মুক্ত করতে। 'Idle youth/enslaved by everything/by being too sensitive/I have wasted my life'—এই হচ্ছে শিরোনামটির অলিভার বার্নাড-কৃত পেঙ্গুইন সংস্করণের অনুবাদ।[৩] র‍ঁ্যাবো-র লাইন দুটির সাহায্যে তিনি তাঁর নিজের প্রাক্তন কাব্য-অভিজ্ঞতার জগৎ যেন পার হয়ে যেতে চান। অন্যদিক থেকে আবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাষ্য চারিয়ে যেতে চায় নাগরিক মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞতার বাগধারায়। কবিতাটিতে অন্তত তিনবার আছে—'অনিদ্রাজীবী', 'চোখে নিদ্রা নেই', 'অনিদ্রাঘেঁষা' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ। আহত ইন্দ্রিয়ানুভূতি একদা কবিকে বিনিদ্র করে রেখেছিল—আজ তার সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা—মধ্যবিত্তের সুখস্বপ্ন বিলীয়মান, কঠিন বর্তমান তাদের নিদ্রা-টুকুকেও কেড়ে নিয়েছে। 'ধূসর দিন', 'বিরস প্রহর', 'বিবশ শহর' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছে মধ্যবিত্ত ennui-এর স্বরূপটাও বোঝা যায়।

স্নায়ুর উপর আঘাত এবং বাঁকবদলের সচেতনতায় সেই সংকটকে চিনে নেওয়ার এই যে অভিজ্ঞতা, তাকে কবি চিত্রিত করেছেন 'সোনালি ঈগল' কবিতাটির প্রায় অবচেতন-মনস্তত্ত্বের জগতে। উপলব্ধির নতুন নতুন সংজ্ঞা ও ভাষার উপার্জন এবং পুরনো জমিকে ফেলে আসার মধ্যে মানসিক চাপ ও সংকট তো দেখা দেবেই। 'সোনালি ঈগল' কবিতাটিতে সেই মানসসংকট বা যুগসন্ধির চাপেরই সাক্ষ্য। স্বর্ণবর্ণ ঈগল নাকি স্কটল্যাণ্ডে একেবারে কাল্পনিক নয়। কিন্তু সেই সব 'ব্যক্তিগত' 'সোনালি স্বপ্ন'-র মরণদশা 'বেদনায় জবুথবু' জটায়ুর

মতোই। তাই সোনালি ঈগলের 'চঞ্চু' নামে আমাদের অচেতন নিশ্চিন্ততা ও সুখস্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে।

চঞ্চু কি তার নামে
তোমার ঘুমের দিকে ?

ফ্রয়েড তাঁর উদ্বেগ-স্বপ্ন বা anxiety dream-এর বিবরণে পাখির চঞ্চুর কথা বলেছেন—সেই উদ্বেগ ও তার ভীতিজনক শিহরণ কবিতার সর্বত্র ব্যাপ্ত।

ঝাপটে পাখা পাথরে
জানালায় শার্শিতে
ছাতে, দরজায়. ভিতে
পাখা হানে সকাতরে
নিরালা রাতের শীতে।

কবি স্বপ্ন দেখেন, আমাদের 'তন্দ্রাহত শহরে', 'পথে পথে দিকে দিকে' সোনালি ঈগলের নেমে-আসা—তার কল্পসৌন্দর্য নিয়ে নয়, তার আক্রমণাত্মক উদ্যত চঞ্চু নিয়ে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা থেকে শুরু করে কবির নিজস্ব সমস্যা পর্যন্ত যে অনিশ্চয়তা ও ভীতি কবিকে গ্রাস করেছে এ-সময়, তারই স্বপ্নতাড়িত বর্ণনা এই 'সোনালি ঈগল'। অবশ্য কবি তবু আত্মসমর্পণে রাজি নন—প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখেন 'স্বল্প সত্য'—'তবুও খুঁজি তোমায়'—যদিও জানেন 'ছিঁড়ে গেছে সব মিল'। পরাক্রান্ত তাঁর আশা, যদি 'স্বল্প সত্য' কোনো দিন 'সাবলীল' হয়।

এই আশা শুধু ব্যক্তিগত নয়, তিনি জানেন রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি মধ্যবিত্তেরও মুক্তি আত্মসমালোচনায় এবং আত্মপ্রসারণে। 'হে নিঃসঙ্গ শামুক!' এই হচ্ছে আত্মসম্বোধন। শুধু আত্মগত ভাবনায় বা আত্মকণ্ডূয়নে মুক্তি নেই, মুক্তি নেই নিছক অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের জগতে—সবই চোরাগলি। একমাত্র আত্মপ্রসারেই মুক্তি, স্বার্থবিসর্জনেই মুক্তি —সে প্রসার ভৌগোলিক সামাজিক রাজনৈতিক সব অর্থেই।

হে নিঃসঙ্গ শামুক! তোমার কুটিল মন!
কথা শোনো, করো ঘরকে বাহির, আপন পর,
হৃদয়কে করো আকাশের নীলে উন্মীলন। (Oisive Jeunesse)

বিষ্ণু দে-র প্রথম যুগের সৎ আত্মজিজ্ঞাসার নিশ্চয় এটাই পরিণতি। প্রথম যুগের কাব্যজিজ্ঞাসায় এলিঅট ও পাউণ্ডের নির্দেশিত আধুনিকতা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল ব্যক্তিময়তা বা ব্যক্তিসর্বস্বতার উর্ধ্বে উঠতে এবং

ঐতিহ্যসন্ধানের গুরুত্ব বুঝে নিতে। কিন্তু ঐতিহ্যের স্বরূপ বা সমগ্রতা যে এলিঅটের পথনির্দেশে পাওয়া যাবে না, সেই উপলব্ধিতে তিনি পৌছলেন অচিরে এবং সে ব্যাপারে তাঁর প্রধান অবলম্বন হল মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা।

এই সমগ্রতার ধারণায় পৌছতে তাঁর ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ যেমন দায়ী, তেমনি তার পশ্চাদপটে সক্রিয় ছিল নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নতুন ঘটনা বা পুরনো ঘটনারই রূপান্তর। ধনতান্ত্রিক বিশ্বের আর্থিক সংকটের ঘনিয়ে-ওঠা কালো ছায়া ভারতবর্ষের মতো ঔপনিবেশিক দেশকে যে কতখানি বিচলিত করবে তা তো সহজেই অনুমেয়। তার চেয়েও বড় কথা, 'পূর্বলেখ'-র কবিকে এই বিশ্বসংকটের পরিণতি, বিশেষত ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও বিস্তারের দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—ঠিক যেমন তাঁর আশাবাদের পেছনে কাজ করেছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পিত উন্নতি ও দেশে-দেশে সাম্যবাদী দলের সংহতির দৃষ্টান্ত। মনের এই দরজা খুলে যাওয়ার ব্যাপারটাকে কবি নিজেই তাঁর আত্মপরিচয়মূলক রচনায় বর্ণনা করেছেন এই ভাবে (অবশ্য ইতিহাসটা আরো আগে থেকে শুরু করে): 'আর তখন এদিকে চলেছে রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ী কীর্তিযাত্রা আর তাকে অনেকাংশে অসম্পূর্ণ পরিগ্রহণের আবহাওয়া। আর গান্ধিজীর আন্দোলনগুলি দেশকে থেকে থেকে দোলা দিচ্ছে আর থেকে থেকে প্রত্যাহার প্রায়শ্চিত্ত চলছে, চোখের সামনে শ্বেত রাজকীয় লোভের মরিচা প্রতাপের মধ্যে। তারপরে তো এসে পড়ল চীন-জাপানের লড়াই, স্পেনে এল সভ্যতার বীরত্ব ও প্রতিক্রিয়ার জোটের কাছে শেষ পর্যন্ত লজ্জাকর হার, এল মুসোলিনি হিটলারের ফ্যাসিজম্। পৃথিবী হয়ে উঠতে লাগল অসমতার মধ্যেও মনে মনে একটি দুনিয়া।'[৪] এই হল স্বদেশের অভিজ্ঞতা থেকে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় পৌছনোর পটভূমি।

'ঘরকে বাহির' করার এই নতুন চেতনা তাঁর কাব্যের অভিজ্ঞতাতেও পৌছয় —আন্তর্জাতিক নানা ঘটনা তাঁর ব্যক্তিগত বা স্বদেশগত সংকটকে আরো অর্থবহতায় গ্রথিত করে কিংবা তাঁর আশাকে আরো গাঢ় করে তোলে। ব্যক্তিগত খোঁজার মনস্তাত্ত্বিক চেহারাটা যেন মুক্তি পায় রাজনৈতিক পথ সন্ধানের ব্যাপ্তিতে। ধরা যাক '১৯৩৭—স্পেন' কবিতাটিই: ফ্যাসিবাদের চক্রান্তের 'জীবনজয়ী' সাফল্যে—'প্রণয়' যখন পালায় 'প্রচণ্ড ভ্রূ-র ভঙ্গে' এবং 'রুচির হাসির শুচিতা' মুছে যায় 'অঘোরপন্থী'-র 'রক্তে'—তখন সেই প্রবাদবিখ্যাত ক্ষ্যাপা শুধু খুঁজে ফেরে স্পর্শমণি। এই 'স্পর্শমণি'-ই 'স্বপ্নসত্য'। স্পেনকে রক্ষা

করার প্রতিজ্ঞায় 'আন্তর্জাতক বাহিনী' সেই স্পর্শমণিরই খোঁজ পায়, স্বপ্ন সত্য হয়ে ওঠে সাবলীল—'বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি'। কিন্তু অন্য দিকে প্রাণ-বাঁচানোর তাগিদে অশুভ আঁতাত গড়ে ওঠে, ভেঙে দিতে চায় ঐ 'স্বপ্ন সত্যে'-র বনিয়াদ। ফ্রাঙ্কোকে মদত দিয়ে চলে প্রত্যক্ষভাবে, হিটলারের জর্মানি, মুসোলিনির ইতালি, পরোক্ষভাবে 'মিত্রশক্তি' ব্রিটেন ও আমেরিকা। 'শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রু মিত্র।'

মার্কসবাদী এই চেতনাই তাঁকে নিয়ে যায় 'ঘর ও বাহির আপন ও পর' এই পুঁথিগত বিভেদের ঊর্ধ্বে। এই চেতনাতেই আবার তিনি নতুন পরিস্থিতিতে শিল্পীর দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হলেন। ধনতন্ত্রের সংকট ও ফ্যাসিবাদের উত্থান সারা পৃথিবীর শিল্পীসাহিত্যিকদেরই চিন্তাকুল ও সংহত করেছিল এ-সময়ে। একেই বলা হয়েছে, 'বিশ্বপ্রগতির কর্ম ও চেতনার বিস্তারে শিল্পীর নবজন্ম।' প্রগতি লেখক আন্দোলনের জন্মের সময়ও এটাই। ভারতবর্ষে এবং সেই সূত্রে বাংলা দেশেও ঐ আন্দোলন দানা বাঁধতে লাগল—১৯৩৬-এ ভারতে প্রগতি লেখক সংঘের জন্মও হল। বলা বাহুল্য, বিষ্ণু দে সেই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম বোধ করলেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় : [বিষ্ণু দে-র সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের] 'অনতিবিলম্বে চিন্তায় খানিকটা সাযুজ্য আবিষ্কৃত হল, সভাসমিতি ব্যাপারে অনীহাগ্রস্ত হলেও, "প্রগতি" আন্দোলনকে মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করলেও বিরূপতা দেখালেন না, বরঞ্চ নিজের ঈষৎ তির্যক ভঙ্গিতে সহায়তাই করলেন ·আরম্ভ হল অন্তরঙ্গ সহযোগিতা যা আজও অটুট।'[৫] এই হচ্ছে 'পূর্বলেখ'-যুগের কথা। তাই তো ১৯৭৬-এ এসে চল্লিশ বছর আগের কথা 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও প্রগতি লেখক সংঘ আপনার জীবনে কতখানি ও কী প্রভাব বিস্তার করেছে?' এই প্রশ্নের উত্তরে কথা কেড়ে নিয়ে দ্বিধাহীনভাবে বিষ্ণু দে বলেন : 'উর্বশী ও আর্টেমিস আর চোরাবালি-র পর পূর্বলেখ-র ডাইরেকশনে।'[৬]

প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনই হোক বা নতুন সমাজচেতনার বড় জমিই হোক, আসল উপার্জন তো তাঁর ব্যাপ্ত ঐতিহ্যচেতনা ও ধনতন্ত্রের দুঃসময়ের অবসানে বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎকল্পনা। তাই তো 'রসায়ন' সনেটটিতে তিনি প্রার্থনা জানান, পণ্যসভ্যতার অমানবিক নীতিতে শেক্সপীয়রের নায়ক টাইমনকে যেহেতু সদাচরণ ও পরোপকারবৃত্তির দোষে ঋণগ্রস্ত হয়ে পালাতে হয় বনে, আজ 'টাই-মনের সেই পলাতক ঋণ' শোধ হোক, শেষ হোক পণ্যসভ্যতার দুর্নীতি।

'হেগেলের আত্মশ্লাঘা'র বৈপরীত্যে তাঁর ঐতিহ্যচেতনায় আসে 'মাতিসের আলপনা'—কেননা এরই সঙ্গে তো সংলগ্ন জনজীবন, কারখানা ও চাষের মানুষ। তাই এই নতুন চেতনাতে সমৃদ্ধ হয়েই তিনি করতে পারেন মৃত্তিকাসংলগ্নতার ঘোষণা, জীবনের সুরসতা প্রার্থনা করতে পারেন 'গ্রাম্য রাখাল', সমাজ-পরিবর্তনের ধাক্কায় যে আজ 'রেল লাইনের কুলি', তার কাছে।

> দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, এই দ্বিধা—ব্যক্তি ও বিশ্বের,
> সর্পিল দ্বৈতের স্তূপে প্রাণধর্মে রসালো কঠিন
> ঋজু বনস্পতি হোক মৃত্তিকায় ঘনিষ্ঠ আকাশে
> সমাহিত। ('রসায়ন')

'পূর্বলেখ'-তে মৃত্তিকাঘনিষ্ঠতার একটা বড় বহির্লক্ষণ ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল পুরাণের ব্যবহার। পুরাণের ব্যাপক ব্যবহার তো আমরা আগের গ্রন্থ দুটিতেও দেখেছি—কিন্তু সেখানে সমধিক এসেছে প্রতীচ্য পুরাণ। বস্তুত 'চোরাবালি'-তে প্রতীচ্য পুরাণের উল্লেখ সংখ্যায় বোধহয় কিছু বেশি। 'পূর্বলেখ'-তে এসে প্রতীচ্য পুরাণের সংখ্যা দুটিতে দাঁড়িয়েছে (য়ুলিসিস, হেক্টর), তাও ব্যঙ্গের প্রয়োজনে। পাশাপাশি ভারতীয় পুরাণের উল্লেখ সংখ্যাতীত—উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণ থেকে চরিত্র, প্রসঙ্গ, শব্দ এত এসেছে যে 'পূর্বলেখ'-র কবিতাগুলির আবহ বা পরিপার্শ্বকেই প্রায় ভিন্ন রকমের করে তুলেছে। ঋগ্বেদের শ্লোক উদ্ধার করে পিতৃপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে 'পূর্বলেখ' গ্রন্থটি উৎসর্গের মধ্যেই বিষ্ণু দে-র সে-যুগের প্রবণতা স্পষ্ট হয়েছিল। ঈশ উপনিষদের 'হিরন্ময় পাত্রেণ' শ্লোকটির শব্দগত অনুষঙ্গ 'পূর্বলেখ'-তেই ব্যবহৃত হল প্রথম। রবীন্দ্রনাথের সূত্রে উপনিষদের শব্দগত পরিচয় আগেই ছিল বাঙালি পাঠকের। বিষ্ণু দে এই সব ঔপনিষদিক অনুষঙ্গকে নবলব্ধ সমাজচেতনায় বিধৃত করে দিলেন। পরে আজীবন তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে যারা চকিত শব্দদ্যোতনায়, তাদের ব্যবহার 'পূর্বলেখ'-তেই প্রথম ('হিরন্ময় ঢাকা', 'সূর্যপাবন', 'হিরন্ময় হে আদিত্য', 'হে পূষণ' ইত্যাদি)। মহাভারত থেকে দেবদেবী বা অন্যান্য চরিত্র গ্রন্থে পরিকীর্ণ হয়ে আছে।

একই সঙ্গে যখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছেন তখনই দেশের প্রাচীন ও জীবন্ত ঐতিহ্য থেকে এই পরিগ্রহণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মার্কসবাদকে কোন সৃজনশীলতার স্বরূপে তিনি পেতে চান। প্রতীচ্য

পুরাণের ব্যবহারের সঙ্গে আরেকটা তফাৎ লক্ষণীয় ভারতীয় পৌরাণিক উল্লেখ কিন্তু বৈপরীত্যে তেমন ব্যবহৃত হয় নি, অনুকূল উপমান বা অনুষঙ্গে কবি তাদের কালোপযোগী করে তুলেছেন। এবং আরো বিস্ময়কর এই কারণে যে, এই কাল-বোধ ধনতান্ত্রিক সমাজের আশু অর্থনৈতিক সংকট ও মুক্তি-অভীপ্সার প্রায় রাজনৈতিক ইডিয়মের সঙ্গে জড়িত। মহাকাব্যের বা পুরাণের ধ্রুপদী ন্যায়-অন্যায় বা জয়-পরাজয়ের বোধ এবং সেই জগতের চরিত্রের তৎকালীন আদর্শনির্ভর আচার-আচরণকে আধুনিক প্রতীক-ধারণার বা কবির যুগচেতনার সীমার মধ্যে এনে ফেলেছেন অনায়াসে। আর তার ফলে দ্বারকা, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, 'বারণাবত' ইত্যাদির স্থানমাহাত্ম্য আমাদের বাস্তব জগতের ভূগোলের সঙ্গে মিলেমিশে যায়—বিভীষণ, হিরণ্যকশিপু, সুভদ্রা, ইন্দ্র, প্রহ্লাদ, সঞ্জয়, বিশ্বামিত্র, নচিকেতা ('নাচিকেত ঋণ', 'নাচিকেত মেঘ') ইত্যাদি পৌরাণিক যুগের চরিত্র আমাদেরই চেনা মানুষের ও অভিজ্ঞতার উপমান হয়ে ওঠে।

'পূর্বলেখ'-র বাঁকবদলে বিষ্ণু দে-র কবিতার সামাজিক জগতটাও প্রসারিত হয়ে গেল। 'চোরাবালি' পর্যন্ত যে জগৎ ছিল তাঁর অত্যন্ত চেনা কিন্তু সংকীর্ণ, অর্থাৎ কলকাতার উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, শিক্ষিত কালচারবিলাসী মানুষের ড্রইংরুম—সেই 'লিলি-রমা-অলকা'-র ভিড, 'সুরেশ ও সুবর্ণর অশ্লীল নিশ্বাস'-কে অতিক্রম করে চলে এল কলকাতার ও তার শহরতলির কিংবা মফস্বলের ছেঁড়াখোড়া বাস্তবতা, দরিদ্র দুস্থ পঙ্গু মানুষ, আবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ফেরেপবাজ, দালাল আর শয়তানরাও। ব্যঙ্গের জগৎ ছেড়ে কবি চলে এলেন সমব্যথীর জগতে। নতুন নতুন চরিত্র এল তাঁর কবিতার নতুন নাট্যে—ধূর্ত নাগরিক যারা অর্থকামস্বর্গ খুঁজে ফেরে হাইকোর্টের পাড়ায়, 'ডালহৌসির দিকে' স্বর্ণসন্ধানী তালবাজ; ফারপোর সামনের ভিড; আত্মহারা কর্মবীর কেরানী যারা চৌরিঙ্গির পথে ছত্রভঙ্গ, গোষ্ঠ হতে ধেনুর মতোই; 'লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী' যারা সিনেমা-দোকান-কাফেতে ঘোরে; হাওড়ার দিকে পণ্টুন ব্রিজকে কাঁপিয়ে যারা ছুটছে দলে দলে সেই সাধারণ মানুষ, 'সূর্যালোকে বিহ্বল সামান্য মানুষ'; দুর্ভিক্ষে উজাড় গাঁ থেকে আসা নিরন্ন মানুষ; 'গ্রাম্য রাখাল, রেল লাইনের কুলি'—এই সব চরিত্র।

বিলাসী মধ্যবিত্তের কূপমণ্ডূক জগৎ ছেড়ে তিনি চলে এলেন বটে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের জগতে, সমব্যথীর অনুকম্পায়, কিন্তু তাঁর বাস্তবচেতনা

এই নতুন চরিত্রের চিন্তা ও অস্তিত্বের নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলাকে আঁকতে ভুল করে নি। এই জগাখিচুড়ি বাঙালি মনের কীর্তির চিত্র আমরা অনেক পেয়েছি সমসাময়িক বিবরণে। এই বাঙালি স্বপ্ন দেখে, সে স্বপ্নে উত্তরণের নীল পাখি আর পরিণামচিন্তাবিহীন লোভের ও শক্তিমত্ততার বাজ বা এমনকি সোনালি ঈগল সব গোলমাল করে দেয়—তাই সে মানুষ 'সামান্য' এবং 'বিহ্বল'।

তারা খাটে না, বোনেও না, তারা মাথা কাটে না, কোটেও না
অনুকূল সুযোগের সবুজ ঘাসে
সূর্যালোকে বিহ্বল সামান্য মানুষ,
চেয়ে থাকে তারা স্বল্প সার্থকতার অধিকারে
স্বয়ম্বশ সম্পূর্ণ সবল।
সাধ হয়—
অবসাদহীন আদিম অপরাধ—
পদ্মভুক্ দেশে যাবে ভেসে
সাধ হয়
নীলে নীলে হই অবাধ স্বাধীন
ভেদাভেদহীন নীলে পক্ষলীন
নীল পাখি, শ্যেন, বাজ
ঝিকিমিকি লাল সোনালি ঈগল সামান্য মানুষ
মনে সাধ যায়
সেলাম সরকার
উমেদার ভিখারি বেকার
ক্লান্ত চাকুরিয়ার
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য
সাধ হয়··· ('আবির্ভাব')

উৎপাদনসম্পর্কবিহীন নিরুদ্যম বাঙালি স্বাধীনতারও স্বপ্ন দেখে, উমেদারিরও স্বপ্ন দেখে—নীল পাখির স্বপ্ন দেখে, সোনালি ঈগলেরও দেখে। কবি জানেন কী ভয়াবহ পরিণাম লেখা আছে তাদের ভাগ্যে। তাই ব্যঙ্গ ও করুণার অদ্বৈতে বলে ওঠেন :

সম্বরো সম্বরো বজ্র
এ যে মৃদু মৃগের শরীর

অথবা তিত্তির
কিম্বা চড়াই কিম্বা মানুষ···

অবশ্য এই নির্মোহ দৃষ্টিপাত অভিজ্ঞতার বৃত্তের বাইরে আরও সঞ্চারিত হতে থাকে—ঈষৎ বাঁকাভাবে হলেও তিনি বলেন, 'দূরবীনে দেখি আর কানে কানে শুনি জনগণমনে ঢেউ।' এই ঢেউ যারা তুলেছে, সেই সমাজরূপান্তরের কর্মী বীর মানুষের ছবিও ফুটে ওঠে তাঁর কলমে—'লাখো কৃষাণ' বা তার প্রতীকী রূপান্তর 'নীলকমল'-এর উল্লেখে ('পদধ্বনি' কবিতাতে এই নতুন বীর মানুষের চিত্র পৌরাণিক আবহে চিত্রিত হয়েছে, পরে তা আলোচ্য)—যদিও হয়তো এখনও তা সীমিতই এবং শ্লেষের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মধ্যবিত্তচিত্ততাকে আক্রমণ যতটা স্বাভাবিক লাগে, বাঁকবদলের নতুন ফলত অনভ্যস্ত ভাষায় শ্রমজীবী মানুষের বিষয়ে আত্মীয়তা বা আনুগত্য ঘোষণা হয়তো কিছুটা ব্যস্ত শোনায়।

তবে 'ভাংচি'-র মতো কবিতায় শ্লেষের এই বাঁকা ভঙ্গি এবং নতুন সমাজ-চেতনা সহজে মেশে বলেই অনেকটাই অনিবার্য মনে হয় এর অভিজ্ঞতা। এ দেশে শিল্পায়নের এবং শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের নতুন পরিস্থিতিতে কবি যেমন একদিকে গ্রামীণ কৃষকের শহুরে মজুরে রূপান্তরের সামাজিক ঘটনাকে কবিতার আবহে রাখেন, তেমনি সামাজিক রূপান্তরের নতুন রঙ্গে 'চক মিলানো ঘর'-এর লোভে মজুর প্রবল বিদ্রূপে প্রশ্ন করে চটকলের সর্দারকে :

কাঁচা মাটিতে ফলে না আর সোনা,
মরেছে নদী, আকাশ দিওআনা,
বাস্তুঘুঘু করে যে আনাগোনা,
ভাগ্য করে দুহাতে তুলোধোনা,
নিজের বাসভূমে অস্থিসার
হয়ে কি লাভ, কি বলো সর্দার ?

ভঙ্গিটা নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার, কিন্তু আসলে এ প্রতিবাদেরই ভাষা। ভোগবাদী স্বার্থপর জীবনের কৃত্রিম উপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য, যান্ত্রিকতার আরাম লুব্ধ করে যাকে, সে-ই কি করে তা না হলে খবরদারির দেশীয় এবং হয়তো আন্তর্জাতিক হুঙ্কারের ইঙ্গিতে শেষ করবে ?

শান্তি আর শৃঙ্খলার সুর
ক্বচিৎ ভাঙে, হাঁকে খবরদার
প্রবলস্বরে পাইক সর্দার।

'পূর্বলেখ'-তে অনেক সনেট স্থান পেয়েছে—'চতুর্দশপদী' কবিতাগুচ্ছেই আছে ১৪টি সনেট। তা ছাড়া 'বৈকালী' বা 'সপ্তপদী'-তেও কয়েকটি ১৪ লাইনের কবিতা আছে, কয়েকটি ১৬ লাইনের। প্রধানত সনেটগুলো সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা জাগে, এ সময়ে সনেটের প্রতি এই পক্ষপাত কেন? 'চতুর্দশপদী'-গুচ্ছের সনেটগুলি শুধু আকারেই ছোট নয়, এর চালটাও খুব ভাবগম্ভীর—ভাষায়, পৌরাণিক উপমা ও প্রসঙ্গের ব্যবহারে ও দ্বান্দ্বিক সচেতনতায়। সুতরাং প্রশ্নটা এই : বাঁকবদলের মুহূর্তে এই আত্মসংবৃত, ভাবগম্ভীর সনেটগুলো লেখা হল কেন? প্রথম দুটি গ্রন্থে আবেগের ও মননের যে স্ফূর্তি, তা এখানে এসে নবলব্ধ সমাজচেতনার মুহূর্তে কেন আত্মসংকুচিত হয়ে গেল তৎসম শব্দের দূরত্বে ও সংক্ষিপ্ততায়?

আসলে 'পূর্বলেখ'-তে এসে কবির কাব্যভাষাই যেন পালটে গেল। বাক্যগঠনে ও শব্দব্যবহারে এল ভিন্ন ধরনের সচেতনতা ও কাঠিন্য। অবশ্য প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থেও ঠিক একই ধরনেব বাক্যগঠনরীতি বা শব্দ ব্যবহার কবা হয় নি এমন বলা যায় না। কিন্তু পূর্বের তুলনায় 'পূবলেখ'-তে এসে বাক্যবিন্যাস হয়ে গেল সংহত, কিছুটা যেন ভেতরের দিকে গোটানো। বাক্যরীতিতেও ক্রিয়াপদের বদলে সংস্কৃত রীতিক্রমে বিশেষণের আশ্রয় নেওয়া হতে থাকে। বিশেষ করে সনেটগুলোতে প্রায়শই এক-একটি বাক্যই এক-একটি চরণ, প্রবহমানতা বহু স্থানেই উপেক্ষিত, যেখানে আছে সেখানেও মাইকেলী রীতিতে বড় বেশি প্রত্যক্ষ।

তৎসম শব্দের প্রয়োগ খুবই বেশি। একটু শক্ত বাঁধুনি, একটু যেন নিশ্চল স্থাণু। শব্দসমাবেশে কোনো তারল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি। কিন্তু তার ফলে একটু গম্ভীর, কঠোর, কৌতুকের ছোঁয়া মাত্র নেই। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর যদিচ সংহত তবু তীব্র আবেগ এবং 'চোরাবালি'-র ঝকঝকে উজ্জ্বল কৌতুকের দীপ্তির পাশে 'পূর্বলেখ'-র সূত্রপাত, অন্তত সনেটগুলির গাম্ভীর্য যেন আকস্মিক। মনে হয় নবলব্ধ সমাজচেতনা ও ইতিহাসবোধ কবির ব্যক্তিত্বের উপর কিছুটা ভারি হয়ে চেপে বসেছে—কবিকে সহজ হতে দিচ্ছে না।

অবশ্য তৎসম শব্দের সঙ্গে চলতি বুলি বা দেশী শব্দের সাহসী মিশ্রণের ফলে ভাষার জীবন্ত রূপ অধিকাংশ স্থানেই নষ্ট হয় নি—কিন্তু গতি যেন স্তব্ধ, একটি কবিতার শিরোনাম ধার করে বলা যায় একটু 'গুমোট'। ভবিষ্যৎদ্রষ্টার এই ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গেই মিলেছে বহু কবিতার প্রাকৃতিক আবহ।

'পূর্বলেখ'-র একটা প্রধান বিষয় বা সুরই হল তাই বৃষ্টিহীন গুমোটভাব—প্রতীক্ষার প্রাকৃত রূপ—অনেকটা বৃষ্টির ঠিক আগের মুহূর্ত। এবং মুক্তির বাণীবাহী বর্ষার ধারাজল। কবির বাস্তবসচেতনতা ও ভবিষ্যৎদর্শন বারবার মূর্ত হয়েছে এই প্রাকৃতিক বর্ণনায়।

গ্রীষ্মের আকাশ হল ম্লান নিঃস্ব নীল,
দানোপাওয়া ময়দানের দগ্ধ শ্যামলিমা।
আগ্নেয় ঈথারে কাঁপে গুটি তিন চিল। ('ডালহুসির দিকে')
তুঙ্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথা নাড়ে নাকো,...
বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো লাখো
স্বর্ণসূর্যরশ্মি হানে মর্মভেদী রূঢ়। ('গুমোট')
আহা! এ যে লঙ্কাজয়ী নবজলধর।
মাতলির বেগে আসে শিরস্ত্রাণ মেঘ! (ঐ)
জানি জানি, তাই
শান্তি নেই ঘর্মাক্ত গুমোটে ··('বৈকালী', ১)
বৃষস্কন্ধে সূর্য স্থির, বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের মড়কে
বর্ষভোগ্য রুক্ষ শাপ চৈতালির গড্ডল-চড়কে
আজো দেখি রিষ্টি বর্ষে। ('বৈকালী', ৪)
সন্ধ্যাকাশ ঢাকি কালবৈশাখীর নবধারাজলে
গলিত পিচের পথে, নীপবনে, ছায়াবীথিতলে। (ঐ)
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে দগ্ধ ঝামা
আকাশে ছড়াও হাব্‌সী মেঘের কঠিন শেল। ('বৈকালী' ৫)
বৈশাখীর ঝঞ্ঝা জীর্ণ গ্রীষ্মে শেষে হয় ভস্মলীন··· ('সপ্তপদী', ৭)
থরে থরে গুপ্তচর জলে স্থলে বায়ুহীন মেঘ · (ঐ)

'গ্রীষ্মের মড়ক', 'ঘর্মাক্ত গুমোট' এবং তারপর 'কালবৈশাখীর নবধারাজল'—সব মিলিয়ে পথসন্ধানের প্রতীক্ষা ও তার অবসানের ছবি আঁকা হয়েছে।

স্বভাবতই এই যুগ্ম প্রতিমার পুনরাবৃত্তি তাঁর নবলব্ধ দ্বান্দ্বিক চেতনারই ফসল। তাই তো এক সমালোচক লক্ষ করেন যে, এখানে সনেটগুলোর অষ্টক এবং ষট্‌ক উপস্থিত হয়েছে দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্যে।[৭] অবশ্য কোনো কোনো কবিতার ক্ষেত্রে এই বিভাজন প্রমাণ করা গেলেও বহু কবিতার ক্ষেত্রেই কিন্তু এই দ্বান্দ্বিকতা অন্তর্নিহিত প্রতিটি বাক্যে বা চরণে বা এমনকি শব্দগুচ্ছে।

নীরন্ধ্র অবীচি আর দুর্গন্ধ রৌরব
মর্ত্যে এ কে কালকেতু জনতায় ভরে! ('চতুর্দশপদী', ২)
শূন্যক্ষরা নীরে
বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক। (ঐ, ১২)

'পূর্বলেখ'-যুগে এই গুমোট বা স্তব্ধতাই কিন্তু শেষ কথা নয়। বাঁকবদলের সন্ধিক্ষণে গুমোট ভাবটা হয়তো অনিবার্য ছিল, কিন্তু তাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাও আছে। যেমন 'বৈকালী' কবিতায়। অবশ্য নতুন সমাজচেতনার আবেগ অর্গলমুক্ত এক দিনে হয় না। সনেটের মধ্যে দায়িত্বভারের অতি-সচেতনতা যে অনড় অবস্থা এনে দিয়েছিল, তা থেকে নিষ্ক্রমণ ধাপে ধাপে ঘটল। 'আবির্ভাব' কবিতাটি সে পথে একটা বড় ধাপ। সেখানে জনগণজীবনের ঢেউ টানা উচ্চারণে উত্তুঙ্গ হয়েছে—কিন্তু 'টপ্পা-ঠুংরি'-ও তা নয়—আর এসেছে 'সূর্যালোকে বিহ্বল সামান্য মানুষ'-এর মহিমা, মুক্তির দ্যোতক 'নীল' বর্ণের প্রতি কবির পক্ষপাত: 'নীলে লীন হৃদয় আমার।' কিন্তু কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত নয় যেন—এখনও বাঁকা ভাব আছে, এখনও সুর কেটে দিতে হয় ব্যঙ্গের পুরনো অভ্যাসে। তবু কণ্ঠস্বরে নতুন চেতনাব আবেশ এসে গেছে তাও অনুভব করা যায়:

দূরবীনে দেখি আর কানে কানে শুনি জনগণমনে ওঠে ঢেউ।
আর দিন গুনি।

'বৈকালি' আসলে কবিতাগুচ্ছ—১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে লেখা দশটি কবিতা। প্রথম কবিতায় দেখি আবার সেই শিথিলতা, আবার সেই টুকরোটাকরা ভাব, প্রকরণে নাগরিক পরিবেশের বিচ্ছিন্নতা, ব্যঙ্গ ও পরিহাসের হালকা ভঙ্গি, স্তবকবিন্যাসের-পর্বভাগের-ছন্দের বৈচিত্র্য। উত্তরণের আবেগ ও বিশ্বাসের চিত্রণও স্পষ্ট করে পেতে থাকি। দ্বিতীয় কবিতাটিতে নতুন আরেক মাত্রা এল—ভারতীয় পুরাণের ব্যাপ্ত সুদূর অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে বাংলার রূপকথার ঘনিষ্ঠতা ও নির্দিষ্টতা—যা আমরা পরবর্তী গ্রন্থ 'সাত ভাই চম্পা'-তে আরো ভালোভাবে পাই। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার ঘোড়সওয়ার আর শুদ্ধ প্রতীকের দূরত্বে নয়, রাজনৈতিক-সামাজিক উপলব্ধির ও প্রত্যাশার প্রত্যক্ষতায় রূপান্তরিত।

ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল

নাসাপুট উদ্ধত!
সে কোন পাহাড়ে চলেছে, নীলকমল
বলো কি তোমার ব্রত?

ঘোড়সওয়ার এখন নীলকমল—ব্রত তার সামাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্ব উদ্‌যাপনে। নচিকেতার ঋণশোধ বা আত্মোৎসর্গের মহিমার সঙ্গে যুক্ত হয় রূপকথার রাজপুত্রের বীর-অভিযান।

প্রথমাংশের ঐ বদ্ধতা—তাকে যদি কোনো-কোনো অর্থে কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতাই বলি—তা থেকে স্বাভাবিকতায় উত্তীর্ণ হতে দেখা যায় 'মুদ্রা-রাক্ষস' বা 'বৈকালী'-র ৬নং কবিতার নাট্যগুণান্বিত ব্যঙ্গে, 'প্রেমের গান' কবিতার তির্যক প্রকৃতিবর্ণনায় কিংবা 'বৈকালী'-র ৫নং বা ৮নং কবিতার মতো অনুভূতিপ্রখর প্রকৃতিসম্ভোগের সাবলীল হর্ষে। এই প্রকৃতি যদিও অনেকটাই অনির্দিষ্ট বা নির্বিশেষ, কিন্তু রূপকের ভারমুক্ত এর বর্ণনা কবিকে যেন সহজ হতে অনেকটাই সাহায্য করে। 'যামিনী রায়ের একটি ছবি'-র মতো নান্দনিক অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং 'কোনো বন্ধুর বিবাহে' বা 'কোনো বন্ধুকন্যার জন্মে'-র মতো সামাজিক উপলক্ষের বিষয়নির্বাচন—এ সবই কবিকে ক্রমশ সহজ আত্ম-প্রকাশের দিকে আবার নিয়ে যায়, এই নতুন প্রেক্ষাপটে।

'বৈকালী'-র প্রথম কবিতাটিকে মনে হয় যেন 'জন্মাষ্টমী'-র কাঠামোরই পূর্বাভাস। সাংগীতিক উপমা এখানেও চলে। সামাজিকবোধ খুব তীব্র—একদিকে 'চৌরিঙ্গির উদ্বায়ু ট্র্যাফিকে/পড়ন্ত বাজার', অন্যদিকে 'গ্রাম তো 'হাপর', সেখানে 'হাঁপ ধরে সেই মরা ঝরে পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপে ঝাড়ে'। 'হাপর' 'হাঁপ', 'ভাগাড়' এই শব্দগুলি জীবনের ক্লান্তির দিক প্রকাশ করে। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে ওঠে নতুন জীবনের চেতনা ও আবেগ: 'ক্ষমা কোরো ক্ষমা কোরো তুমি দুর্মর জীবন ভরো গানে।' তখন চাষীর বীজবপনের ছন্দই হয়ে ওঠে তাঁর মনের মুক্তির ছন্দ।

গান আমার ছড়ায় মাঠে ধানের ক্ষেতে বর্ষাজলে
আউষের বীজবপনের উতোল হাতে ছন্দে চলে…
শালি জমির মাটি চষি, একলা ভাবি দলে দলে
বীজবপনের ছন্দ কবে কাস্তে চালার ছন্দে চলে।

তারপর আবার বৈপরীত্যে বর্ণিত হয় বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয়, ষড়যন্ত্র, সদাগর-

গোমস্তার 'স্বার্থের ব্যসন' এবং তবু এ-সবকে পেরিয়ে সম্পূর্ণ নতুন স্বর কবির কণ্ঠে :

তবু চলে বুঝি বীর নয়, শুধু
লাখো কৃষাণ
ধূসর আকাশে ঊর্মির শিরে
ওড়ে নিশান।

শুধু সাধারণ বিহ্বল মানুষই নয় এবার, ইতিহাসের নতুন শক্তি, কৃষক-মজুর, চলে আসে তাঁর কবিতায়—'আঁধার-খনির বুক চাপা তাপ' এবং 'চিমনির ধোঁয়া' থেকে বেরিয়ে আসে শ্রমিক, এবং

বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে
অমর প্রাণ
বীর দলে চলে হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ।

এই 'বীজবপনের ছন্দ', কৃষাণ মজুরের 'শাণিত আকাশে উগ্র নিশান'—এটাই নতুন ব্যাপার 'পূর্বলেখ'-তে, প্রাথমিক গুরুভার কাটিয়ে এ আবহেই আসন পাকা করে নেন কবি।

বিষ্ণু দে-র কবিতার দিক থেকে আরেকটি স্থায়ী সুরের সূত্রপাত এ গ্রন্থের 'সপ্তপদী' কবিতায়। 'সপ্তপদী'তেই প্রথম প্রেম ও সামাজিক চেতনা অদ্বৈত হয়ে গেল। জটিল ও বহু স্তর 'তুমি'-র আবির্ভাব ঘটল। তার সঙ্গে মিলল প্রকৃতি। যদিও প্রকৃতি এখনও অনির্দিষ্ট এবং প্রেম ও সামাজিক চেতনার সমন্বয় ততটা অনায়াস নয়—কিন্তু তবু এখানেই প্রেমের সার্থকতা ও ব্যর্থতা সমাজচেতনার বা সমাজবোধের অন্বয়ে প্রথম একটা ভিন্ন মাত্রা পেল। এরই চূড়ান্ত সিদ্ধি ও বিকাশ দেখেছি তাঁর পরবর্তী কালের কবিতায়।

শালঅরণ্যে ও ঋজু শরীরে
খুঁজে পাই দূর হঠাৎ মিলে।…
পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?…
তোমারই হৃদয়
আকাশের নীড়, নদীর চর।
আত্মদানের সে নীল আকাশে

বিরাট্ শূন্য বাঁধবে কে
তুমি ছাড়া বলো ?…
সুরের মাধুরী ছাপিয়ে নয়ন আর্দ্র,
হৃদয় স্বতই কৈলাস তব চিত্রে।…
তোমাতেই পাই প্রাণসত্তার নীলিমাভাস,
তাই আপন।…
সে অতলনীলে স্তব্ধ স্মিতহাস্য কালের রাখাল
পাহাড়ের নীল চূড়া। সে আকাশ তোমারই আকাশ।

বিষ্ণু দে-র কবিতার সুপরিচিত ও পুনরাবৃত্ত শব্দভাণ্ডার এখানেই যেন প্রথম তৈরি হতে শুরু করে—ঠিক যেমন ঔপনিষদিক 'পূষণ,' 'হিরণ্ময়' ইত্যাদির ব্যবহারের সূত্রপাতও এ-সময়েই।

'সপ্তপদী'-র সাতটি কবিতায় এই সংযোগ ও অদ্বৈততা কিভাবে চরিতার্থ হয়েছে, তার অভিজ্ঞতার ইতিহাস খুবই লক্ষণীয়। প্রথম কবিতায় প্রকৃতির স্বচ্ছ, পুলকতীব্র রূপ নারীর ঋজু শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। দ্বিতীয় কবিতা থেকে 'ঘর-কে বাহির' এবং 'বার-কে ঘর' করেন তিনি প্রেমের অভিজ্ঞতায় ধনী হয়ে। তৃতীয় কবিতায় 'অনাহার আর অনাচারে পচা ভাদ্রে'-ও তিনি শিল্পের দূরত্বে, 'চিত্রশালার স্তম্ভিত সৌন্দর্যে', সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে মুক্তি পান—তার সঙ্গে মেলাতে পারেন 'তুমি'-কে। চতুর্থ কবিতায় প্রেমিকার 'মনের শুভ্র শিখরে' বাসা খোঁজেন—প্রেম এখানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় বন্ধনেরই মুক্তি ও আশ্রয় হয়ে ওঠে। পঞ্চম কবিতায় একটু ভিন্ন সুর। জীবিকার অনিশ্চয়তায় প্রেমের শুদ্ধতাও কিভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, এনে দেয় 'ক্লিষ্ট ব্যবধান', তার কথা। কিন্তু এই 'মুমূর্ষা'-তেও নির্ভরতা যেন আরো পাকা হয়। ষষ্ঠ কবিতায় প্রেম সব বাধা ঠেলে উঠে হয় 'অপরাজিতা', হৃদয় হয় 'প্রেমের গানে উদ্দীপিত গথিক্ ক্যাথিড্রাল'। সপ্তম কবিতায় ঋতু-আবর্তনের উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত বর্ষণশেষের 'সূর্যালোকে স্বচ্ছস্নাত' 'আদিগন্ত ইন্দ্রধনু বিরাট আকাশে' পান প্রেমের মুক্তি। 'সে আকাশ তোমারই আকাশ।' 'নীল' বর্ণ বারবার আসে। 'নীল আকাশে' মুক্তির দ্যোতনা।

যে সমাজমনস্কতা বিষ্ণু দে-কে 'সপ্তপদী'-র মতো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রেমের কবিতা লিখতে প্ররোচিত করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল প্রেমকে সমাজ ও

প্রকৃতির সঙ্গে নতুন অন্বয়ের মাত্রায় চিনে নিতে—সেই সামাজিক বোধেই তিনি মহাভারতের কাহিনীর সূত্র ধরে, ব্যাপ্ত পটভূমিতে, প্রেম সম্পর্কে তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞতার ইতিহাস এবং নতুন সমাজজিজ্ঞাসাকে সার্থকভাবে যুক্ত করতে পেরেছেন 'পদধ্বনি' কবিতায়।

প্রেম সম্পর্কে তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞতায় বর্জন যেমন আছে, তেমনি সঞ্চয়ও তো আছে। উলূপী-উর্বশী-র জগৎ ছেড়ে আসেন তিনি, কিন্তু বহুরূপীর প্রেমের পরিপূর্ণতা যে সুভদ্রায় তারই তো একেকটি লীলা সেই সব প্রাক্তন প্রেম—কবির ভাষায় 'উদ্বৃত্ত লীলা'। কিন্তু পরিপূর্ণ প্রেমের পরিণত ভাষা যখন পেয়ে যান কবি, তখন প্রয়োজন হয় ঐ বাঁকবদলের। অর্জুনের বদলে আসে নতুন নায়ক: 'দস্যুদল'। কারণ অর্জুন আর এই নতুন চেতনার ঐশ্বর্যভারকে গ্রহণ করতে অক্ষম। কবিও তাঁর এতাবৎ লালিত চেতনায় এই নতুনকে গ্রহণ করতে পারেন না—ফ্রয়েডীয় লিবিডোবন্ধন ও লিবিডোমুক্তির জগৎ থেকে য়ুং-এর সমষ্টি-নির্জ্ঞানের জগৎ—ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গ বিচার থেকে সামাজিক চেতনা। অর্জুন সুভদ্রার প্রেমে যে মুক্তি পেয়েছিলেন, দস্যুদলের প্রতিজ্ঞাতেই তো তার উত্তরাধিকার।

'পদধ্বনি' কবিতাটির নামকরণ বা সূচনার তিনটি লাইন বা সমস্ত কবিতাতে মন্ত্রের মতো বারবার উচ্চারিত 'পদধ্বনি'—এ সমস্তই যে কবিতা থেকে নিয়েছেন বিষ্ণু দে—সেই 'পূরবী' গ্রন্থের 'পদধ্বনি' কবিতাতেও, কবিতা দুটির মধ্যকার সমস্ত মৌলিক ব্যবধান সত্ত্বেও, আছে পুরনোকে ছেড়ে নতুনকে গ্রহণ করার উদ্দীপনা। আকস্মিক 'পদধ্বনি'-কে বিস্মিত আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন:

> হোক তাই
> ভয় নাই, ভয় নাই,
> এ খেলা খেলেছি বারংবার
> জীবনে আমার।
> জানি জানি, ভাঙিয়া নতুন করে তোলা;
> ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা···।

এই সামান্য শব্দব্যঞ্জনাটুকুকে গ্রহণ করে, তার সঙ্গে মহাভারতের মৌষল পর্বের কাহিনীর ব্যঞ্জনাকে মিশিয়ে বিষ্ণু দে অর্জুনের প্রেমের ইতিহাস ও পরিণতির

মধ্যে এনে ফেললেন অর্থান্তরের স্পষ্ট আভাস—সমাজরূপান্তরের নবলব্ধ রাজনৈতিক জ্ঞান।

অর্জুন-সুভদ্রার মৌষল পর্বের কাহিনী নানা কবিকে আকৃষ্ট করেছে, এমনকি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ধনতন্ত্রের বা সাম্রাজ্যবাদের সংকট এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ও বিকাশ—এই সমস্ত ঘটনা চিহ্নিত যুগে বিষ্ণু দে তাঁর তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বোধে ঐ পুরাণের মধ্যে যতখানি জটিল অর্থস্তর ঢুকিয়েছেন, তার তুলনা অবশ্য পূর্বাপর প্রয়াসে নেই।

অবশ্য মহাভারতের মূল ঘটনাটিতেই আছে ব্যাখ্যানের বিপুল সম্ভাবনা ও সুযোগ। বিজয়ী পরাক্রান্ত অর্জুনের অক্ষমতা ও পরাজয়, অনার্য দস্যুদের হাতে যাদবনারীদের হরণ ইত্যাদি ঘটনায় বেদব্যাসকেও 'কালপ্রভাবে'র উত্থান-পতন বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হয়েছে। 'কালপ্রভাবে'র এই মহাভারতীয় অর্থকেই প্রসারিত করেছেন বিষ্ণু দে ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মার্কসীয় চেতনায় (তা বলে বিষ্ণু দে-র 'কালের ধারার নিয়ম' নিশ্চয় সমার্থক নয়)। আর সে কারণেই 'পদধ্বনি' হয়ে উঠতে পারে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক সময়মুহূর্তের কাব্যরূপ। পর পর গাঁথা হয়ে যায় ইতিহাসের অনিবার্য স্তরগুলি—ধনতন্ত্রের উজ্জ্বল গৌরবময় উত্থান, বিকাশ ও সংকট, ধনতন্ত্রের মরণদশা—আর তার পাশাপাশি নতুন শক্তির, সর্বহারা শ্রেণীর জাগরণ ও সম্ভাবনা।

অর্জুন, যার জবানিতে এই ইতিহাস বিবৃত, সে এই ধনতন্ত্রেরই প্রসাদপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। একদা তার সুদিন ছিল। ১২ লাইন থেকে স্মৃতির সূত্রে সেই সুদিনের দীর্ঘ রোমন্থন চলে। কবিতার শুরু কিন্তু সংকট কাল থেকেই —অর্জুনের কানে 'পদধ্বনি' এক অর্থে মৃত্যুঘণ্টা—মার্কসের ভাষায় *A spectre is haunting*। কিন্তু মধ্যবিত্ত তো আসলে দ্বিধাদীর্ণ। সে ধনতন্ত্রের প্রসাদপুষ্ট, আবার ধনতন্ত্রের সংকটেই আহত। ধনতন্ত্রের অবসান তার সুখভোগের অবসান, সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মিক সংকটেরও মুক্তি। সে একদিকে সেবাদাস, অন্যদিকে মুক্তিপ্রয়াসী, শ্রেণীবদলের ইচ্ছা বা সম্ভাবনা তার ধমনিতে ('বিভীষণের গান'-এ সেই শ্রেণীবদলের ঘোষণা)।

এই দ্বিধা বা দ্বৈততা অর্জুনের ভূমিকাতেও। 'পদধ্বনি' তার কাছে মৃত্যুর ঘণ্টা, মুক্তির ঘণ্টাও। তাই মৃত্যুসম্ভাবনার নিশ্চিত পদধ্বনিতে ও তার উৎকণ্ঠার মধ্যে মেশে প্রতীক্ষার উন্মুখতা।

মদিরহাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনি।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃতআধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে?

'অমৃতআধার', 'বার্ধক্যবাসর' ইত্যাদি শব্দের আপাত বৈপরীত্যে মধ্যবিত্তের মানস-সংকট রূপ পায়।

সমালোচকরা ঠিকই লক্ষ করেছেন, অর্জুনের মধ্যস্থতায় এই ইতিহাসবর্ণনার মধ্যে ট্র্যাজিক-আয়রনির যে আভাস আছে, তা ঠিক 'চোরাবালি'-যুগের নয়—রাজনৈতিক-সামাজিক পক্ষপাতকে তিনি অতিসারল্যের বিপদ থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন এই নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনায়—অন্যদিকে হয়তো শিল্পগত ন্যায়বিচারও করতে চেয়েছেন—সহানুভূতির ছদ্ম-আবরণে যদিচ ইতিহাসবোধের আরেক পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে নির্মোহ ইতিহাস কোনো অভিজ্ঞতাকেই হারাতে দেয় না।[৮] তা ছাড়া কবিতাটি রচিত হয়েছে ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েত আক্রমণের ঘটনার সময়ে[৯]—ঐ ঘটনার আপাত অসামঞ্জস্যই হয়তো তাঁকে এই ট্র্যাজিক জীবনবোধের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ ও জটিল আশাবাদে পৌঁছতে প্ররোচিত করে থাকতে পারে।

বৈভবের মধ্যেও পরাজয়ের সূচনার ইঙ্গিত অবশ্য প্রথমাবধি—ইতিহাসের খাতিরে তাও জানাতে হয় অর্জুনকে—৯-১১ লাইনে 'সর্পিল উলূপী'-র প্রসঙ্গে বভ্রুবাহনের কাছে অর্জুনের পরাজয়েই সেই ক্ষয়ের সূত্রপাত—সেই ছিদ্রই আজ গহ্বর। কোনো সমালোচক বলেন, 'এ কবিতার বিশিষ্ট প্রসঙ্গার্থে উলূপী অর্জুনের বিরুদ্ধে গুপ্ত বিক্ষোভ, যেন গোপনে সংগঠিত বৈপ্লবিক আয়োজনের সংকেত দিয়ে যায়।'[১০]

তারপর দীর্ঘ অতীতবৈভবের স্মৃতিরোমন্থন। ধনতন্ত্রের গৌরবময় অধ্যায়। এই যুগেই তো ব্যক্তিমানুষের জন্ম ও বিকাশ, মানবিক প্রেমের মর্যাদালাভ, নারীর মুক্তি—চারিদিকে কত উজ্জ্বলতা ও উচ্ছলতা, কত সম্ভাবনা আবেগের মুক্তির ও পদস্খলনের। তার মাঝখানে অর্জুন মধ্যবিত্ত সার্থকতার প্রতিভূ—সে সার্থকতা আসলে যতই মরীচিকা হোক। অর্জুন-সুভদ্রার প্রেম মানবিক পরিপূর্তির প্রতীক হয়ে যায়।

হে ভদ্রা, এ হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায় কানায়

প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনাগঙ্গায়
ঘুরে ফিরে আদিঅন্ত তোমাতে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।

'দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণ', 'সত্তার অঙ্গীকার', 'প্রাণৈশ্বর্যে ধনী বিরাট চৈতন্য'—এই সব পূর্ণগর্ভ আত্মপ্রকাশ এখানেই ঘটল। নদীর উৎস ও মোহানার সঙ্গে প্রেমের সার্থকতার আজীবন অনুসৃত উপমার সূত্রপাতই শুধু এখানে নয়—সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে বহুবল্লভ অর্জুন ('টলোমলো একাধিকবার') ও একনিষ্ঠ সুভদ্রা ('প্রেমের একান্ত দান'), দুয়ের ঐক্যে নব্য মানবিকতার বিচিত্র সম্ভাবনা ও মুক্তির আভাসও স্পষ্ট। তার ঠিক আগেই উর্বশীর প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বিড়ম্বিত'পার্থের যৌবন' এবং 'মুহূর্তের আত্মদানে সঙ্কুচিত এ পার্থিব মানবের মন' —এ সবও তো ঐ মানবিকতারই বিচিত্র আত্মপ্রকাশ। বোঝা যায়, অর্জুনের মধ্যস্থতা কতটা কার্যকর হয়েছে ইতিহাসের এই বাস্তব বর্ণনায়।

সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুনের পলায়নের ঘটনাটি ধনতন্ত্রের গৌরবময় যুগের সিদ্ধির প্রতীক হয়ে ওঠে—যদিও ঠিকই 'পলায়ন' শব্দটির মধ্যে মধ্যবিত্তের স্বার্থপর আত্মরক্ষার চরিত্রটিও আভাসিত। ধনতন্ত্রের সংঘাতময় উজ্জ্বল নাট্যমঞ্চ বর্ণিত হয় 'সেদিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি হুঙ্কার, টঙ্কার' বাক্যের দ্বারা। ধনতন্ত্রের সে এক উৎসবের যুগ। পরাজিত সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্ট 'স্ফীতোদর হলধর'-এর ব্যঙ্গাত্মক ছবিতে স্পষ্ট। কিন্তু এ সবই আজ স্মৃতি—'স্মৃতির বাসর', 'স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী'। কিন্তু 'বার্ধক্যবাসর' তো ব্যঙ্গেরই বিষয়—নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ। তাই 'স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার খোলা', 'নিজস্ব স্মৃতির করাল অতীত', 'পার্থিব স্মৃতি'-র 'ভয়' ইত্যাদি শব্দানুষঙ্গ বেয়ে বেয়ে 'পদধ্বনি' শব্দটি ক্রমশ ঘন ঘন বাজতে থাকে। নানা অর্থে ধুয়োর মতো ফিরে ফিরে আসে।

আর সেই সঙ্গে আসে নতুন চরিত্র, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে—'প্রচণ্ড কিরাত!' এই আবির্ভাবকে প্রায় বন্দিত করে অর্জুন অজস্র বিস্ময়বোধক চিহ্নের সমারোহে।

ছিন্ন ভিন্ন দেওদার বন!···
চোখে জলে প্রচ্ছন্ন অনল! পাশুপত ছল!
আহা! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ! ··
তবু আজ এ কি কলরব! পদধ্বনি! দুরন্ত মিছিল!

'দুরন্ত মিছিল' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক গণসংগ্রামমুখর বাস্তবতা হাজির হয়। আর বৈপরীত্যে অনিবার্য হয় 'বিলাসী যাদবযুবাদল', 'অলস ভোগ', 'ক্লান্তি-ভারে নিদ্রান্ধ বিকল', 'শিথিল প্রহর' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের সাহায্যে ধনতন্ত্রের ক্ষয়, ক্লান্তি ও নীতিহীনতা। একদিকে তীব্র উৎসাহ সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্রুততায় :

কার পদধ্বনি আসে ? কার ?

এ কি এল যুগান্তর ! নব অবতার !

এ যে দস্যুদল !

হে ভদ্রা আমার !

লুব্ধ যাযাবর !

অন্যদিকে দীর্ঘ বাক্যের মন্থরতায় ধনতন্ত্রের বিদায়-অবসাদ :

স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসরবিনোদনে লোটে ;

স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীল জলে বৃথা মাথা কোটে।

'নতুন মানুষে'র স্পষ্টতর চিত্র পরের অংশে। অর্জুনও সুভদ্রাকে 'বীরজননী' বলে সম্বোধন করেছেন বটে, কিন্তু 'রঙ্গিলা'-কে 'প্রিয়া ও জননী' বলে আজ যারা সম্ভাষণ করছেন, তারা বহুবচন এবং 'প্রাণৈশ্বর্যে ধনী' :

চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী…

চায় তারা ফসলের ক্ষেত।

আর এই 'চাওয়া' তো একই সঙ্গে প্রিয়া-জননী এবং ক্ষেত-খনি-স্থিতি-অবসর এই সমগ্রতায় বিধৃত হয়ে যায়।

আর যখন মৌলিক পার্থক্যটা খুব বেশি প্রত্যক্ষ হয়, তখন মধ্যবিত্তের হারানোর বেদনাটাও চাপা থাকে না—তখন শ্রেণীস্বার্থই তাকে উদ্বুদ্ধ করে 'দস্যুদল উদ্ধত বর্বর' এই শব্দচয়নে, যদিও পরক্ষণেই দ্বিধাটা প্রকাশিত হয় 'আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর/দস্যুদল' এই উদ্দীপনায়। ঠিক যেমন 'পদধ্বনি' শব্দটি কবিতার শরীরে আগাগোড়া বিভিন্ন ব্যঞ্জনায়, চকিতে, ধ্রুবপদের মতো উচ্চারিত হতে-হতে শেষ হয় 'মত্ত পদধ্বনি' শব্দে। দ্বন্দ্ব তো মধ্যবিত্তের চেতনাতেই—তাই 'ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ' এই করুণ দ্বন্দ্বময় আর্তিতেই কবিতার শেষ।

'জন্মাষ্টমী' কবিতার শীর্ষে বেঠোফেনের নবম সিমফনিতে ব্যবহৃত একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রতীচ্য সংগীত এবং সর্বোপরি বেঠোফেনের বিষয়ে বিষ্ণু দে-র

অনুরাগ ছিল এ সময়ে সর্বাধিক। বিশেষত নবম সিমফনির বিষয়ে তিনি খুবই দুর্বল।[১১] 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটি নির্মাণের পেছনে এই অনুরাগ খুব কাজ করেছে, বা বলা যায়, নবম সিমফনির অনুপ্রেরণাই কবিতাটিতে বরাবর সক্রিয়। বেঠোফেনে এই শেষ সিমফনি একদিক থেকে অনন্য, কারণ যন্ত্রবাদন আবেগের চূড়ায় পৌঁছে হঠাৎ একক ও সম্মিলিত মানবিক কণ্ঠস্বরে মেশে। শিলারের কবিতাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে বেঠোফেন সুরারোপ করেন:

> O Friends, no more these sounds continue,
>
> Let us raise a song of sympathy, of gladness,
>
> O Joy, let us praise thee।···
>
> O ye millions, I embrace ye!
>
> Here's a joyful kiss for all[১২]

'জন্মাষ্টমী' শীর্ষে ধারণ করে আছে এর প্রথম লাইনটিরই জর্মান মূল। শিলারকে বদলেছেন বেঠোফেন সাংগীতিক কারণে—বেঠোফেনের পদটিকেই অর্থ বৈচিত্র্যে বা অর্থান্তরে ব্যবহার করেন বিষ্ণু দে কবিতাটির একেবারে শেষাংশে: 'হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,/এ সংগীত আমাদের আর নাহি সাজে।' বেঠোফেনের স্বর্গীয় সংগীত কবিকে আবেগের ও উল্লাসের তুঙ্গে পৌঁছে দেয় বটে—কিন্তু কবির এই উপার্জনের পেছনে আছে কলকাতার ছিন্নভিন্ন বাস্তবের তিক্ত অভিজ্ঞতা। আমাদের আবেগ আজ 'নিস্পন্দ', জীবন 'কুৎসিৎ'—সে জীবন ও আবেগে কি আনন্দের 'ভৈরবী মীড'.প্রাসঙ্গিক? তাই নবম সিমফনির 'সাযুজ্য সংগীত' যদি তাঁকে প্রেরণা দিয়ে থাকে কাব্যরচনায়, তবে সে রচনা তো আজ কালানুচিত, নিজেকে তিনি 'কুন্তীরক' বলে এই অপ্রস্তুতির বেদনা প্রকাশ করেন কবিতার শেষ লাইনে।

ফলে এই দীর্ঘ কবিতার কাঠামোটি গড়ে ওঠে কলকাতার অপরিচ্ছন্ন অসুন্দর ভিড়াক্রান্ত বর্তমান এবং তার মধ্যে কবির স্বপ্ন ও আত্মজিজ্ঞাসার সংঘাতে। এবং শেষ পর্যন্ত এই সংঘাতের মুক্তি ঘটে নবম সিমফনির স্মৃতিবাহী আনন্দস্পন্দে—বর্তমানের বৈপরীত্যে সে স্পন্দন 'সাজে' না ঠিকই, কিন্তু প্রার্থনা তো জানাতেই পারেন কবি ('সেই সুর মেগে'···)। স্বভাবতই কলকাতার বিপর্যস্ত বর্তমান এবং বর্তমান ও স্বপ্নের সংঘাতই কবিতার বিষয়। এই সংঘাতের কাব্যরূপ কবিতার কাঠামোয় ইওরোপীয় সিমফনির আদল এনে দেয় —যেহেতু সিমফনিরও প্রাণ সংঘাত। আর এই অনুমান অসংগতও নয়—কারণ

নবম সিমফনির প্রেরণার স্বীকৃতি তো আছেই কবিতার শরীরে—আর এ সময়ে প্রতীচ্য সংগীতের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের কথা বলেছেন অনেকেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়।

১৯৩৬-এর কলকাতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা 'জন্মাষ্টমী-তে। এই বর্ণনায় বাস্তব চেতনা প্রায় kaleidoscopic—দৃশ্য বা ছাঁদ বদলে-বদলে বৈচিত্র্যবিস্তারী।

এলোমেলো বাঁকা পায়ে ট্রামে, বাসে, হয়তো বা কারে
সারে সারে কাতারে কাতারে।
ঘামে আর নিশ্বাসের
কিণ্বস্রাবী উদ্‌গারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়···
মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ ?··
রেখে দাও বৈকালিক পার্কব্যাপী সভা
ব্রিজই ভালো, না হয়তো ফ্লাশ···
ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খসরু বেগ ?··
হরি আমাদের রথস্‌চাইল্‌ড্‌, দেশের মাথা ও
মুখ উজ্জ্বল !
তেজারতি তার ব্যাঙ্কিঙে গিয়ে কি উচ্ছল !
দুটো মিলও চলে—ধর্মঘটের উপায় নেই,
জামাই যে তার নিজে ম্যানেজার,
খাদিপ্রচারের মস্ত লিডার···

এরকম অজস্র উদাহরণ কবিতাতে ছড়ানো। বস্তুত আমাদের অসমাপ্ত বিকৃত জাগরণের কলকাতায় যা কিছু ভাঙা টুক্‌রো—ব্যক্তির দৃশ্যের—তা রূপ পায় কবিতার চরণে—কখনো নাগরিক সংলাপের ভগ্নাংশে, কখনো দৃশ্যের ছিন্ন প্রতিমায়। কখনো কখনো তা আলাদা আলাদা হয়েও জুড়ে থাকে বাক্যগঠনের আলগা ভঙ্গিতে, কখনো বাক্যের আপাত সংহতির ভেতরে চাপা থাকে টেনশন। কলকাতার জীবনের বাস্তবতা রূপ পায় কবিতার শরীরের বাস্তবতায়। সে বাস্তবতা আবার শুধু শব্দব্যবহারের বিচ্ছিন্নতায় নয়, শুধু বাক্যের শিথিল সজ্জায় নয়, এমনকি স্তবক ও কাঠামোর বিন্যাসে বা পরিকল্পনায়।

তাই ইওরোপীয় সংগীতের তুলনা এখানে খুব সংগত মনে হয়। অবশ্য সিমফনি বা সোনাটা অবয়বের মতো এ কবিতাটিকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মুভমেন্টে

ভাগ করা যায় কিনা সন্দেহ। হয়তো তার চেয়ে প্রাসঙ্গিক কোনো আলোচক একদা যে প্রস্তাব করেছিলেন, সেই ইওরোপীয় সংগীতের 'ফ্যুগে'-র সঙ্গে তুলনা।[১৩] ফ্যুগও অবশ্য বাদী-বিবাদী-ক্রমে সাজানো বিরোধমূলক রচনা, অর্থাৎ যা ইওরোপীয় সংগীতেরই বৈশিষ্ট্য—কিন্তু তা অবিচ্ছিন্ন। মুভমেণ্টভাগ যদি-বা হয় তা তাত্ত্বিক এবং সেই-কারণেই পণ্ডিতরা বলেন, ফ্যুগ ঠিক রূপাবয়ব বা ফর্ম নয়, ফ্যুগ আসলে বুনন বা টেক্সচার—কারণ তার অবয়ব এতই স্বাধীন। অবশ্য উক্ত আলোচকই পরে এ-ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে ভোলেননি যে, আসল শক্তি বিষ্ণু দে-র শব্দ ব্যবহারে বা ডিকশনেই, সাংগীতিক গুণটা পরের কথা। অর্থাৎ সাংগীতিক প্রসঙ্গ তুলনাই মাত্র, তার বেশি জোর খাটালে অনর্থ হবে।[১৪]

ইওরোপীয় সংগীতের এই বিরোধমূলক বিন্যাসের আদলে, ছিন্ন প্রতিমায়, স্তবকে-স্তবকে বিষয়বৈচিত্র্যে সজ্জিত আমাদের পরিচিত জগতের ক্ষুদ্রতা, ব্যক্তিত্বের খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা এইভাবে সহজে নাটকীয় তীব্রতায় রূপ পায়। পরিশেষে জন্মাষ্টমীর রাত্রির গর্ভে যেমন জন্ম নেয় শ্রীকৃষ্ণ, কংসের অত্যাচার-অবসানের প্রতিশ্রুতি, তেমনি এই বিশৃঙ্খলা ভেদ করেই আসে নতুন দুঃখজয়ী চেতনা, শোষণমুক্তির প্রার্থনা—জীবনকে ছাপিয়ে আনন্দ ও মৈত্রীর কল্পজগৎ (এর ইঙ্গিতই কি ছিল না এই গ্রন্থের 'চতুর্দশপদী'-১৪ কবিতাটিতে ?)।

এই দীর্ঘ কবিতার দুটি অংশ অন্তত ১৯২৬-এ লেখা—বিষ্ণু দে-র নিজেরই ভাষায়, তাঁর কৈশোরের স্নায়বিক সংকটমুক্তির আত্মপ্রকাশ। তার একটিতে আছে (২৮০-৩২৭ লাইন) 'অসিধারব্রত যাত্রা' ও 'সুপ্তিহীন সংকটের তীব্র আর্তনাদের কথা'—এই যাত্রায় কোনো আশ্বাস নেই, মুক্তি নেই—আছে শুধু এক ক্লান্তি থেকে আরেক ক্লান্তির দেশে যাতায়াত। দ্বিতীয়টিতে (৩৭৪-৩৮৪) পাওয়া গেল 'বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা'। এবার 'স্তব্ধ প্রতীক্ষা'—
—প্রতীক্ষা মানেই নিশ্চিত মুক্তি—'স্থির বিরাট পাথায় ঘনায় আবেগ'। ১৯২৬-এর অংশ দুটি স্থান পেল ১৯৩৬-এর 'জন্মাষ্টমী'-তে। আর তার দু-বছর পরে ১৯৩৮-এ শুনলেন দস্যুদলের 'পদধ্বনি' : যুগান্তরের আভাস। কিন্তু ১৯৩৬-এ 'জন্মাষ্টমী'-তেই শুনেছেন 'পদধ্বনি'—স্তব্ধ প্রতীক্ষার পর নিশ্চিত পদধ্বনি :

যেন শোনে কান পেতে মিটিমিটি কার পদধ্বনি।

তারপর প্রতীক্ষার প্রত্যাশার 'তীব্র প্রহর' – ৩৭৪ থেকে ৪৩১ পর্যন্ত ৫৮-টি লাইনে তার নিস্পন্দ বর্ণনা—সমস্ত প্রতীক্ষাই নাটকীয় অবয়ব পায় এবং শেষ

পর্যন্ত ফেটে পড়ে মুক্তিতে—বেঠোফেনের নবম সিম্ফনির স্মৃতি-অনুষঙ্গে—'আনন্দ নিষ্যন্দন আকাশে'। সমস্ত আকাশ থেকে ঝরে পড়ে আনন্দ – 'সাযুজ্য সংগীত'। এই সংগীতেরই আবির্ভাব – পদধ্বনি – 'জন্মাষ্টমী'-তে। এই সংগীতেরই মূর্ত রূপ 'প্রচণ্ড কিরাত দল'।

এইভাবে 'জন্মাষ্টমী' ও 'পদধ্বনি'-তে যুগান্তরকে আমন্ত্রণ জানান কবি। বাঁকবদলের যুগের প্রতীক হয়ে ওঠে কবিতা দুটি। বিশেষ করে 'জন্মাষ্টমী' আত্ম-সচেতনতার সংকট ও রূপান্তরের চিত্ররূপ। কিন্তু তবু এটাও লক্ষ করবার বিষয় যে, এই রূপান্তরের কাহিনী বলতে গিয়ে কিছুটা আড়াল তিনি নিচ্ছেনই—'পদধ্বনি'-র পৌরাণিক আড়াল এবং 'জন্মাষ্টমী'-তে বিমূর্ত সংগীতের আড়াল। সে কারণেই কি 'পদধ্বনি' বা 'জন্মাষ্টমী'-র মতো কিছু কিছু কবিতা ছাড়া সব কবিতাতেই কবির নতুন উপলব্ধি ততটা উচ্চকিত নয়? বহু কবিতাতেই এই আত্মপ্রসার যতটা মনন-কল্পনার দ্বারা পরিচালিত, ততটা বাস্তব-অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষস্পর্শে যেন জীবন্ত নয় সন্দেহ হয়। তাই কোনো কোনো কবিতায় অন্তত শব্দগত বা বিন্যাসগত একটা সাধুতার কাঠিন্য বা দূরত্ব থাকেই। হয়তো কারণটা এই যে দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে চিন্তার দিক দিয়ে যতটা প্রগতির হাওয়া লেগেছে, কর্মক্ষেত্রে ততটা অনুবর্তন তখনও ঘটেনি—সে-ক্ষেত্র অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ও বন্ধ্যা।

তবু এই পরিবেশের ভেতরেও চিন্তার জগতের এই যে নতুন হাওয়া, তার গভীর তন্নিষ্ঠ ধ্যান এই পর্বের কাব্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে সন্দেহ নেই।

১/৬. পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি লেখক সম্মেলন। [illegible] 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর'।

২. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'প্রবন্ধ'। 'কবিতা', চৈত্র [illegible] ব।

৩. Rimbaud, 'Chanson de la plus Haute Tour,' 'Rimbaud'। Oliver Bernard সম্পাদিত ও অনূদিত।

৪. বিষ্ণু দে, [illegible]। 'সেকাল থেকে একাল'।

৫. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর'।

৭/৮/১০. অশোক সেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। 'সাহিত্যপত্র,' ১০ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৩৬৬ব।

৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পদধ্বনি'। 'কোমলে গান্ধারে বিষ্ণু দে'। রূপা পাবলিকেশন্, ১৩৫৬ ব। পৃ ৭৫।

১১. বিষ্ণু দে, 'The Music I live by'. বেতার-কথিকা। দ্র. প্রথম প্রবন্ধের ১০নং টীকা।

১২. Ralph Hill, 'The Symphony'. Penguin, ১৯৫০। পৃ ১১৩-৭।

১৩. চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্যটি করেছিলেন। '...১৯৩৮ সালে মহা ব্যস্ত যেঁাকে লেখা "জন্মাষ্টমী", তাতে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর গানের বিরাট জ্ঞান নিয়ে লক্ষ করেছিলেন, বেঠোফেনের নবম সিমফনি য়ার "no more discord" এবং "joy" থেকেই আমি মূল ভাবটি পাই, তার চেয়ে বরং আমি রূপগতভাবে বেশি অনুপ্রাণিত বাখ্-এর ফ্যুগে।' ('The Music I live by'), অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

১৪. বর্তমান লেখককে লেখা চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিঠির অংশ বিশেষ: 'বিষ্ণু দে-র প্রকৃত শক্তি তাঁর অনবদ্য diction, সংগীত নয়। তবে তাঁর কবিতা এমন জায়গায় পৌঁছতে পারে যেখানে সংগীতবোধের প্রয়োজন। একটা প্রতীচ্য সংগীতের ফর্ম বিষ্ণু দে বা এলিয়টের কবিতায় আছে বটে, এবং তা থাকার ফলে কী ধরনের একটা নতুন dimension এসেছে সেটাই বিবেচ্য। ফলে একটা aesthetic-এর বিবেচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আপনি যে এক নম্বর উদ্ধৃতি দিয়েছেন: ...হরি আমাদের রথস্‌চাইল্‌ড, দেশের মাথা ও মুখ উজ্জ্বল ই: পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে scherzo-জাতীয় মুভমেণ্টের মিল অবশ্যই আছে।... 'দুটো মিলও চলে' এই phrase-টিও একটি সাংগীতিক inversion। কিন্তু বাস্তবিকই কি এই inversion-টি সংগীত থেকে এসেছে, না diction-এর অমোঘ শক্তির বশবর্তী হয়েই এসেছে। সংগীতের overtone থাকার ফলে এক অনবদ্য কবিতা সম্ভব হয়েছে। আমার মনে হয় আপনি যদি diction থেকে সংগীতের দিকে যান তাহলে aesthetics পুরোপুরি ধরা যাবে।/ভারতীয় সংগীত সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।/ "নিচে, বেশ দশ-বারো হাত নিচু সুরে'—"বেশ দশ-বারো হাত phrase-টি সংগীতের বশবর্তী হলেও আসলে এটাই হল diction। সংগীতের overtone আছে বলেই এক অপূর্ব কাব্য সম্ভব হয়েছে।' (১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬)

'সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ দেশ'

'পূর্বলেখ'-তে, অন্তত 'পূর্বলেখ'-র অনেক কবিতাতেই, কবির কমিটমেণ্টের এই প্রথম পর্যায়ে, যে শব্দগত অসরলতা বা খানিকটা তত্ত্বপ্রাধান্য ছিল, সম্ভবত নতুন সমাজচেতনার দায়িত্বভারেই, তা সরে গিয়ে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সাত ভাই চম্পা'-য় এল সহজ নির্ভার এক প্রকাশভঙ্গি। কারণটা হয়তো শুধু কবি-ব্যক্তিত্বের বিকাশেই নয়, রাজনৈতিক-সামাজিক কর্ম ও চিন্তার পটপরিবর্তনেও নিহিত। 'পূর্বলেখ'-র যুগ পর্যন্ত সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনা যতটা তত্ত্বের

ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত আন্দোলনের অগ্রগতি সত্ত্বেও, ততটা হয়তো সার্বিক আবেগ সৃষ্টি করতে পারে নি—১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটপরিবর্তনের মুহূর্ত থেকে যে আবেগের সঞ্চার হয়েছিল, অন্তত শিল্পী-সাহিত্যিদের মনে, তার তুলনায় তো বটেই। এর জন্য হয়তো সত্যিই প্রয়োজন ছিল এমন কোনো স্বদেশী বা আন্তর্জাতিক ঘটনাসংঘাত যার মধ্য দিয়ে কবির তাত্ত্বিক চেতনা এবং কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণের অন্তরঙ্গতা কবির মনে এনে দেবে নতুন ধরনের উত্তাপ। ২২শে জুন এরকমই একটি ঘটনা।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন যে মুহূর্তে ফ্যাশিস্ট জর্মান বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল, সেই মুহূর্তে সাম্যবাদীর কাছে যুদ্ধের অর্থই গেল পালটে। এ আর শুধু দুটো শক্তির লড়াই নয়—একদিকে 'নবীন সভ্যতা' সোভিয়েত, যা কিছু মানবিক সভ্য সুস্থ তার নতুন প্রাণকেন্দ্র, আর অন্যদিকে ফ্যাশিস্ট শক্তির ভয়াল দন্তুর হাসি। ফলে আবেগগত ভাবে পৃথিবীর সমস্ত সাম্যবাদীরা চিন্তায় ও কর্মে সংঘবদ্ধ হল, যে কোনো ভাবে, যে যার সাধ্য মতো এই ফ্যাশিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত শক্তির বিজয়প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করবে। পরাধীন সুদূর ভারতবর্ষে এই 'সাহায্য' আর কী হতে পারে, জনমতের আবেগ সৃষ্টি ছাড়া!

আবেগকে চারিয়ে দেওয়ার একটা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম তো শিল্পসাহিত্য। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে শিল্পীসাহিত্যিকরা তাই একত্রিত হলেন। বাংলা দেশেও ঐতিহ্যবাহী প্রগতি লেখক সংঘকে চকিতে স্পর্শ করল এই সংগ্রামী প্রেরণা। বাংলা দেশের প্রায় কোনো লেখকশিল্পীই এর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। এই সংঘের অন্যতম সম্পাদক রূপে বিষ্ণু দে-র সক্রিয়তা বোধহয় তাঁর জীবনেরও একটা বড় ব্যতিক্রমী ঘটনা। আজীবন প্রগতিমূলক প্রায় সমস্ত আন্দোলনেরই সহযাত্রী হলেও এরকম প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষ্ণু দে বোধহয় আর কখনো করেন নি।[১]

আবেগের এই প্রেরণাতেই তিনি তাৎক্ষণিক বা কালোপযোগী বা ঘটনাচিহ্নিত ও প্রত্যক্ষ তাগিদের কবিতা লিখেছেন এই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশি। তাঁর কবিতার শব্দনির্বাচনে, বাক্যগঠনে বা স্তবকবিন্যাসে একটা অভূতপূর্ব সরলতা ও প্রত্যক্ষতা এল, কখনো হয়তো কাব্যৈশ্বর্যের দিক থেকে আপাতত কিছুটা ক্ষতিকরভাবেই। 'পূর্বলেখ'-যুগের সর্বভারতীয় বা ক্লাসিকাল পৌরাণিক প্রতিমার সংখ্যা কমে গিয়ে এখানে ক্রমশই ব্যবহৃত হতে থাকল

বাংলার লৌকিক জীবন ও সাহিত্য থেকে উল্লেখ-প্রতিমা-চরিত্র। বোঝা যায়, স্বদেশজিজ্ঞাসার নতুন স্তরে উপনীত হচ্ছেন কবি।

এই পর্যায়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় বলাই বাহুল্য সাম্যবাদীর কাছে প্রথম সাম্যবাদী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিষয়ে—সোভিয়েতের বিপদে উদ্বেগ, বিজয়ে উল্লাস অনুভব করা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সোভিয়েতের প্রতি মমতা-সঞ্চার তো 'পূর্বলেখ'-র বাঁকবদলের যুগ থেকেই আছে। কিন্তু সোভিয়েতের বিপদ এবং জয়পরাজয়ের সঙ্গে একাত্মতাবোধ, ২২শে জুনকে কেন্দ্র করে, কমিট-মেণ্টের নতুন এক পর্যায়ে পৌঁছে দিল কবিকে।

১৯৪১ সালের ঐ দিনটিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাশিস্টদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া মাত্রই যখন 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' সংগঠিত হল, তখন বিষ্ণু দে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একজন প্রধান সহায়ক। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীদের সংগঠনের একটা বড় কাজ ছিল ফ্যাসিবাদের সভ্যতাবিরোধী স্বরূপ উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সভ্যতার পীঠস্থান সোভিয়েতভূমির বন্দনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে নবজাত সোভিয়েত শক্তির দীর্ঘস্থায়ী লড়াই বীরত্বের একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় বলে চিহ্নিত হয়ে আছে ইতিহাসে। এই লড়াইয়ের জয়পরাজয়-স্পন্দিত আলেখ্য বিষ্ণু দে-র বেশ কয়েকটি কবিতার বিষয়। '২২শে জুন' নামে ১৯৪১ সালে, ১৯৪২ সালে এবং ১৯৪৪ সালে, মোট তিনটি কবিতা তিনি রচনা করেন। এই তিনটি কবিতাই যেন 'সাত ভাই চম্পা'-র রাজনৈতিক আবহকে ধরে রাখে সোভিয়েতের সঙ্গে তীব্র সহমর্মিতায়।

'২২শে জুন ১৯৪১' সনেটটি দিয়েই গ্রন্থের শুরু। 'সাত ভাই চম্পা'র কয়েকটি কবিতা নিয়ে '২২শে জুন' নামে যে ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ১৯৪২ সালে, তারও প্রথম কবিতা ওটাই। কবিতার পটভূমি অবশ্য যুদ্ধের ঐ তীব্র মুহূর্তের কলকাতা। যুদ্ধের আতঙ্কে কলকাতার নির্জন রাস্তা, 'অসহায় কলকাতার মধ্যবিত্ত'—'মধ্যবিত্ত ল্যাম্পপোস্ট প্রাণভয়ে ক্ষীণ'। আর ঠিক সে সময়েই দুর্ভিক্ষের হাতছানিতে 'পলাতক উদরের উনুনের ধোঁয়া নেই।' রাজনীতির অর্থ তখন 'শেয়ানে শেয়ানে···কোলাকুলি·· সঙ্গোপনে'। এর মাঝ-খানে মধ্যবিত্তের ক্লীব স্বপ্ন: 'জনগণমনে অধিনায়কের শূন্যস্থান পূর্ণ করো বীর।' বাস্তবের একেকটা স্তর উন্মোচিত হয় উচ্চারণের সারল্যে—তির্যক ভঙ্গি ও গাম্ভীর্য কোথায় যেন অদৃশ্য। শেষে একই ভাবে পরিত্রাণের মতো আসে দুটি

লাইন : 'স্তরে স্তরে অবিরাম প্রাণান্তিক নীল আলো' এবং 'তবু চীন রুশ/দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ।' যুদ্ধের নতুন অর্থ কবিকেও উদ্বুদ্ধ করে এই যুগের শ্রেণীসত্যটিকে প্রকাশ করে তুলতে। তাই লড়াইটা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের মারণাস্ত্রে নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে লড়াই—'জলে স্থলে যুদ্ধ চলে ভারতেরও ভিৎ টলে।'

কবিতাটিতে একটি প্রতিমার পুনরাবৃত্তি খুব নজরে আসে : চন্দ্রালোক বা পূর্ণিমার প্রতিমা।

> স্বচ্ছ চন্দ্রালোক '
>
> পূর্ণিমার ভয়াবহ চন্দ্রালোক '
>
> শত্রুদের পুষ্পকচালক
>
> শুনেছি হদিস্ পায় গৃহস্থ এ পূর্ণিমায়
>
> কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা ঝাড়ে দূর দেশে দেশে।

যুদ্ধের সময় পূর্ণিমার চন্দ্রালোক বাস্তবিকই ভীতিজনক—পূর্ণিমার আলোয় বোমা পড়তে পারে—মধ্যবিত্তের মনকে গ্রাস করে থাকে এর সম্ভাব্য যোগাযোগ। ফলে এই নতুন অভিজ্ঞতায় পূর্ণিমার কাব্য-অনুষঙ্গেরই বদল ঘটে যায় এখানে। কিন্তু কবি তাকে ছাড়িয়েও আবার প্রকাশ করেন অন্য তাৎপর্যে—মানুষের মরিয়া প্রতিরোধের বিশ্ব আলোকিত হয়ে যায় পাঠকের কাছে এই ইঙ্গিতে। 'সাত ভাই চম্পা' কাব্যগ্রন্থে 'পূর্ণিমা' শব্দটি অবশ্য এর পরেও ঘুরে ফিরে এসেছে।

অন্য দুটি '২২শে জুন'—বস্তুত তিনটিই সোভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে উপলক্ষ করে রচিত '২২শে জুন ১৯৪২' এবং '২২শে জুন ১৯৪৭' কবিতা দুটি শুধুমাত্র বার্ষিকী উদ্‌যাপন নয়, বিশ্বযুদ্ধের পর্বে পর্বে সোভিয়েতের বীরত্বের একেকটি আলেখ্য। '২২শে জুন ১৯৪২'-এ জটায়ুর উপমা আবার আসে—'শতাব্দীর উর্ধ্বশ্বাস জটায়ুর পক্ষপাত নীল আকাশে মুখর হল।' '২২শে জুন ১৯৪৪'-এ অনিশ্চয়তার লেশ মাত্র আর নেই—'সভ্যতার শ্রেণীহীন মনুষ্যত্বে'-র কথা তিনি বলেন সেই একই সরল প্রত্যক্ষতায়। '৭ই নভেম্বরে' নামক সনেটটিতেও প্রায় একই ভাষাব্যবহারে, শব্দচয়নে, অন্বয়সারল্যে বা ভঙ্গিমার প্রত্যক্ষতায় তিনি 'শ্রমিকজনের সাগরসঙ্গমে ..উৎসৃজিত রুশ জনগণে'র বন্দনাগান করেন।

সোভিয়েতের ঐ প্রতীক্ষার ও কষ্টার্জিত লড়াইয়ের একটি অসামান্য চিত্র 'খার্কভ' কবিতাটিতে। হিটলারের 'অজেয়' বাহিনীকে পরাজিত করার যে কৃতিত্ব সোভিয়েত বাহিনী ও জনগণ দেখিয়েছে, ইয়ুক্রেনের লড়াই তার একটা বড়

ব্যতিক্রম। থার্কভ ইয়ুক্রেনেরই শহর, গুরুত্বপূর্ণ শহর—একবার ১৯৪১-এ, আরেকবার ১৯৪২-এ,এই অঞ্চলটিতে দু-বার পরাজয় বরণ করতে হয় সোভিয়েতের—একবার থার্কভ বিজিত হয়, আরেকবার থার্কভ উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিশেষত দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে সোভিয়েত জেনারেল থার্কভ সম্পর্কে ব্যবহার করেন এই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত শব্দকটি : 'থার্কভে গুরুতর পরিস্থিতি'—*Grave situation at Karkov*।[৩] এই *grave situation*-এর উৎকণ্ঠাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কবিতাটিতে।

কবিতার শুরুতেই আছে পরাজয়ের বিষণ্ন নিস্তব্ধতা :

শয়ান রয়েছি স্থির
শুভ্র স্তব্ধ কাফুনের মাঝে।
আমার নিশ্বাস ধীর
শুধু কি আমারই কানে বাজে ?

কিন্তু প্রশ্নের ধাক্কায়-ধাক্কায় অনিবার্যভাবে এসে যায় কাবতার শেষাংশে প্রত্যয়ের ও আশ্বাসের জগৎ।

প্রাণের সমুদ্র থেকে ভাসে
প্রথম রাতের লাল তারা।
জীবনের চরম বিশ্বাসে
সম্পূর্ণ আমারই নিশ্বাসে।

কবিতাটির প্রতিটি বাক্যগঠনে, শব্দ ও ছন্দের ব্যবহারে আছে ধীর অকপট সরল উচ্চারণ—অথচ তারই মধ্যে বাস্তবতার কঠিন গুরুত্ব বিষয়ে তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও অবিচল প্রতীক্ষা। থার্কভ-এর উদাহরণ থেকে কবি তাঁর নিজেরই নিশ্বাসে জীবনের চরম বিশ্বাসকে যে খুঁজে পাচ্ছেন, তা আর কেবল কথার কথা হয়ে থাকছে না।

কখনো কি শেষ হয় বাঁচা
স্বচ্ছ স্রোতে সবুজ ছায়ায় ?
সাঁকো আর ভাঙে নাকো বাহু,
গড়ে নাকো ত্বরিতে পণ্টুন ?

কবির কণ্ঠে এই সব প্রশ্ন এত আন্তরিকতায় বাজে যে, শুধুমাত্র তাৎকালিক কোনো আন্তর্জাতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেও এভাবে স্বদেশের, স্বকালের বা

আত্মগত ভাবনাকে যে প্রকাশ করা যায় কবিত্বের তীব্রতায়, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে 'থার্ডক্লাস' কবিতার প্রতিটি লাইন।

যে সময়ে সোভিয়েতের বীরত্বের এই কবিতাগুলি পাই, ঠিক সেই সময়ই তিনি লিখে চলেছেন তাঁর স্বদেশী বা স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলি। স্বদেশী কবিতা বলতে যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবির ধরন বোঝা যায়, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই এর ব্যবধান দুস্তর—কিন্তু কোনো কোনো কবিতায়, অন্তত 'এ জনতার' এবং 'সাত ভাই চম্পা' এই দুটি কবিতায় সত্যেন্দ্রদত্তীয় অনুষঙ্গ একবার চকিতে উঁকি মেরেও যে যায়, তাও সত্যি। কিন্তু ঐটুকুই। স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার, সে জোয়ারে সংগঠিত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের নতুন সংগ্রামী চেতনা : সব মিলিয়ে স্বাদেশিকতার যে বহুস্তর সংজ্ঞা তৈরি হয়, তা নিশ্চয়ই পূর্বসূরিদের কবিতায় সম্ভব ছিল না।

জনতার মুক্তির সম্ভাবনায় মুখর কবি 'এ জনতার' কবিতার স্পন্দিত ছন্দের দোলায় বাহ্যত কিন্তু সাবেকি ঢঙটাই এনে দেন :

কতবার এল কত না দস্যু। কত না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কত গ্রাম উজাড়
কত বুলবুলি খেল কত ধান,
কত মা গাইল বর্গির গান,
তবু বেঁচে থাক অমর প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার।

ইতিহাসচেতনার আশ্রয়ই শুধু নেন নি কবি, কিছুটা অনির্দিষ্টতার প্রশ্রয়ে তিনি জনতার নানা শত্রুর—নানা স্তরের দস্যুর কথা বলেন। পরাধীন দেশের বেদনা, শ্রেণীবিভেদের ও শ্রেণীশোষণের যন্ত্রণা সব এক হয়ে যায়। আর শেষ লাইনে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তৈরি করেন 'চেতনাখর কুঠার' শব্দযুগ্মটি।

কিন্তু এই ধাঁচের কবিতার—স্বদেশী কবিতার ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে ভাষার আবেগসারল্যে বহুস্তর যন্ত্রণাকে প্রকাশ করা যার লক্ষ্য—তার সার্থকতর নিদর্শন বোধহয় 'সাত ভাই চম্পা'।

এই কবিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে বাংলা দেশের ইতিহাস, ভূগোল

এবং মধ্যযুগীয় কাব্য রূপকথার জগতের তথ্য-কাহিনী-চরিত্র দিয়ে। দীপঙ্কর বা চীন-মঙ্গোলিয়া-শ্যাম-কম্বোজ-বলী-যবদ্বীপ ইত্যাদির উল্লেখ সত্যেন্দ্রনাথের বহুপঠিত কবিতার স্মৃতিই শুধু জাগরিত করে না, কবি বোধহয় তাঁরই মতো ভিন্নার্থে হলেও বাংলার ঐতিহ্য বিষয়ে গর্বও জাগাতে চান পাঠকের মনে। কিন্তু কবি যখন বলেন :

> তোমাকে খুঁজেছে জানো কি কৃষকে নৃপে
> অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
> হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে· ইত্যাদি

তখন বুঝতে পারা যায় স্বদেশমূর্তির এক বৃহত্তর রূপ তাঁর চোখের সামনে।

তবে কবিতাটিতে সবচেয়ে বেশি ছড়ানো আছে মঙ্গলকাব্য-রূপকথা-লোককথার অনুষঙ্গ। চম্পার সাত ভাই ও বোন পারুল তো আছেই, তা ছাড়া আছে নীলকমল ও কাঞ্চনমালা। মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল থেকে চাঁদসদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন সীমারেখা পার হয়ে একটি ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে, মিলেমিশে গেছে। সাত ভাই চম্পা-র চিরচেনা রূপকথাটিও কিছুটা বাঁকাভাবে ব্যবহার করছেন কবি। বারবার চম্পাকে আহ্বান করে প্রতীক্ষা ও কামনার প্রকাশ ঘটেছে যেমন, তেমনি 'পারুল মায়া' বা 'পারুলরাঙানো রাজকুমার' শব্দচয়নে চম্পা ও পারুলের সম্পূরণের ইঙ্গিতও এসেছে—'বিরাট বাংলা দেশের' ছেলের। যে কারণে চম্পাকে ডাকছে, তা তো পারুলেরই জন্য, কারণ চম্পার সত্তার পূর্ণতা তো পারুলেই। পারুলেরই ডাকে যে সাড়া দেয়, সেই তো সাড়া দেবে দেশব্যাপী মানুষের ডাকে। সাত ভাই তো শুধু চম্পারাই নয়, সাত ভাই সারা দেশ। সাত ভাই জাগাবে চম্পাকে, যে চম্পার মধ্যে আছে জাগার এবং জাগানোর ক্ষমতা, 'পারুল-মায়া' তো সেটাই। আবার চম্পাকে জাগাতে পারে পারুল—আজ সেই 'পারুল মায়া'র-ই লোভে নীলকমল-শ্রীমন্ত সদাগরেরা, 'বিরাট বাংলা দেশের কত না ছেলে', কৃষক-মজুর, সকলেই উন্মুখ, অন্বেষারত—কারণ, এই 'পারুল মায়া' অর্জন করতে পারলেই, 'পারুল-রাঙানো রাজকুমারে'রা সমস্ত যন্ত্রণা সয়ে, নদীসমুদ্র পার হয়ে জাগাতে পারবে চম্পাকে, ঘোচাতে পারবে তার 'ছদ্মবেশ'। চম্পা আমাদের মধ্যেই আছে—আমাদের মধ্যেই মুক্তির সম্ভাবনা ও উচ্চাশা—কিন্তু সত্যের মুখ, চম্পার মুখ, ঢাকা পড়ে আছে। শেষ দু-লাইনে

রূপকথার ইচ্ছাপূরণেই সেই মুক্তি ঘটে যায়, কবির মনে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার তীব্রতায় :

মুক্তি ! মুক্তি ! চিনি সে তীব্র সুখ,
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ।

এখানেও বলা বাহুল্য পরাধীন দেশের স্বাধীনতাকামনা ও সাম্যবাদীর শোষণমুক্তির কামনা এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। কবির চতুর্দিকে যে সংকট ও দুঃখ চলেছে, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ উঠছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তুঙ্গ চেহারা থেকে শুরু করে শ্রমিক-কৃষকের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন পর্যন্ত, কবির নিজের মনেও, সেই দুঃখের ও প্রতিবাদের আবেগই যেন শিশুর শুদ্ধ সারল্যে, রূপকথার জগতের নিশ্চয়তায় পুনর্গঠিত হয়ে যায়। সাত ভাইয়ের মতো বাংলা দেশের কর্মী মানুষেরাও তো অন্তরালে প্রতীক্ষারত, জেগে উঠবে 'পারুল-মায়া'য়, চম্পার মতো—বন্দিনী মাতার মুক্তি ঘটাবে। সেই যুদ্ধকালীন সময়ে সাম্যবাদী কর্মীরাও যে আত্মত্যাগ করে চলেছিল, সেই গৌরব কবিকে স্পর্শ করে। এসে পড়ে যুগে যুগে বাংলা দেশের কর্মী ও বীরদের দীর্ঘ ইতিহাস, বাঙালির আত্মপ্রসারের গাথা, বাঙালির জনবিন্যাস। রূপকথা, ছড়া কিংবা লোকসংগীতের অনুষঙ্গ বাঙালির একেবারে শৈশবস্মৃতি ধরে টান দেয়।

স্বদেশী কবিতার এই মুগ্ধ সারল্য বা অন্তরঙ্গ আবেগের সঙ্গে সমকালীন রাজনীতির—বিশেষত ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধের এই সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে বিষ্ণু দে-র এ-সময়ে চোখ পড়েছিল সমধর্মী কোনো কোনো বিদেশী কবির কবিতার দিকে। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফরাসী কবি পল এলুয়ার, 'প্রেম ও মানবিকতা বা সাম্যবাদ' যার কাব্যে নেয় 'অভিন্ন রূপ'। 'পল এলুয়ারের অনুসরণে' কবিতা লেখেন বিষ্ণু দে—বন্ধু লুই আরাগঁ-র মতোই এলুয়ারও তো 'নিজের আবেগ থেকেই সোজা লিখেছেন, যে লেখার ভিতে আছে তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর রাজনীতি, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণার দীর্ঘ ও জটিল সাধনা।'[৪] এলুয়ার-আরাগঁ-র এই 'স্বদেশসংক্রান্ত অর্থাৎ কর্মজগৎ সংলগ্ন কাব্যে'-ই আত্মীয়তা অনুভব করেন বিষ্ণু দে।

'পূর্বলেখ' পর্যন্ত, বস্তুত 'পূর্বলেখ'-তেই পেয়েছি এলিঅট, লরেন্স, পল মোরাঁ বা হাইনের কবিতার অনুবাদ। 'সাত ভাই চম্পা' গ্রন্থে প্রকাশিত হল

ল্যাংস্টন হিউজ. সিমোনফ, আরাগঁ. এলুয়ার, লোরকা, 'ব্রেখট-এর অনুসরণে' কবিতা। বোঝা যায়, রুচি ও প্রেরণার ভিন্ন জগতকে গ্রহণ করেছেন কবি।

শুধু পশ্চিমী ইওরোপের কবিতাই নয়, এ সময়ের একটি বিখ্যাত অনুবাদ রুশ কবি নিকোলাই টিকোনভের '১৯২২ নামক কবিতা' অবলম্বনে 'প্রতিরোধ'। তাঁর মনে হয়েছিল '১৯২২-এর তুল্য আমাদের ১৯৪২।'[৫] এই তুল্যতার বোধেই তিনি এই 'অনুবাদ/অবলম্বন' কবিতার শেষ স্তবকে লেখেন :

> অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,
> ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,
> তবু জানি এই দধীচির হাডে এই ভাঙা হাতিয়ারে
> ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য।

একদিকে দুঃখ – দেশের সংকটকালের দুঃখের সঙ্গে নিজের দুঃখকে অন্বিত করা – অন্য দিকে ইতিহাসের বীরত্বে প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিবাদী প্রতিরোধের বীরত্ব : এইভাবে জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে নিজের চৈতন্যকে মেলানোর এই যে দায় বিশ্বব্যাপী প্রগতিমনা কবিদের, তার সঙ্গে অনুবাদ-অবলম্বনের মাধ্যমে নিজেকে যুক্ত করলেন বিষ্ণু দে। প্রতিরোধের যে 'প্রবল প্রাণের বন্যা আরাগঁ ও এলুয়ার প্রভৃতির কবিতায় ফরাসীকাব্যের বাঁধা আবেগে মুক্তি এনে দিলে' – সেই প্রাণের বন্যার ছোঁয়া লাগল বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও।

এই প্রতিরোধের দিনগুলিতেই 'মিতালির বন'-এর 'সবুজ নির্ঝর'-এর গান ছিন্ন করে দিয়ে এলুয়ার উচ্চারণ করেছিলেন : 'গারথিয়া লোরকা-কে তারা চড়িয়েছে শূলে।' 'ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকার ছায়ায়' কবিতাটিতে সেই লোরকার স্মৃতি – তাঁর কাব্যজীবনের বীরত্ব উদ্ঘাটিত হয় লোরকারই আত্মনিবেদিত কণ্ঠস্বরে, 'সমসমাজের কঠিন কোমল শিরস্ত্রাণ' শিরে পরিধান করে 'স্বাভাবিক শয্যায়' মৃত্যুকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এই সমস্ত কবিলেখকদের রচনার প্রেরণাই শুধু নয়, তাঁদের জীবন ও চারিত্রও মনে রাখেন বিষ্ণু দে – একাধিক গদ্যরচনায় তাঁদের কর্মময় জীবনের বীরত্বের কথা বলেনও। 'পল এলুয়ারের অনুসরণে' কবিতাটি যেন এই মৃত্যুজয়ী কর্মীদের আত্মদানেরই কাব্যরূপ :

> স্বাধীনতা ছাড়া কেই বা বাঁচতে চায়!
> স্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতা ধরি পায়ে
> হে প্রেয়সী কবে করবে আত্মদান ?

জীবনে মরণে লিখেছি তোমার নাম
স্বাধীনতা প্রিয়া স্বাধীনতা লিখলাম
হৃদয়ে বাহুতে বুদ্ধিতে একতায়।

আত্মদানে প্রস্তুত সংগ্রামী চারিত্রের পর পর কয়েকটি উজ্জ্বল আলেখ্য পাই 'জঙ্গী', 'কর্মী' বা 'এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতি-কে' কবিতাতে। তিনটিই ছোট কবিতা—প্রথম এবং তৃতীয়টি সনেট, দ্বিতীয়টি আট লাইনে আরো ছোট। মাত্র দু-একটি আঁচড়েই বিষ্ণু দে ঐ স্নিগ্ধ পরিচিতিকে স্পষ্ট করেছেন। 'জঙ্গী' কবিতায় প্রায় সুরেলা উচ্ছ্বাসে স্বার্থহীন মানুষটির অন্তরঙ্গতায় কবি ধনী হয়ে ওঠেন :

তাই বলি হেসে, তোমার প্রয়াণে
যৌবনবেদনাভরে উচ্ছল তোমার দিনগুলি
রেখে যাবে জীবনের আনন্দের উচ্ছিষ্ট আবেশ
আমার প্রাণের পাত্রে।

'এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতি-কে' কবিতাটির বন্দনা অনেক সংযত—এখানেও 'বিরাট জনতার আন্দোলনে' যার 'চারিত্র' উদ্ভাসিত, তাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি মিতবাক্ স্পষ্টতায় বলেন :

তোমার গৌরব জেনো আজো অনেকের,
দায়িত্ব অশ্বত্থ যেন আকাশ-প্রসারী,
দিনে রাতে অঙ্গে নিজে ওঠে তার ঘের।

তবে এই ধাঁচের কবিতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটি সার্থক—সেই 'কর্মী' কবিতায় বাস্তব একটি চরিত্রালেখ্যকে আবেগের যে শুদ্ধ অখণ্ডতায় রূপান্তরিত করেছেন, তার আবেদন বিষয়কে ছাড়িয়ে।

বাধাবিপত্তি অনেক, তবুও মুহ্যমান
বারেকও নয় সে, প্রবল ঢেউয়ের লবণাঘাত
অবিরাম চলে, অসীম ধৈর্যে বেঁধেছে গান
জোয়ারে ভাটায় রৌদ্রে রাত্রে হানে দু হাত
পাহাড়ে পাথরে, বালির চড়ায়, সাগরজল
অতি প্রত্যয়ে হঠাৎ হতাশে নয় বিকল,
আশ্বিন-মেঘে ভাসে ভাদ্রের বৃষ্টিজল
চেতনার নীলে গত-আগামীর গভীর গান।

মহাযুদ্ধের অস্থির পরিবেশে দেশের অসীম দুর্গতির মধ্যে এইভাবে পর পর কয়েকটি সুস্থ সংগ্রামী মানুষের ছবি এঁকে যান তিনি। 'ভারতীয় বিমান-বাহিনী' কবিতায় সেই সব আদর্শবাদী অনাহত মানুষেরা যেন প্রতীকী রূপ লাভ করে তরুণ বৈমানিকের আলেখ্যে। 'কৈশোরের ঘোর এখনো ছড়ানো চোখে যার' সেই 'কিশোর কুমার' ঠগ আর বণিকের স্বার্থপরতার স্পর্শ এড়িয়ে প্রাণের উল্লাসে আকাশবিহার করে—'সত্তার সুনীলে তার মুক্ত আনাগোনা'—'জীবনের স্বপ্নলোকে অবিশ্রাম আনাগোনা তার।' সে এখনো জীবনের ক্রূরতার দিক দেখে নি—এখনো স্বপ্ন এবং উজ্জ্বল প্রতীক্ষা তার চোখে। এইভাবে বৈমানিকের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অনুষঙ্গকে জীবনচেতনার উচ্চকিত ভাষায় ব্যবহার করে কবি প্রতীকের শুদ্ধতায় পৌঁছে যান :

> প্রাণের উল্লাসে
> তাই তো সে ভাসে অখণ্ড আকাশে।
> মেঘ হতে মেঘান্তরে উন্মুখর যাত্রা তার .
> সূর্য জানে মাত্রা তার, সূর্য হানে গায়ে তার
> উল্লসিত লাবণ্যের ভয়শূন্য সোনা।···
> ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে
> নূতন চেতনাচৈত্য রচনা করে কি, দুই হাতে,
> বিপ্লবী পাখাতে, সোনালি ঈগলে তার·· ।

কবির কাছে এই 'স্বপ্নাততিতে জড়ানো চেতনার শুদ্ধ বিস্তার' যেমন প্রত্যক্ষতায় সত্য, তেমনি সমকালীন জীবনের নেতির দিকটিও আসে, ঘুরে-ফিরেই আসে। তিনি একদিকে যেমন এইভাবে দেখেন হৃদয়-বাহু-বুদ্ধির 'একতা', তেমনি পাশাপাশি দেখা পান 'টিকেটহীন সহযাত্রী'-র, যাদের হৃদয়ে 'অনাবৃষ্টি' এবং 'বুদ্ধির অকালে অসমঞ্জ বৃদ্ধি'। 'কিশোর বীর'-এর পাশে পাশেই তো ঘোরে 'রুগ্ন অস্থির যৌবন'। 'তোমাদের সনেট' কবিতাতেও সেই সব পূর্বচেনা মানুষদের কথা বলেন, যারা 'পিচ্ছিল বুদ্ধিতে পটু'। শুধু 'উন্নাসিক' মানুষদের নয়, পলাতক ভীরু মানুষকেও ঠিক 'চোরাবালি'-যুগের উভবলী ব্যঙ্গেই যেন আক্রমণ করেন :

> নিরাপত্তা খুঁজে বেড়াই, প্রিয়ে,
> স্বাধীনতা যে চাই না, তাও নয়,

কিন্তু সেটা হোক কিছু না দিয়ে ;
বড় সাহেব পাক না আরো ভয় !

('এ ভরা বাদরে স্বদেশী প্রেম')

জনরক্ষার জনতায় নামো, জীবন-মরণ
প্রশ্ন যেখানে, সেখানে না হয় সময়হরণ
করবে বলেই নেমে এসো দেখি, তোমরা সবাই
হাত মেলাও তো বাজারের ভিড়ে, সমালোচনায়
যোগ দেব তবে, চাল পাবে দেখো জনায় জনায় · ('চা')

এ ছাড়াও '১৯৪২' বা 'বুড়ো ভোলানো ছড়া' বা 'ইস্কুল' জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক ছড়ায় ঔপনিবেশিক দেশের খবকায় মধ্যবিত্তের অসংবদ্ধ আচরণও তাঁর সমানই ঠাট্টার বিষয়।

অবশ্য বুদ্ধিসর্বস্ব জগতকে যে তিনি আক্রমণ করেন, তার পেছনে সম্ভবত কাজ করে যে জগতকে তিনি ত্যাগ করে এসেছেন, সেই জগতকে পরিপূর্ণ বর্জন এবং তার পরিণতিদর্শনে আত্মবিশ্বাসের প্রসার—সঙ্গে সঙ্গে নবলব্ধ প্রত্যয়ের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে শিকড়কে শক্ত করে তোলা। 'I am Cinna the poet, Cinna the poet' কবিতাটিতে স্পষ্ট করেই মননসর্বস্বতাকে সমালোচনা করা হয়েছে :

আল্‌গা মাটির হাল্‌কা হাওয়ায় কেটেছে অনেক কাল
মানসলোকের বাসিন্দা যত তনুহীন গম্বুজে।

আজ শুদ্ধশিল্পের সেই 'মরাল দীঘির পদ্মকাননে' মত্ত হস্তী ঢুকে সব তছনছ করে দিচ্ছে। বাস্তব বড় রূঢ়, কালানৌচিত্যে শিল্পবাদীদের আসর পরিত্যক্ত। 'আলগা মাটি'-র বদলে মৃত্তিকার শিকড় সন্ধান এ যুগেরই অন্বিষ্ট। বুদ্ধিসর্বস্ব শিল্পসর্বস্ব চেতনাকে ব্যঙ্গ করে তাই কবি গ্রহণ করতে চান নতুন যুগের কর্মময় শিল্পচৈতন্য।

ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য, আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল।

এ-সময়ে কবির মনোজগতের বাস্তবতাও খুব একটা দুর্বোধ্য নয়। 'পূর্বলেখ' তো ছিল সংক্রান্তির কাব্য—অর্থাৎ এক জগৎ থেকে পা উঠিয়ে আরেক জগতে পা নামাচ্ছেন কবি। স্বভাবতই যে জগৎ ছেড়ে আসছেন, সে জগৎ বিষয়ে তাঁর তীব্র ব্যঙ্গ, তীক্ষ্ণ সমালোচনা। আর যে জগতে পৌঁছতে চাইছেন তার

বিষয়ে অঙ্গীকার ও তত্ত্বসচেতনতা। 'সাত ভাই চম্পা'-তে সেই রূপান্তর সম্পূর্ণ। কিন্তু তবু সব তো ভোলা যায় না। যে জগৎ ছেড়ে এসেছেন তা বর্জনীয়, কিন্তু সেটাই তো তাঁর পরিচিত জগৎ। বারবার তাই সে জগতের জীর্ণতাকে উল্লেখ করে তিনি আত্মবিশ্বাসকে গাঢ় করতে চাইছেন এখনও। কিংবা সেই পরিচিত জগৎ থেকে এবার উপেক্ষা ও পাল্টা সমালোচনা পাচ্ছেন বলেই হয়তো তাঁর এবারের তৎপরতা।

আর যে জগতে তিনি প্রবেশ করতে চলেছেন সে বিষয়ে অনিশ্চয়তার কথা তো 'পূর্বলেখ'-র একটি কবিতাতে আগেই প্রকাশ করেছিলেন। এখন সেটা মাঝে মাঝে সংশয়ের আবর্তও হয়তো তৈরি করে। নির্জনতায় আত্ম-সমীক্ষা করে নেন কবি। কিংবা হয়তো আত্মজিজ্ঞাসাই জাগে। কিন্তু এ-সবই সহজ আশাকে এড়িয়ে 'কঠিন আশায়' পৌঁছনোর সাধনা।

'সাত ভাই চম্পা'-র রচনাকাল শুরু হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী চেতনা এবং তার সঙ্গে স্বদেশী অভিজ্ঞতাকে সংলগ্ন করার সাধনার মধ্য দিয়ে, আর সেই কাল শেষ হল ১৯৪৪-এ পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে বাংলার শিল্পীসাহিত্যিকদের নতুন আত্মপ্রকাশের আবহে। ১৯৪৩-এই ঐ ফ্যাসি বিরোধী চৈতন্য যখন তীব্র তখনই ঘটল বাংলা দেশে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ। আর ঐ বছরই বোম্বাইতে আহূত সর্বভারতীয় সম্মেলনে একত্রিত হলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'জর্জ বিশ্বাসের গান, শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি ও অভিনয়, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নাট্যোদ্দীপনা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এবং অচিরে তারই অনুজ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যসৃষ্টি—সেদিনের কম্যুনিস্ট জীবনে মস্ত একটা জায়গা নিয়েছিল, কোন্ এক ঐতিহাসিক ইন্দ্রজালে রাজনীতি আর সংস্কৃতির একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কও দেখা গিয়েছিল। ...জানি না কখনো কোথাও কোনো রাজনৈতিক দলের মহাসম্মেলনকে উপলক্ষ করে ৪৩-সালের বোম্বাইয়ের সঙ্গে তুলনীয় কিছু অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা।'[৮] ফ্যাসিবিরোধী ঐতিহ্য থেকেই বেরিয়ে এল গণনাট্য সংঘ এবং তার নতুন নন্দনচেতনা।

এই অভিজ্ঞতা এবং বাংলা দেশের ক্ষেত্রে প্রখরতর বাস্তব পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলা দেশের শিল্পীসাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করল এই নতুন সচেতনতায় ও সংগ্রামে। এ-সময়ের খুব পরিচিত ছবি ছিল কঙ্কালসার মানুষের মিছিল :

শহরের লঙ্গরখানায় সেই সব ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়, ফুটপাতে বা ডাস্টবিনের পাশে শুয়ে-থাকা দুর্বল ভিখিরি, চালের জন্য কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইন। এই দুঃসহ বাস্তবতা ভীষণভাবে স্পর্শ করেছিল বহু শিল্পীসাহিত্যিককে। তারা তো জানতেন, পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসনের সঙ্গে এই দুর্ভিক্ষের যোগ কোথায়, কালোবাজারী চক্রান্তে কিভাবে তৈরি হয় শ্রমিক-কৃষকের সর্বনাশ।

১৯৪৪-এ দুর্ভিক্ষের এই অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেই রচিত হয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের 'নবান্ন' (প্রথম অভিনয়: ১৯৪৪), জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র 'নবজীবনের গান' (গান রচিত হয় ১৯৪৬-এ, স্বরলিপি-প্রকাশ ১৯৪৫)। বিনয় রায় ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান। জয়নুল আবেদিন, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়ের ছবি। সুনীল জানা ও শম্ভু সাহা-র বাস্তবধৃত আলোকাচিত্র। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ননী ভৌমিক পর্যন্ত অনেকের ক্ষুরধার গল্প। আর কবিরা তো ছিলেনই। সেই সব কবির ও কবিতার নিদর্শন পাওয়া যাবে ১৯৪৪ সালের 'আকাল' কাব্যসংকলনে, যেখানে সম্পাদক সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন: '[তেরোশো পঞ্চাশের] সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রামছাড়ার ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস। তাই যাঁরা প্রকৃত কবির মতো স্বদেশবৎসলের মতো পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের বিভ্রান্ত জনমনকে দিলেন সান্ত্বনা, অন্ধকারে বসে গাইলেন সূর্যোদয়ের গান, তাঁরা আমাদের অভিনন্দনীয়।'[৯] ঐ সংকলনেরই একটি কবিতা বিষ্ণু দে-র 'চালের কাতারে'। 'অরণি'তে ১৩৫০-এর শ্রাবণে বেরিয়েছিল। পরে সে কবিতাই '১৯৪৩ অকাল বর্ষা' নামে 'সাত ভাই চম্পা'-তে স্থান পায়।

এই দুর্ভিক্ষের নিদারুণ অভিজ্ঞতা 'সাত ভাই চম্পা'-র ভুবন ছেয়ে আছে আর দুটি কবিতায়—'১৯৪৩ অকাল বর্ষা' এবং 'এক পৌষের শীত' কবিতায় ঐ ঘরছাড়া বুভুক্ষু মানুষের অসহায় চিত্র, বর্ষা ও শীতের প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার আবহে মানুষ-সৃষ্ট বিপর্যয়ের কাহিনী।

'এক পৌষের শীতে' কবিতাটিতে প্রায় নাটকীয় বিন্যাসেই তিনি তুলে ধরেন অতীতের স্বচ্ছলতা, বর্তমানের বিপর্যয়, কলকাতার পথে পথে হাঁটা, শহরের মরীচিকার সন্ধান ছেড়ে গ্রামে ফেরা, গ্রামে ফিরে নিজের 'প্রাণের ঘাঁটি'তেই প্রতিরোধ গড়া—এইভাবে প্রত্যেক স্তবকে স্তবকে অভিজ্ঞতার

দৃশ্যান্তর। দশটি স্তবকে রচিত এই কবিতাটি একটি সামাজিক নাট্য বা গীতি-নাট্যেরই তুল্য, যা আমরা পেয়েছি 'নবান্ন' বা 'নবজীবনের গান'-এ।

প্রথম স্তবকের মাত্র চারটি লাইনে গ্রামীণ জীবনের প্রাক-দুর্ভিক্ষ সুখ-শান্তি-নিশ্চিন্ততার রূপরেখা। দ্বিতীয় স্তবক থেকে শুরু হয় তার জীবন-নাট্যের সাম্প্রতিকতম সংকট। গ্রামের মানুষের গ্রামছাড়ার ট্র্যাজেডিকে তিনি মাত্র দুটি লাইনের আলগা সহজ ভঙ্গিতে বলে দিয়ে বেদনাকে আরো তীব্র করেন যেন :

তবুও কোন্ মরিয়া পথ ভুলে
এসেছি সব কলকাতার পথে ?

গ্রামীণ মানুষের অনুভূতির সঙ্গে মেশে কবিরও অনুভূতি—তাঁর বেদনা, ব্যঙ্গ, ক্রোধ। একেকটি স্তবকে কলকাতার বিবেকহীন সমাজ, ক্ষুদ্র জীবন, রাজনীতির শঠতা, 'দোকানঘরের কাচের বাহার'—সামাজিক প্রেক্ষিতের একেক স্তর সরে সরে যায়। আর পাঠকের মনে দাগ রেখে যায় :

লঙরখানায় উলঙ্গ সব ছেলে
ভাঙা ঘরের নোঙর-ছেঁড়া মেয়ে··· ।

কবির সমাজনাট্যের এরাই তো কুশীলব। কবির জবানিতে ৬-৯ স্তবকে শুনি ইতিহাসের যুগযুগান্তব্যাপী অভিশাপ এদের ওপর। তার বিরুদ্ধে 'আকাশে তোলে মানুষ দুটি বাহু।' এই ছবিটিই মুদ্রিত হয়ে থাকে। নাটকের চরম মুহূর্তও এখানেই। শেষ স্তবকে এই অপরাজিত কৃষকের ছবিতেই নাট্যের শেষ।

ফসল বেঁধে বাঁধি প্রাণের ঘাঁটি।

'১৯৪৩ অকাল বর্ষা' কবিতায় অবশ্য নাট্যকাহিনীর বিস্তারের বদলে সনেটের তীব্র অথচ সংহত আবেগে সেই একই অভিজ্ঞতা রূপ পায় :

শহরে অকাল বর্ষা, আকাশের নীল কণ্ঠরোধ,
সকাল না হতে কাঁপে ক্রন্দসী ! ও চালের আড়তে
অনাহারে অসহায় কাতারে কাতারে কোনোমতে
কুইনীন্‌হীন দেহ ঢেকে কাঁপে ক্ষুধার্ত নির্বোধ
ভিখারী দেশের লোক আমাদেরই। সভ্যতার ভার
যারা বয় আস্থাভরে, যারা মরে, জীবিকা জোগায়
মৃত্যুঞ্জয় আমাদের, দধীচি সে ভিখারীর সার
বাংলার পথে পথে···

'সাত ভাই চম্পা' পর্যন্ত এই অনুসন্ধান চলে, চলেএই পথসন্ধান—অভিজ্ঞতার এক-একটা স্তর পার হয়ে তিনি নিজেকে তৈরি করেন—যেন এক-একটা আবরণকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন কেন্দ্রে পৌছনোর জন্য। 'সাত ভাই চম্পা'-তেই দেখা যাচ্ছে ঐ লক্ষ্যে পৌছনোর ইশারা—দীর্ঘ পথপরিক্রমার শেষে যেন চোখে পড়ছে আলোকিত দিগন্ত, শোনা যাচ্ছে সাগরতরঙ্গের উচ্ছ্বাস।

'কোডা' কবিতাটি সেই উত্তরণেরই বার্তাবহী। এখানেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে টুকরো-টুকরো কাব্য-অভিজ্ঞতাকে সুরসাম্যে গ্রথিত করার সেই আবেগ, 'বীজকম্প্র সুনীল আঁধারে'-র প্রতিমায় তাঁর কবিতার অভ্যস্ত স্বাতন্ত্র্যের বীজ শব্দগুলির প্রথম আবির্ভাব। যুদ্ধের আতঙ্ক ('অস্পষ্ট ভয়ের ধোঁয়া') ও দুর্ভিক্ষের হাহাকারকে শিয়রে রেখে বিপর্যস্ত কলকাতায় ছত্রভঙ্গ স্বপ্নকে একত্রিত করার আবেগসঞ্চার যেন তাঁর সমস্ত পথ-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার নির্যাস রূপে পাওয়া যায়। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে এই 'কোডা' কবিতাটির গদ্যরূপ দেন প্রায় অবিকল শব্দসাম্যে: 'বর্তমানের উৎসারিত স্বপ্নের সৃষ্টি তো আমাদের ভবিষ্যতের ছবি—নানা স্বপ্নের ঐক্যতান. দুঃস্বপ্নেরও বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়তো আমাদের স্বপ্নপ্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত! কিন্তু নানা লোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত। স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐক্যতান ছিন্নভিন্ন অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শিকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যম্ভাবিতায় বীজকম্প্র নীল অন্ধকারে বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন। বিসংবাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়, উদয়াচলে মেশে অস্তাচলের রক্তস্রোত, ভগ্নদূতের মুখে জাগে মিছিলের প্রবল আশা, প্রাণের কবি অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীকালের ভাষা।'[১০] বিষ্ণু দে-ও এগিয়ে যান তাঁর স্বকীয় ভাষা-আবিষ্কারের অভিযানে—'বীজকম্প্র' সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা এবং 'নৈব্যক্তিক আবেগ'—তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এই নৈর্ব্যক্তিক আবেগেরই একটি তীব্র ছবি শেষ কবিতা 'সূর্যাস্ত' এ। তারপরই তো 'সন্দীপের চর'-এর কূলপ্লাবী বাধাবন্ধহারা আবেগ।

১. ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের যে সংগঠন সমিতি নির্বাচিত হয়, তাতে সম্পাদক হন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ঐ সংগঠন সমিতি গঠনের ব্যাপারেও তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ ছিল—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যামিনী রায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতিকে তিনিই রাজি করান। ১৯৪৪ সালে সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনের রিপোর্টে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের যুক্ত-সম্পাদক হিসেবেও বিষ্ণু দে-র নাম আছে। এ-বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : 'পরিচয়,' ফ্যাশিস্টবিরোধী সংখ্যা ১৯৫৬।

ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ তাঁর '২২ শে জুন' কবিতা-পুস্তিকাটি বের করে (১৯৪২)—পরে অবশ্য একটি কবিতা ('জনযুদ্ধ') বাদে পুস্তিকাটি 'সাত ভাই চম্পা'-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া সংঘ প্রকাশিত দুটি পুস্তিকায় তাঁর রচনা বেরোয়—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'U S—A People's Symposium'-এ (১৯৪২) এবং হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কেন লিখি?'-তে (১৯৪৪)।

ফ্রান্সের ফ্যাশিবিরোধী বিখ্যাত রচনা ভেরকর-এর Le Silence de la Mer-এর সমালোচনা লেখেন ১৯৪৪-এ এবং তার বাংলা অনুবাদ 'সমুদ্রের মৌন' প্রকাশ করেন ১৯৪৬-এ। ঐ গ্রন্থের ভূমিকা 'ফরাসী প্রতিরোধ ও সাহিত্য' প্রবন্ধে উনি বিশ্বের, বিশেষত ফ্রান্সের ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পীদের বীরত্বময় সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেন।

সংঘের উদ্যোগে সুধীন্দ্রনাথ-অনূদিত ইয়েটসের কাব্যনাট্য 'পুনরুজ্জীবন'-এর যে অভিনয় হয় 'টাকা তোলা'-র জন্য, সে অভিনয়ের উদ্যোক্তা ও নাট্যপরিচালক ছিলেন বিষ্ণু দে স্বয়ং (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'পুনরুজ্জীবনের অভিনয়'। বহুরূপী ৩৪)।

২. সে-সময়ে অন্তত কেউ-কেউ এরকম ইঙ্গিতই করেছিলেন। 'হয়তো এই মুক্তির উত্তেজনাতেই তিনি এ গ্রন্থে বেশি ঝুঁকেছেন সরল বিবৃতির দিকে।…এতে খোলা হাওয়া যতটা রয়েছে, আবহাওয়া ততটা জমে নি…।' (অরুণ মিত্র, 'সাত ভাই চম্পা'। 'অরণি' ২৫মে ১৯৪৫)।

৩. S. M. Shtemenko, 'The Soviet General Staff at War/1941-1945' Progress Publishers

৪. বিষ্ণু দে, 'আরাগঁ'। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ,' সিগনেট, ১৩৫৯ ব। পৃ ৭৩। পরের উদ্ধৃত শব্দগুচ্ছের উৎসও এই।

৫. বিষ্ণু দে, 'বিপ্লবকালীন ও পরবর্তী সোভিয়েত কবিতা'। 'সোভিয়েত বিপ্লব পরিচয়,' সোভিয়েত-বিপ্লব পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি ১৯৫৬। পৃ ১৬৯।

৬. বিষ্ণু দে, 'ফরাসী প্রতিরোধ ও সাহিত্য'। সমুদ্রের মৌন.' ঈগল পাবলিশার্স, ১৯৪৬। পৃ ৫।

৭. ঐ। পৃ ৩। বিষ্ণু দে-র করা অনুবাদ। অবশ্য এর আরেকটি আমূল পরিবর্তিত অনুবাদ 'হে বিদেশী ফুল'-এ আছে।

৮. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর'। মনীষা, পৃ ৪৫৬-৭।

৯. সুকান্ত ভট্টাচার্য, 'আকাল'-এর 'কথামুখ'। সারস্বত লাইব্রেরী ১৩৫৬ ব। পৃ ৯-১০।

১০. বিষ্ণু দে. 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'। 'রুচি ও প্রগতি,' ঈগল পাবলিশার্স, [১৯৪৬]। পৃ ৩৮-৩৯।

'মৃত্যুহীন সন্দ্বীপের চরে ভারতসাগরে চলো'

'সন্দ্বীপের চর' কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল : ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭। ফলে এ গ্রন্থের কিছু কিছু কবিতা 'সাত ভাই চম্পা'-রই অভিজ্ঞতার পরিবেশে লেখা। এখানেও আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধশেষের স্মৃতি, ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের গৌরব-গরিমা, পঞ্চাশের মন্বন্তরের হাহাকার। আছে ছড়ার মোড়কে এ-যুগের বর্গিঠগদের লুটপাট এবং চম্পা জেগেছে বলে সাত ভাইয়ের ভাবনা-প্রস্তুতির কাহিনী ('ছড়া ২', 'পারুলের ছড়া')। 'শালবন' সনেটটিতে যুদ্ধশেষে পরিত্যক্ত তাঁবুর বর্ণনায় আছে সৈনিকদের কয়েক বছরের সামরিক জীবনযাপনের, ক্লেদাক্ত সংস্কৃতির ছিন্ন অভিজ্ঞান। আর 'বৈশাখী' কবিতায় ঈষৎ তরল ভঙ্গিতে বলেন :

> কল্কি আজ পৌরাণিক ঘোড়া
> চড়ে না, ফ্যাশিস্ট সাজে আসে
> দুর্ভিক্ষবাহন সোনামোড়া।

'কাসাণ্ড্রা'-র পৌরাণিক প্রতিমার মোড়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'এত দুর্যোগ ছিল কোথায় সকলে ভাবছি।' আর 'ভিড়' কবিতায় বিদ্রূপ করে বলেন, 'নানা মুনি দেয় নানাবিধ মত মন্বন্তর আসে।'

কিন্তু তবু সবকে ছাপিয়ে আশার প্রতিমা কখনও ম্লান হয় না। বীরের মূর্তি জেগে ওঠে দুর্মর আবেগে। তাই কবি আঁকেন 'মরণের বনভোজে মৃত্যুঞ্জয় বন্ধু শালবন।'

'সাত ভাই চম্পা'-তে বিশ্ব রাজনীতির বাস্তব কবির কাছে খুব বড় হয়ে উঠেছিল স্বভাবতই। কিন্তু এ গ্রন্থে বোধহয় সেই দুশ্চিন্তা ও গৌরবগাথার চেয়ে ছেয়ে আছে স্বদেশের দুর্দশা। কারণ পঞ্চাশের মন্বন্তরের অস্তিত্ব বড নিকট, মারি ও মড়ক বাংলা দেশে চলেছেই—'বাংলায় মারির কবল./অনাহার' ('বৈশাখী'।)

'আইসায়ার খেদ' কবিতাটি এদিক থেকে খুব নজর কাড়ে—স্বদেশের দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস এখানে মূর্ত। সমস্ত কবিতাটি বলা হয়েছে এক অশীতিপর বৃদ্ধের জবানিতে—সিপাহী বিদ্রোহ থেকে বুওর যুদ্ধ, অসহযোগ-আইনঅমান্যের আন্দোলন

থেকে যুদ্ধোত্তর চোরাকারবারি যাঁর স্মৃতিতে—মৃত্যুপথযাত্রীর নিরাসক্তিতে তিনি বলে গেছেন আমাদের দুঃখের ইতিকথা। বর্তমান তাঁর কাছে 'ক্রমান্বয়ে মন্বন্তরি নরকের নবান্ন উৎসব।'

আবার 'আইসায়ার খেদ' কবিতাতেই দেখছি, বৃদ্ধের অভিজ্ঞতায় শুধু এই নরকই নেই—আছে দুই পৌত্রের বিপরীত জীবনযাপনের মধ্যে সমকালীন আরেক ইতিহাস। এক পৌত্র কালোবাজারী, অন্য জনের 'অসিধার ব্রত প্রগতি নিষ্ঠায়', যার চোখে আশার আলো। বাইবেলে বর্ণিত আছে, হিব্রু রাজ্যের প্রবল নৈরাজ্যের মুহূর্তে ইহুদি ঋষি আইসায়া-র খেদ এবং আশীর্বাদ উচ্চারিত হয়েছিল, বৃদ্ধের বচনে যেন তারই রেশ। পঁচিশ বছরের লড়াকু কর্মী, যে বলে 'বিশ্ব এক', তা-ই আশ্বাস জোগায় বৃদ্ধের মনে। সেই কর্মীই যেন স্পর্ধিত কণ্ঠে বলে '৮ই আগস্ট' কবিতায়, 'কল্কির পিঠে আমরাই তবু চড়ি' কিংবা 'ভিড' কবিতায় কবি স্বয়ং বলেন, 'মৃত্যুর পাশে জীবনের ভিড় বদ্ধমুষ্টি সঙ্ঘনিবিড।'

কিন্তু ১৯৪৬-এর দাঙ্গার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় কবির মনের সেই আশা দপ্ করে নিভে যায়, হারিয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্বের সব প্রতিমা। অনেক কবিতাই, বিশেষত দীর্ঘ কবিতাগুলি, এই হিন্দুমুসলমান ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার প্রত্যক্ষতায় লেখা বলে মনে হয়। বাস্তবের সঙ্গে জটিল মোকাবিলায় 'সাত ভাই চম্পা' পর্যন্ত যে বিশ্বাস ও আশা কবির মনে গড়ে উঠেছিল, সঙ্ঘবদ্ধ জনতায় জমে উঠেছিল গভীর আস্থা, তা যেন সাময়িকভাবে হলেও ফুৎকারে হারিয়ে যায় এই ঘটনায়।

এই গ্রন্থে যে কটি দীর্ঘ কবিতা আছে, তাতে প্রত্যক্ষভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে এই সময়ের বেদনা ও আতঙ্কের অনুভূতি। তা থেকে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি পুনরাবৃত্ত প্রতিমা।

বিপর্যস্ত আরণ্যপ্রকৃতি :

> বনস্পতি নেই, কটা আছে জীর্ণ বজ্রাহত শাল ...
> বজ্রাহত গাছ...
> খাণ্ডব/ছিন্নমস্তা জীর্ণ গুল্মবন...
> অরণ্যের বীভৎস রোদ ...
> কঙ্কালীতলার দীর্ণ বন ('কঙ্কালীতলা')

হিংস্র ও ঘৃণিত জীবজন্তু :

শ্বাপদসঙ্কুল বনে শৃঙ্গী ও দন্তুর যত মরণমাতাল ·
নখে নখে থাবায় থাবায় কঙ্কালে কঙ্কালে ঠোকে ··
শকুনিরা দূরে পাখা ঝাড়ে ··
গোখুরা হাঁপায় ('কঙ্কালীতলা')
ঘেয়ো কুকুরের মতো অন্ধকার ('চৈতে-বৈশাখে')
মাছি ভন্‌ভন্ ওড়ে ভন্‌ভন্ ('জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস')
শকুনপাল ('সন্দ্বীপের চর')

শব-কঙ্কাল-শ্মশান :

উপোসীর হাড়ে পাহাড় গড়ে···
খালিপেটে নাচো পিশাচরঙ্গে · ('জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস')
কঙ্কালে কঙ্কালে ঠোকে ('কঙ্কালীতলা')
আশশেওড়ার দেশে/শ্মশান গোরের দেশে···('১৫ই আগস্ট')
পাশা খেলে প্রাণের শ্মশানে পিশাচসিদ্ধেরা ('সমুদ্র স্বাধীন')

উন্মাদ :

এ মরণে প্রাণ নেই, এ তো নেশা উন্মাদের···('সন্দ্বীপের চর')
উন্মাদের ভয়ক্ষিপ্র ফণা ··
জোড়াতালি শহরের উলঙ্গ জেল্লায়/জীবনের কুৎসিৎ উন্মাদ ব্যর্থতা ··
('কঙ্কালীতলা')
পশু নয়, উন্মাদ মানুষ ('সমুদ্র স্বাধীন')

ভয়-আতঙ্ক-সন্দেহ :

ভয় আর সন্দেহের জিঘাংসু হৃদয় ('কঙ্কালীতলা')
দৃঢ় ক্রূর সর্পিল পাপের ক্ষিপ্র পায়ে
ছড়াও বিভেদ, হিংসা, বীভৎস সন্দেহ ফিস্‌ফিসে···
পরস্পর বিক্ষুব্ধ সন্দেহে ('স্বর্গ হইতে বিদায়')

ঘৃণা :

প্রচণ্ড ঘৃণার ভাণ্ড, যেখানে গোখুরা হাঁপায় ('কঙ্কালীতলা')
প্রচণ্ড ঘৃণার দ্বীপ উপদ্বীপ বদ্বীপেরা হিম ও কঠিন···
ঘৃণার সমুদ্র নীল নীল জল আকণ্ঠ ঘৃণায় ('সন্দ্বীপের চর')
ঘৃণ্য চোরাহাটে ('সমুদ্র স্বাধীন')

নরক :

নরকের ত্রাসে জেগে থাকে ছাদে ছাদে…
অলিতে গলিতে
নরকের পায়ের ছায়ায়, শব্দে…
নরকের ত্রাসে গড়া/মরিয়া শহর ('কঙ্কালীতলা')
নরকের চিত্র/ব্যঙ্গে ('স্বর্গ হইতে বিদায়')
শয়তানের ঘাটে ঘাটে/নরকের প্রচ্ছন্ন ময়দানে ('সমুদ্র স্বাধীন')
নরকের অট্টনাদে আকস্মিকে অমানুষ পরম্পরাহীন ('চৈত্রে-বৈশাখে')
নরকের জ্বালা দেখ জনগণ ! …
নরকের মাছি…
ভদ্রলোকের নরক ('জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস')

বিচ্ছিন্নভাবে এই প্রতিমার দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হল বটে কিন্তু এদের পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রায় তর্কাতীত। এক ধরনের প্রতিমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভিন্ন ধরনের প্রতিমা, অমলেন্দু বসু যাকে বলেছেন গোত্রান্তরী উপমা বা সিনেস্থিসিয়া—একই ছাঁদে বাঁধা একাধিক প্রতিমার ঐক্যে যেখানে একই চিন্তার আভাস বা ব্যঞ্জনা। তবে এরই মধ্যে লক্ষণীয় যে, শ্বাপদ জন্তুর বা নরকের উল্লেখ এর আগেও আমরা পেয়েছি বটে, কিন্তু সেখানে তারা নৈর্ব্যক্তিক উপমা বা পরোক্ষ অনুষঙ্গ হিসেবেই এসেছিল—কিন্তু এখানে এর পুনরাবৃত্তি কবির নিজস্ব চেতনার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। নরক আর হেডেসের অনুবাদ মাত্র নয়, তারা বাস্তবতার ও কবির বিশেষ অভিজ্ঞতার জটিল সম্বন্ধপাতে হয়ে ওঠে কবির নিজস্ব শব্দ বা বাক্‌প্রতিমা। শব্দগুলি পুনরাবৃত্তির ঝোঁকে ও পারস্পরিক সংলগ্নতায় অন্য ধরনের নির্দিষ্টতা পায়।

বাস্তবতার চাপ বা প্রতিক্রিয়াটা এখনও এতই প্রত্যক্ষ যে পুনরাবৃত্ত শব্দমালা-চয়নেই এই উত্তেজনা সীমাবদ্ধ থাকে না, আরো অবিকল বা আঁকাড়া বাস্তবরূপ চায় প্রত্যক্ষের বর্ণনায়। 'মিলটনের অনুসরণে' 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটির ব্যঙ্গচিত্রে তিনি তারই রূপ দেন। কিংবা অন্যত্রও এসে পড়ে বারবার ঐ প্রত্যক্ষ চিত্র—দাঙ্গাকালীন কলকাতা শহরের আতঙ্কে উত্তেজনায় নকল-বীরত্বে।

গবাক্ষে গবাক্ষে চোখ, মোড়, গলি, রোয়াক, চাতাল
গুপ্ত মন্ত্রণায় কাঁপে যন্ত্রণায়…
বারাণ্ডায়, জানালায় বিনিদ্র প্রহরে টহলায় পাড়ায় পাড়ায়

মহল্লায় ইসারায় ইটের বাঁশে চোরা ডাকে নকল সেনার ফিসফাসে

('কঙ্কালীতলা')

খুদে শয়তানেরা

সে খবরে তিলকে বানায় তাল, দ্রুতবেগে হানে

শহরের মোড়ে মোড়ে ('স্বর্গ হইতে বিদায়')

অবশ্য এই শ্বাসরোধকারী গুমোট পরিবেশ থেকে কবি অচিরেই মুক্তি খুঁজে নেন। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার গ্রাস করেছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তির আভাসমাত্র ছিল না। কিন্তু কবি উজ্জীবনের সন্ধান পান প্রকৃতির বদান্যতায়, ঋতুচক্রের প্রায় দৈব আশীর্বাদে। গ্রীষ্মের গুমোট ভেঙে নেমে আসে অঝোর বর্ষা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এই প্রাকৃতিক রূপক ইতিহাসের মুক্তিরই নির্দেশ। তাই সন্দীপের চরে লালমোহন সেনের আত্মোৎসর্গে, হাসানাবাদের হিন্দুমুসলিম-ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে, বাংলাদেশের তেভাগা আন্দোলনে বা কাশ্মীর-ত্রিবাঙ্কুর-গোল্ডেনবকের মুক্তি আন্দোলনে মানুষের পরাজয়ের ঐ গ্লানি মুছে যায়, কবি আবার হারানো বীরদের সন্ধান পান।

লালমোহন সেন নিহত হয়েছিলেন সন্দীপে, হিন্দুমুসলিম ঐক্যের প্রয়াসে। 'সন্দীপের চর' কবিতাটি কবি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। ১৯৪৬-এর মে মাসে খুলনা জেলার মৌভোগ গ্রামে বঙ্গীয় কৃষক সভার নবম সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে সারা বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। 'এর পর শুরু হয় সারা বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ৬০ লক্ষ চাষী এই সংগ্রামে অংশীদার হন। শত শত কৃষক লাঠি ও গুলির আঘাতে নিহত হন। এর পর শুরু হয় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে কৃষকরাও রুখে দাঁড়ালেন। আমাদের গ্রামের [মৌভোগ] ৬০ বছরের বৃদ্ধ এয়াছিন ফকির (অন্ধ), অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা গিরিধর মণ্ডল স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য সর্বত্র প্রচার শুরু করেন। কৃষক-সভার কর্মীরাও সর্বত্র গ্রাম্য বৈঠক করে কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমন করেন, সে কারণে আমাদের অঞ্চলে কোনো দাঙ্গা হয় নি।'[১]

এরই উপলক্ষে বিষ্ণু দে লেখেন 'মৌভোগ'। গোটা কবিতাটিতে বাংলা-দেশের চিরপরিচিত রূপকথা 'নীলকমল-লালকমল'-এর কাহিনীকে তিনি ব্যবহার করেছেন বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোয়। এখানেও আছে 'রাক্ষস', 'রাক্ষস জাতি'

—যারা 'চোরাই মালে'র কারবার করে, 'মড়ক পূজা' করে। কঙ্কালীতলা বা কঙ্কালীপাহাড় আছে এখানেও। আর তার মূর্ত প্রতিবাদ লালকমল-নীলকমল, যে বীরদের জন্মের ফলে ইতিহাসের ঘটে মুক্তি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার-কথিত রূপকথার ভাষাও প্রায় অবিকল ব্যবহার করেন কবি : 'অমনি ডিম ভাঙিয়া, লাল নীল ডিম হইতে লাল নীল রাজপুত্র বাহির হইয়া,—মুকুট মাথে খোলা তরোয়াল হাতে জোড়া রাজপুত্র শন্ শন্ করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল! কৃষাণ দেখে, 'লাল ডিমের খোলস সোনা আর নীল ডিমের খোলস লোহা হইয়া পড়িয়া আছে। তখন লোহা দিয়া কৃষাণ কাস্তে গড়াইল ; সোনা দিয়া ছেলের পঁইচে, বাজু বানাইয়া দিল।'[১]

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পঁইছে বাজু বানায়। ('মৌভোগ')

তারপর নীলকমল-লালকমলের সংগ্রামী প্রতীক্ষা। রূপকথায় পাই, ছন্দের স্বাধীনবিন্যাসে :

নীলকমলের আগে লালকমল জাগে
আর জাগে তরোয়াল,
দপ্ দপ্ করে ঘিয়ের দীপ জাগে—
কা'র এসেছে কাল?

ঈষৎ আরোপ করে কবি লেখেন :

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল?

তারপর শেষ স্তবকে নীলকমল-লালকমলের ঐক্য 'প্রাণের লাল নিশানে', মৌভোগের বাস্তবতায়, হিন্দুমুসলিম সংগ্রামী ঐক্যের ছবি হয়ে ওঠে। তারা যেন এ যুগের এয়াছিন ফকির আর গিরিধর মণ্ডল। 'নকল সেনানী' নয়, প্রকৃত বীরত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে তারা বিষ্ণু দে-র পরবর্তী কাব্যবিকাশেও।

লালকমল-নীলকমলের অনুষঙ্গে হিন্দুমুসলিম ঐক্যের ছবিটি আরো স্পষ্ট 'হাসানাবাদেই' কবিতাতে।

কঙ্কালে কঙ্কালে জাগে কলরব।—

লালকমলের হাতে নীলকমলের
রাখী বেঁধে অতন্দ্র রাম ও রহিম।

'নোয়াখালি হাঙ্গামার শোচনীয় ঘটনার মধ্যে থেকে একটা আশার আলোও ভেসে আসে। বিভেদ-বিচ্ছেদ ও তিক্ততার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে মিলনের আহ্বান। / রামনগর থানার হাঙ্গামা-এলাকার পাশে ত্রিপুরা জেলার সীমানা পার হয়েই হাসনাবাদ গ্রাম ও এলাকা পড়ে। কৃষক সভার নেতৃত্বে এই এলাকার অন্তত এগারখানা গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা মিলিতভাবে উদ্ধার করেন ও নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেন প্রায় তিন হাজার দুর্গত ও পলাতক নারী-পুরুষ হিন্দুকে। এই এলাকার তখন মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা অন্তত শতকরা ৮০ জন।'[৩] বোঝা যায় এরই প্রেরণাতে 'হাসানাবাদেই' কবিতাটি লিখিত। বাংলা দেশের পরিচিত নানা ছড়ার টুকরো বা আভাস নিয়েই কবিতাটি গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া রূপকথার চিত্র বা চরিত্র তো আছেই। আর প্রত্যেক স্তবকেরই শেষ চরণটিতে ধুয়োর মতো উচ্চারিত হয়েছে রাম-রহিম বা হরি-আব্বাসের ভ্রাতৃত্ব, অতন্দ্র প্রহরায়।

রাক্ষসী রাণী বুঝি ভয়ে হল হিম—
মরণকাঠি যে তার হাসানাবাদেই
এক হাতে ভাঙে শত রাম ও রহিম।

রাম ও রহিমের ঐক্যেই সমস্ত অন্ধকারের অবসান হাসনাবাদ বা হাসানাবাদ তো তারই দৃষ্টান্ত।

'মে-দিন' কবিতায় লালকমল-নীলকমলের ভ্রাতৃত্বের এই প্রতীকরূপ উত্তীর্ণ হয় বৃহত্তর সংগ্রামী চেতনায়। শ্মশানের স্মৃতি, শকুনের পক্ষবিস্তার এখানেও আছে—কিন্তু ঝড়ের বজ্রবেগে সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়—'ঝড়ের ডানা ঝাড়ে শ্মশানের পাখি' এবং বৃথাই শকুনি পাখসাটে ঢাকার চেষ্টা করে 'ঝড়ো মেঘ'। আর তার মাঝখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে রূপকথায় নায়ক।

মে-দিনের গানে আসন্নত্রাণে
হে লালকমল হে নীলকমল
নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে
স্বর্ণলঙ্কা চূর্। ··

'১৫ই আগস্ট' কবিতাতেও স্বর্ণলঙ্কা-র মুক্তির ছবি ফুটে ওঠে। যে স্বর্ণলঙ্কা-

পুরে মাটির দুহিতা সীতা ছিল বন্দিনী, আজ সেখানে 'আনন্দবন্যার আবেগ'।

অবাক বিস্ময় ভয় স্বর্ণলঙ্কাপুরে · ।

এ আসলে কলকাতারই বর্ণনা। ১৯৪৬-এ যে দিনটিতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, এক বছর পরে সেই দিনটিতেই 'আশ্বিনপূজার মিল হল বুঝি ঈদমুবারকে।' এক বছরের পাপ কি তবে শেষ হল? 'মুক্ত বর্ষভোগ্য শাপ, মুক্ত হল কলকাতার বেড়ী।' বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া এবং বেড়ী-পরা বন্দিনী সীতার প্রতিমা মিশে আছে এই লাইনে। দুজনেরই আজ মুক্তি, দুঃখের অবসান। সমস্ত কবিতাটিতে ছড়িয়ে আছে এই 'আশ্চর্য শহরে'র 'আনন্দনিষ্যন্দন' প্রভাত।

বীরত্বের বা উজ্জীবনের ছবি আরো বিস্তার লাভ করে তৎকালীন ভারত-ব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের ছায়াপাতে। ১৯৪৬-এ আই-এন-এ-বন্দীদের নিয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভ, ফেব্রুয়ারিতে বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ, জাতীয় বিমান বাহিনীর বৈমানিকদের ধর্মঘট, ভারতীয় সিগন্যাল কোরের জওয়ানদের কর্মবিরতি—সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতে হরতাল ও ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শিল্পশ্রমিক, ডাক-তার ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের সুবিশাল ধর্মঘট চলতেই থাকে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি প্রবল আন্দোলনের তরঙ্গ উঠল দেশীয় রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলিতে—হায়দ্রাবাদে, কাশ্মীরে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে। ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নাপ্রা ও ভায়লা নামক দুটি গ্রামে কৃষকরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। সর্বোপরি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের চারটি জেলা নিয়ে গঠিত তেলেঙ্গানার কৃষক-সমাজ জমির জন্য এবং রাজন্যশাসন অবসানের জন্য জমিদারশ্রেণী ও নিজামশাহীর বিরুদ্ধে নামে সশস্ত্র সংগ্রামে।

'শ্রমিকদের সংগ্রামী প্রতিবাদ-ধর্মঘট, কলকাতার আই-এন-এ সংক্রান্ত বিক্ষোভ মিছিল, আর. আই. এন. বিদ্রোহ, তেভাগা সংগ্রাম, তেলেঙ্গানার কৃষক-সমাজের সশস্ত্র সংগ্রাম, কাশ্মীরী জনগণের "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলন ভারতের যুদ্ধোত্তর উত্থানের প্রতীক ও সর্বোচ্চ শিখর।'[১]

সবচেয়ে কাছের অবশ্য বাংলা দেশের তেভাগা আন্দোলন। 'কলকাতার হত্যালীলার তিন মাস এবং নোয়াখালির দাঙ্গার এক মাস পরে বাংলা দেশ তেভাগা আন্দোলনের ঘূর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়ল। ১৯৪৬-এর শীতে ভাগচাষীরা মাড়াই জমিতে ধান এনে ফেলে দাবি তুলল, অর্ধেক নয়, দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ। এক মাসের মধ্যে কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এবং ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, ২৪পরগণা, যশোহর ও খুলনার জায়গায় জায়গায়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ময়মনসিংহের হাজং চাষীরা তঙ্কা দিতে অস্বীকার করল…। এ দেশে এত জোরালো কৃষক আন্দোলন এর আগে আর হয় নি।'[৫] দিনাজপুরের বালুরঘাট ও ঠাকুরগাঁ, ২৪পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী কাকদ্বীপ বা ময়মনসিংহ জেলার সুসং পাহাড় (আদিবাসীদের আন্দোলন)—তেভাগা সংগ্রামের যুগে বারবার উচ্চারিত নাম।

১৯৪৬-এর দাঙ্গার অভিজ্ঞতার পরে-পরেই বা একই সঙ্গে ঘটতে থাকে তেভাগার, মৌভোগ-হাসনাবাদের, কাশ্মীর-ত্রিবাঙ্কুর-তেলেঙ্গানার অভিজ্ঞতা। প্রথম অভিজ্ঞতা যেমন এনে দেয় পরাজয়ের গ্লানি—শকুনি উড়তে থাকে নরকের অমানবিক পরিবেশে, তেমনি পরের অভিজ্ঞতাগুলি আশা ফিরিয়ে আনে কবির মনে। 'উল্টাডিঙি কাশীপুর পাটনায়' নরকের শ্মশানের যে চিতা তিনি প্রজ্বলিত দেখেন, সেই চিতা নিভে যায়, 'আদিজননী সিন্ধু'-র 'মৈত্রেয় প্রজ্ঞা-পারমিতা'-র চোখের আলো। যখন পড়ে 'কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে/তেলাঙ্গানা, বাংলায় কতো গাঁয়ে দুর রুশে…'। কবির সচেতন রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় এই স্বদেশী আন্দোলন তো আন্তর্জাতিক ঘটনা ও সংগ্রামেরই অঙ্গ।

'সন্দ্বীপের চর' কবিতায় দেখি ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাকে বলা হয়েছে মানবতার রোগ —এই রোগের নিদান তো ঐ সংগ্রামে অংশগ্রহণেই।

> এই রোগে এ মরণে প্রাণ নেই, প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগে
> নিকটে সুদূরে কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে রক্তাক্ত গোল্ডেন রকে
> অনেক হাসানাবাদে প্রাণের আবাদে, নয় বনিয়াদী হত অপঘাতে …।

দাঙ্গার অভিজ্ঞতা কবিকে এক সঙ্কীর্ণ দেয়ালের মধ্যে বন্দী করেছিল। 'চৈত্রে-বৈশাখে' কবিতাতে 'অনন্ত মন্থর দিন দীর্ঘ দিন', 'একঘেয়ে মুহূর্তের দীর্ঘদিন' ঠেলে কবি আহ্বান জানালেন ভারতের ভেতরে-বাইরে কিংবা বহির্বিশ্বের উদার প্রাঙ্গণে, সংগ্রামের তীর্থক্ষেত্রে। ভারতের প্রকৃতি বা ভারতের প্রত্নকীর্তির পাশে সমান গৌরবে স্থান করে নেয় ভারতের ও বিশ্বের সংগ্রামচিহ্নিত স্থানগুলি।

> চলো যাই, হে চূড়ালা! বঙ্গোপসাগরে
> মৃত্যুহীন সন্দ্বীপের চরে ভারতসাগরে চলো মামল্লপুরমে কোনার্কবন্দরে
> কিম্বা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে
> ত্রিবাঙ্কুরে হস্তীগুম্ফা কান্বে কিম্বা কচ্ছোপসাগরে
> জাভায় বলীতে মার্তাবানে ওদেসায় আস্ত্রাখানে
> বাটুম বা বালখাসে আরালে বা কারাকোলে কেউ

একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে…।

তেভাগা আন্দোলনের বীর মানুষরাই তো কবির স্বপ্নের মানুষ। তারাই ঘোচাতে পারে বর্তমানের এই কুৎসিৎ গ্লানি।

হাজারে হাজারে দেখ জমির মালিক
কৃষাণ, কৃষাণবউ ভূস্বর্গইন্দ্রাণী যারা
সুস্থ বাল্যে, স্বচ্ছল যৌবনে, বার্ধক্যপ্রসাদে আহা রূপসীরা
প্রত্যহের সুচির লীলায় কর্মে অবসরে
যে যার সংসার করে, এখানে ঠাকুরগাঁয়ে,
ওখানে বালুরঘাটে, কাকদ্বীপে, সুসং পাহাড়ে, সারা বাংলায়,
দেহ মনে দুই তটে, খেতে খেতে খামারে খামারে, রৌদ্রে জলে
দীপ্ত বাহু, দৃপ্ত উরু, পূর্ণসাধ মানুষ মানুষ
সত্য সেই সবার উপরে। ('সমুদ্র স্বাধীন')
আমি যে শুনেছি সেই ঠাকুরগাঁয়ের ছোট কুটির প্রাঙ্গণে
দম্পতির মৃত্যুহীন দৈবী প্রেমে তীব্র-আলোচনা
যে প্রেমে গ্রাম্য সে ইন্দ্রইন্দ্রাণীরা জীবনমৃত্যুর ব্যবধান
মুছে দেয় জীবনের ঐক্যে। ('চৈত্রে-বৈশাখে')

এইভাবে দাঙ্গার নারকী অন্ধকার অতিক্রম করে কবি পৌঁছলেন ভূস্বর্গ ইন্দ্রাণীর আলোকিত জগতে। কঙ্কালীতলায় ছিল বৃষ্টিহীন মেঘহীন ঘোলাটে আকাশ—'হাহাকারে…থরথর সারাটা আকাশ।' সেখানকার প্রতিমাপুঞ্জ গড়ে উঠেছিল নরক, শ্মশান, শকুনি, জীর্ণ দগ্ধ বন এই সব শব্দের সাহায্যে—প্রকৃতি সেখানে অনুপস্থিত বা 'উদাসীন' - 'গড়ে ওঠে প্রাকৃত ব্যবধান।' বুঝতে পারা যায়, মৌভোগ-হাসনাবাদ বা কাশ্মীর-তেলাঙ্গানা-ত্রিবাঙ্কুর কিংবা তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় কিংবা নিছক কলকাতার ১৫ই আগস্ট-এর অভিজ্ঞতাতেই ঘটে যায় ঐ উজ্জীবন – ঠাকুরগাঁয়ের কৃষাণ-কৃষাণীর জীবনে বা ডকের খালাসীর চোখেই তিনি ফিরে পান জীবনের আস্থা। এই সামাজিক-রাজনৈতিক আস্থা রূপ পায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিমাপুঞ্জে—আকাশভাঙা বৃষ্টি, খরস্রোত নদী, সমুদ্র বা আকাশের পূর্ণতা গড়ে তোলে অজস্র সম্বন্ধ ও পরিপূরক প্রতিমা—এক উপমা গড়িয়ে পড়ে আরেক উপমায়।

কঙ্কালীতলার জগতে আকাশে মেঘ ছিল না, 'সে হিংসায় জিঘাংসায় বৃষ্টি

নেই মেঘ নেই'—থাকলেও তা 'বর্ষার মেঘ তো নয়', তাতে নেই 'মেদুর আবেগ'। 'তাতে নেই জীবনের বজ্রের আবেগ।' কিন্তু এবার সেই আকাশ ভেঙে অঝোর বর্ষণ। ঘুচে যায় নরকের ত্রাস।

বর্ষার ঢেউ ওঠে আকাশে কোথায়
প্রাণের জোয়ার···
জোড়াতালি শহরের উলঙ্গ জেল্লায় জীবনের কুৎসিৎ উন্মাদ ব্যর্থতা
নেমে যায় থেমে যায় জল পড়ে
পাতা নড়ে চিকিমিকি গলিতে রাস্তায় গাছের পাতায়
মন্দাকিনী নির্ঝরিণী শীকরে শীকরে জল পড়ে
তারপরে জেগে থাকে অতন্দ্র আকাশ
মেঘের জটায় লেগে থাকে স্নিগ্ধ হাসি···('কঙ্কালীতলা')
সাগর সেঁচানো মেঘ
সাগরমন্থিত মেঘ মেঘের আবেগে ধারাজলে
মৃদঙ্গগম্ভীর নৃত্যে ভারতনাট্যমে, যমুনার নীলে
সুনীল সাগর। ('সমুদ্র স্বাধীন')
বৃষ্টি পড়ে
পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলাপিচে ইটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে
মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
সহজিয়া মানুষের মনের মাটিতে
বৃষ্টি পড়ে
শান্ত বৈশাখীতে দগ্ধ বিশ্বে এই কথা বলে বলে বারে বারে
জীবনের বিরাট সেতারে···
তবুও অশান্ত সেই পাপে
বৃষ্টি পড়ে
সারা জীবনের মাঠে
জীবনের পথে ঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে···('সমুদ্র স্বাধীন')
শ্রাবণের ধারাজলে বৃষ্টি যেন মড়কের দুর্ভিক্ষের দেশে
লোক চলে, হাতে হাত, নিশানে নিশান...। ('১৫ই আগস্ট')-

অনিবার্যভাবেই এই শব্দচিত্রে আসে কালিদাসের ('আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে/

মেঘমাশ্রিত সানুতে') কিংবা বৈষ্ণব কাব্যের অনুষঙ্গ ('ঝরত যেমন বৃষ্টি যশোদার চোখে শিশু গোপালের গালে')—বৈশাখী ধারাজলের মতোই গড়ে ওঠে বাক্যবিন্যাস।

বৃষ্টির এই প্রতিমাশৃঙ্খল থেকেই চলে আসে নদীর প্রতিমা—কারণ 'বৃষ্টির নূতন জলে বনেদী নদীর তরল দ্বন্দ্ব।' এতকাল নদী ছিল হ্রদে আবদ্ধ, 'মরুর সান্নিধ্যে' বালুকাকাতর নদীস্রোত ছিল ক্ষীণপ্রাণ : 'নদীতে ওঠে না স্রোত।' কিন্তু আজ হ্রদ থেকে নদী বেরিয়ে পড়েছে দুকূল প্লাবিত করে। শিবের জটা-জালে আবদ্ধ ছিল 'ধূসর জাহ্নবী'—আজ জটা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে প্রাণগঙ্গা। দ্বীপ-উপদ্বীপ-বদ্বীপের গোলকধাঁধায় গতিহারা হয়ে পড়েছিল নদী—আজ 'দ্বীপে দ্বীপে মত্ত আলোড়ন।' অসংখ্য নদীর নাম আসে—প্রায় নামাবলি—স্বদেশের ও বিদেশের—আমাদের প্রাণবন্যা যেহেতু বিশ্বের প্রাণবন্যার সঙ্গেই যুক্ত।

> হৃদয়ের হ্রদ কবে খুলে গেল গতির বন্যায়
> যাত্রা হল শুরু তটে তটে পাড়ভাঙা চরজাগা নিয়া
> গঙ্গার, তিস্তার ?...
> তবু জাগে পাহাড়িয়া নদী
> আপন সীমায় তন্বী খরস্রোত তুলে দেয়
> খুলে দেয় জীবনের গতি পাথরে পাথরে
> দেওদারে দেওদারে শালবনে মুক্ত তেপান্তরে
> হাজার বাঁকের পাকে গতির আবেগে
> দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ওঠে জেগে জীবনে নিস্তার
> প্রাণের বিস্তার··· (সন্দ্বীপের চর')
> দুই তটে আমাদের স্রোত জলে স্থলে আকাশে উদ্ভিদে
> সহস্র নিবিদে ক্ষণে ক্ষণে স্বতই উৎসারে
> প্রাণের জোয়ারে। ('কঙ্কাবতীতলা')

এইভাবে 'দুই তট', 'প্রাণের জোয়ার', 'প্রাণের অনন্ত স্রোত', 'কালের বিরাট স্রোত', 'সহস্র ধারা' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ বারবার ব্যবহৃত হয় কবিতায়।

নদীকে কেন্দ্র করে যে প্রতিমাগুলি গড়ে তোলেন কবি, সেগুলো শুধু 'গতির আবেগ'-ই প্রকাশ করে না, পরিপূরক আরো কিছু জটিল ভাবনা বা চেতনাকেও রূপ দেয়। নদীর 'হাজার বাঁক', কূলপ্লাবী বা খরস্রোত নদীর সঙ্গে

তার দুই তটের সম্পর্ক, নদীতে জলের আলোড়ন, জোয়ার-ভাটা, তটের ভাঙা-গড়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব ও গতির বিন্যাস গড়ে ওঠে, তা প্রকাশ করে জীবনেরই দ্বন্দ্বরূপ, এমনকি কবির কাছে নন্দনের সমস্যা ও সমাধানের রূপও; জীবন ও কাব্যের দ্বান্দ্বিক জীবন্ত ও গতিশীল সম্বন্ধরূপ।

নিঃসঙ্গ বাউল খোঁজে হৃদয়ের সঙ্গীকে কোথায়
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সত্য স্বপ্রকাশ নদীর গতিতে
দুই তীরে বাহু বেঁধে জীবনের গ্রীষ্মে আর শীতে ··('কঙ্কালীতলা')

অথবা বলব

এই মন ও কলম : এ যেন বা মহানদী, গঙ্গা বা কাবেরী
নর্মদা বা গোদাবরী, সিন্ধু বা শতদ্রু, তিস্তা বা যমুনা,
টেনেসির নদী, ভাবো ভলগা, নাপার—
প্রাণস্রোতস্বিনী নদী, বিরাট জীবন
দীর্ঘ তটে তটে চলে প্রাচীন পৃথ্বীর
অতল মাটিতে জল ছলছল গতির কল্লোলে ··
জীবনে জীবন গড়ি, শত শত খাল,
কলমে কবিতা গড়ি জীবনে কবিতা,
শত শত তালদীঘি, খাল নদী, দু পাশে সোনালি খেত···
বাক্য স্রোত, শব্দ চলে জোয়ার-ভাটায়
খাড়াই উৎরাই।···
কবিতার খাল স্মৃতিতটের মুখর
কর্মিষ্ঠ স্বপ্নের রূপান্তর ·('সমুদ্র স্বাধীন')

নদী মেশে সাগরে, দ্বন্দ্বমুখর জীবন ও মনও পৌঁছয় পূর্ণতায় বা দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ পূর্ণতার চেতনায়। ঠাকুরমা-র দম্পতির মধ্যে তিনি দেখেন ইন্দ্রইন্দ্রাণীদের, 'পূর্ণসাধ' মানুষের। তাঁর স্বপ্ন পৌঁছয় লক্ষ্যে—'ধর্মঘট তেভাগার/জীবনের স্বচ্ছ আলোকদীপ্ত নীল সাগরসঙ্গম।' কঙ্কালীতলার অন্ধকার জগৎ থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ পৌঁছনো গেল আলোকদীপ্ত সাগরসঙ্গমে। তবে 'নীল' শব্দটির মধ্যে আছে বিপরীতের সংশ্লেষ বা ambivalence—কখনো 'ঘৃণার সমুদ্র নীল' বা 'রুদ্ধশ্বাস নীল শূন্য', কখনো তা নীল সাগরসঙ্গম।

সাগরেরই গান করি,

সাগরমন্থনে মেঘের মৃদঙ্গ শুনি, মানসহ্রদের

শুদ্ধ নীলে যাত্রা শুরু…

মানসহ্রদ থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার শেষ

গণ্ডোয়ানা পর্বশেষে আমাদের দেশে

শতাব্দী শতাব্দী শত মন্দাকিনী কপিলগুহায়

বিপ্লবের সমাধিতে, যেখানে মানুষ মুক্ত…

লোকায়তে অবসরে

লোকোত্তরে সম্পূর্ণ মানুষ। ('সমুদ্র স্বাধীন')

গঙ্গোত্রী থেকে যাত্রা শুরু করে সাগরসঙ্গমে 'কপিল গুহা'র শাপমুক্তিতে যে যাত্রার শেষ, কবির সমগ্র কাব্যজীবনের পুনরাবৃত্তিতে তা প্রায় প্রতীকের মর্যাদা পেয়ে যায়।

অথবা উপমা দেব

নীলকণ্ঠে; শিবের জটায় মন্দাকিনী সহস্রধারায়

অলকনন্দায় গঙ্গায় পদ্মায় ভাগীরথী স্রোতে

বঙ্গোপসাগরে ধরা অধরার বেগ

অতল অতল মাটির পাতালে সগরমুক্তির

অগম্য সে কপিলগুহায়।

আরেক ধরনের পরিপূরক প্রতিমাতেও কবি এই অভিজ্ঞতার ইতিহাসকে উপস্থিত করেন। যে আকাশ একদা ছিল 'স্মৃতিহীন উদাসীন', সেই আকাশে সূর্যপূষণ থেকে তুলে নেওয়া হোক 'হিরণ্ময় ঢাকা'। তখনই বোঝা যাবে—

আকাশের পেশী নেই, সে স্বদেশী পেশীতে চাপড়

দেয় না লড়াই নেই, বড়াই-এর মঞ্চ নেই, দেয় নাকো রড়…

('সন্দীপের চর')

সেই আকাশের তলাতেই তো 'স্বচ্ছন্দ দম্পতি', তাদের প্রাণের উৎসবে 'পূর্ণরতি চেয়ে থাকে জীবনের আকাশের নীলে।'

'প্রাণের শ্মশানে' যারা 'পিশাচসিদ্ধ' তাদের কাছে পৌঁছয় না এই বার্তা— গঙ্গোত্রী বৃথাই তাদের কানে 'ছন্দনির্ঝর' শোনায়, কারণ তারা তো জানে না

'কপিলগুহায় জীবনের শেষধারা বয়'। তাই তারা ঘুরে মরে 'শয়তানের ঘাটে ঘাটে'—চেনে না 'বৈতরণী', প্রাণের অনন্ত স্রোত'।

কবি কিন্তু পাঠককে পৌঁছে দেন শয়তানের ঘাট থেকে বৈতরণীতে। দান্তের নরক থেকে স্বর্গে পৌঁছনোর অভিযানের সঙ্গে তুলনা তো আসতেই পারে কবির এই পরিক্রমার। কবির উপার্জনও কম নয়। তিনি যেন এই প্রথম অর্জন করলেন তাঁর কাব্য-অভিজ্ঞতার নিজস্বতা, তাঁর নিজস্ব নন্দন-অভিজ্ঞতার সংজ্ঞা। তৈরি হল কাব্যোপলব্ধির ও প্রত্যয়ের এমন একটি কাঠামো, যাতে সংলগ্ন হতে পারে জীবন ও কাব্যের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা। সমগ্র চেতনা আর নিছক বহিরঙ্গ বিশ্বাস হয়ে রইল না। তাঁর নিজস্ব শব্দ বা প্রতিমা বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে সেই চেতনা অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেল। কবি যাকে বলেন 'ঘর ও বাহির', সেই ব্যাপ্তি ও অন্তরঙ্গতা, সহজ ও জটিল, উপলব্ধির এই ঐক্য এনে দেয় প্রত্যেকটি প্রতিমার অভিজ্ঞতায় নানা ব্যঞ্জনা, বহুমাত্রার বিন্যাস।

তাই কবি যখন এরপর বলেন, 'বাহিরে ও ঘরে তোমার সুষমা'—তখন অভিজ্ঞতার অনেকগুলি পরত ছুঁয়ে যান। যাকে মনে করা যেতে পারত নিছক প্রেমের অভিজ্ঞতা, তার মধ্যে এসে যায় নতুন চাপ। এই বহুমাত্রিকতার সূত্রেই কবি বলেন, 'ক্ষণিকের সহচর অক্ষয় প্রতিমা'—তখন প্রাচীন কাব্যের সুর লাগে। বলেন, 'প্রেম সে তো দ্বৈতের বিস্তার', তখন বোঝা যায় নদী-সাগরের উপমাকে তিনি কীভাবে গ্রহণ করেছেন।

> 'তোমার বাহুতে আমার জীবনস্মৃতি
> দ্বৈত রচনা, গত-অনাগত প্রীতি।…
> দেহমনে মনজীবনে ভেদ-আতুর
> রোমাঞ্চ-গান করিনি, প্রেম তোমার
> অলকনন্দা, অনন্ত-গতি তার।…
> আমার প্রাণের অশ্বত্থে বা বটে
> অচিন্ পাখির গান শোনা যায় যদি,
> গঙ্গোত্রীতে জেনো তার নীল বাসা,
> কিম্বা হয়তো আনে সাগরেরই ভাষা। ('মধ্যবয়সী')

নদীর মতোই জীবনের মতোই, প্রেমেরও সম্ভাবনা থাকে মরুপথে হারাবার। কিন্তু গঙ্গোত্রীতে যার 'নীল বাসা', সেই প্রাণগঙ্গা যেমন পৌঁছবেই সাগর-সঙ্গমে, তেমনি যে প্রেমে 'দ্বৈতের বিস্তার' সে জানে 'সাগরেরই ভাষা'।

তাই খুবই স্বাভাবিক লাগে, যখন দেখা যায়, কবি এই অভিজ্ঞতা থেকেই খুঁজে নিচ্ছেন তাঁর পরবর্তী কাব্যজীবনের পুনরাবৃত্ত শব্দ বা উপমা বা প্রতিমাগুলি। নদী-সাগর বা গঙ্গোত্রী-কপিলগুহার মতোই উমা-সতী এবং মহেশ্বর বা নীলকণ্ঠের প্রতিমাপুঞ্জ বা 'স্বপ্নবীজ' ও 'উর্মিল বিপ্লবে'র মতো প্রতীকোপম শব্দ বা শব্দগুচ্ছ তৈরি করে নিচ্ছেন এ-যুগেই। হয়তো অনুসন্ধানীরা দেখতে পারেন, এ গ্রন্থের আগেই এ শব্দগুলির কোনো কোনোটির ব্যবহার হয়েছে—কিন্তু এখানেই এগুলো একটা কাঠামোতে তাদের অবস্থান খুঁজে পেল মনে হয়। এবং এই প্রতিমা ও শব্দগুলি যে অনেকাংশেই সম্পূরক বা সমার্থক, কবির একই চেতনাকে তারা প্রকাশ করছে, তা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

আকাশের সেতুবন্ধ চোখে
অলকনন্দার গান কানে দুই তটের গতিতে,
নীলকণ্ঠ প্রাণ পায় বারম্বার উমাতে সতীতে। ('কঙ্কালীতলা')

বলা যায়, 'সন্দীপের চর' কাব্যগ্রন্থে বিষ্ণু দে-র কাব্যজীবনে এক নতুন পর্বের সূচনা—বলা যায় এখান থেকেই শুরু হল তাঁর শীর্ষারোহণ। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'সাত ভাই চম্পা' পর্যন্ত ধাপে ধাপে যে বিকাশ তাতে তাঁর পরিণতির স্বাক্ষর আছে, সন্দেহ নেই—কিন্তু তবু এ-পর্যন্ত তাঁর কবিতার ইতিহাসকে অনুসন্ধান বা অন্বেষণের ধারাই বলতে হয়। তাঁর তত্ত্বের জগৎ গড়ে উঠেছে, তিনি পৌঁছেছেন তাঁর নিজস্ব বীক্ষায়—কিন্তু তবু এখন পর্যন্ত তিনি অভিজ্ঞতার প্রকাশে সেই নিশ্চয়তায় পৌঁছন নি যেখানে গড়ে ওঠে নিজস্ব কাব্যভাষার অচঞ্চল ভঙ্গি বা কাঠামো। 'সাত ভাই চম্পা' পর্যন্ত তাই বিষয়ান্বেষণের বহুচারিতা আছে, আছে উচ্চারণের বৈচিত্র্য। কিন্তু 'সন্দীপের চর'-এই বলা যায় তাঁর আত্ম-আবিষ্কার সম্পূর্ণ হল। তাই বিষ্ণু দে-র কাব্যের বিকাশে, তাঁর পরিণত কাব্য-অভিজ্ঞতায় পৌঁছনোর পথে এ-গ্রন্থটির অভিজ্ঞতাকে মনে হয় যেন নিষ্ক্রমণের শেষ দরজা। বা অন্য জগতের প্রবেশতোরণ। অবশ্য, নিজস্ব ভাষা-আবিষ্কার ঘটল বটে, তবু এখনও রসায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে, এমন বলা যায় না। তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অন্বিষ্ট' অবধি।

আর সেটা তো স্বাভাবিকও বটে। প্রস্তুতি বা অন্বেষণের যে টেনশনে কবি এতকাল ছিলেন, এখন সেই টেনশন কেটে গেল—কবি পৌঁছে গেলেন অন্য

পর্বের নতুন টেনশনে। এবং টেনশন থেকে মুক্তির এবং অন্য টেনশনকে বরণ করার উত্তেজনা এ গ্রন্থের কবিতার সর্বাঙ্গে। নতুন মাত্রায় আত্ম-আবিষ্কারের প্রগল্‌ভ উল্লাস। ফলে কিছুটা ব্যস্ততা বা বিপর্যাস যদি ঘটেও থাকে, সেটা পরবর্তী উত্তরণেরই পূর্বাভাস।

'সন্দীপের চর' গ্রন্থের বিস্তার কি তবে এই নতুন জন্মের উল্লাস? তাই কি প্রথম আত্মপ্রকাশ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এ যেমন, তেমনি এখানেও জ্যোতির্বিজ্ঞানী উপমা বা প্রতিমার ছড়াছড়ি কিংবা 'জন্মাষ্টমী'-র বিখ্যাত লাইন দশটিতে যে বিনিদ্র প্রতীক্ষার প্রতিমা, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি? তবে, বলাই বাহুল্য, ভিন্ন সুরে। মাঝখানের অভিজ্ঞতার রেশ রয়ে যায়। 'লালদীঘি' শব্দটি তারই অভিজ্ঞান।

চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
রাত্রির আঁধারে একা জাগে নির্নিমেষ মশালে তা
নিঃসঙ্গ হৃদয় চিরকাল…
স্নায়ুর তিমিরে শেষ নির্নিমেষ বিনিদ্র রাত্রিতে
সবারই উদ্দেশ
হাজার যাত্রীতে তাই মুখর হৃদয় শর্বরী শর্বরী জাগে নিঃসঙ্গ অশান্ত
চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
শূন্য এক প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়। ('চৈত্র-বৈশাখে')
সে কথা আমিও জানি, এ যাত্রা অশেষ।
অসীম শূন্যের পথে ধাবমান নীহারিকা নক্ষত্রের ভিড়
বিরাট মিছিল ছোটে সংগীতের সংহতি নিবিড়
সেদিনের ভিড় যেন লালদীঘি যাদের উদ্দেশ
তাই চলে আন্ড্রোমিডা সহস্র সূর্যের বাহু
প্রসারিত দ্বিধাশূন্য বেগে
হাজার ঘরের টান ঘরছাড়ার বিদ্রোহী আবেগে
সূর্যে সূর্যে তারায় তারায় সহস্রধারায় লেগে লেগে
গতির আপন লক্ষ্যে অশেষ যাত্রায় ওঠে জেগে
পদে পদে অন্তহীন যাত্রার উদ্দেশ। ('সন্দীপের চর')

প্রতীক্ষার উপমা হয়েছিল 'পাহাড়ের চূড়া' বা অহল্যা ('নিঃসঙ্গ পাষাণ চিরকাল')। এবার বলছেন কবি: 'চূর্ণ হোক সে উপমা / উপত্যকা বেয়ে এসো

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ('চৈতে-বৈশাখে')। 'সন্দ্বীপের চর', 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর পর, আবার এক 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'—প্রতীক্ষার অবসান, যাত্রার শুরু। এই যাত্রার আবেগ বহুক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রতিমাকে আশ্রয় করেছে এবং সেখানেও লক্ষণীয় এ-যুগেব সর্বব্যাপ্ত প্রতিমা 'সহস্রাধারা' কিভাবে সংলগ্ন হয়েছে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ সন্দেহ নেই। আবেগের এরকম বাধাবন্ধহারা বিস্তার তাঁর কবিতায় বোধহয় আর কখনই দেখা যায় নি। প্রায় যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। কবির অভিজ্ঞতায় বিদ্যুৎসঞ্চার। দীর্ঘ কবিতা চারটির ('সন্দ্বীপের চর', 'চৈতে-বৈশাখে', 'সমুদ্র স্বাধীন', 'কঙ্কালীতলা') মধ্যে এর চিহ্ন সবচেয়ে স্পষ্ট।

কোনো কোনো অপ্রস্তুত পাঠকের কাছে মনে হতে পারে, এই শিথিল আবেগপ্রকাশ কি একটু অসংবদ্ধ? কবির মনের বিকাশের পটভূমিতে জানা সম্ভব, কেন আগের যুগেব 'নৈরাত্ম্যসিদ্ধি' বা আঁটোসাঁটো গড়নকে কবি এখানে বর্জন করলেন, কেন অন্তর্হিত হল আগের যুগের বৈদগ্ধ্যের মিতভাষণ, তথাকথিত 'অল্প বলা চাতুরি'। অনুভূতির কেন্দ্রে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে, তারই ফলে আবেগের এই বাঁধভাঙা বন্যা, শিথিলতার নিঃসংকোচ প্রশ্রয়। হঠাৎ যেন নিজের কথা খুঁজে পেয়েছেন কবি—সেই আবিষ্কারের উত্তেজনায় আসে কথার মত্ততা।

নদী-সমুদ্রের বা বৃষ্টির প্রধান থিম যেন কবিতার শরীর বা কাঠামোকেও নির্মাণ করল। বৃষ্টির মতোই ঝরে পড়ে কবিতার লাইন, ক্লান্তিহীন বিরামহীন পুনরাবৃত্তিতে। নদীর মতোই কবিতার প্রবাহ—সেরকমই ভাঙাচোরা, গড়ানো ছড়ানো, পুনরাবৃত্তিময়। সাগরে যখন পৌঁছয় তখন শব্দবন্ধে বা চরণের দৈর্ঘ্যে আসে বিস্তার। বৃষ্টিতে বা নদীস্রোতে বা সৌরজগতের নাক্ষত্রিক অতিকায়-পরিমণ্ডলে যে গতির আবেগ তাকে প্রকাশিত হতে দেখা যায় দীর্ঘ কবিতাগুলির শব্দগত চরণগত আতিশয্যে।

আর সে কারণেই স্থাননামের নদীনামের মালা আসতে থাকে, প্রতিশব্দের অজস্র ব্যবহারে কবি গেঁথে দিতে চান নিজের আবেগকে, এক প্রতিমা গড়িয়ে পড়ে আরেক প্রতিমায়, একই চিন্তার আভাস আনে প্রতিমাপুঞ্জ বা গোত্রান্তরী উপমা। প্রতিমার এই অজস্রতায় ও বিন্যাসে ও ধরনে—জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রতিমার আধিক্যের দৃষ্টান্তে—মনে পড়ে যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-র কথা, অমলেন্দু বসু যে গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছিলেন, প্রতিমার ঐশ্বর্যে সবচেয়ে ধনী[৬]।

উপত্যকা বেয়ে এসো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে, তরমুজের
চরে চরে, খরস্রোতে

সমুদ্র কল্লোলে
নিঃসঙ্গ সমুদ্রে এসো
এসো জনসমুদ্রের জোয়ারে জোয়ারে
উদ্বেল সফেন জলে অসীম একাকী
মাতৃসমা প্রতিমায় অগণিত তরঙ্গে তরঙ্গে ঘৃণা আর ক্ষমা
নীলে নীলে একাকার জীবনে জীবনে কামনায় কামনায়
মাছে ও শুশুকে মাছে কাছিমে শালিকে ··· ('চৈতে-বৈশাখে')

এ-কবিতায় ছেদচিহ্নের দরকার হয় না। কোনো কোনো বাক্য থেকে যায় অসম্পূর্ণ বা এক বাক্যের মধ্যে আরেক বাক্য অনুপ্রবিষ্ট। ছোট বড় বাক্য নিঃশেষ হয়ে থাকে [illegible] আবেগে। শব্দ বা শব্দবন্ধের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে (চরে চরে, জোয়ারে জোয়ারে, তরঙ্গে তরঙ্গে, জীবনে জীবনে, কামনায় কামনায়)। বাংলা বিভক্তি (এ, রে, য ইত্যাদি)-র পুনরাবর্তনে গতির সঞ্চার হয়।
অথচ এই বাক্যস্রোত বা শব্দের জোয়ারভাটার মধ্য দিয়েই কবি পৌঁছচ্ছেন তাঁর প্রত্যয়ের নিশ্চিতিতে। যতই উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটুক, কবি নান্দনিক সমগ্রতা পেয়ে যাচ্ছে শক্ত জমি। [illegible] দিচ্ছেন কাব্য-অভিজ্ঞতার পাকা [illegible] আমাদের।

অগ্নি ও একাগ্রতার ভাস্বরগম্ভীর, [illegible] কিংকিণির [illegible],
খণ্ড খণ্ড পাখির [illegible] সমগ্র [illegible] মুক্ত [illegible] সংহিত,
যেখানে প্রতিটি [illegible] একেকটি তড়িৎস্পর্শ। ('সমুদ্র মন্থন')

ঠিক এই সময়ে, কবি যখন নরক থেকে পৌঁছচ্ছেন স্বর্গে, তেভাগা' আন্দোলনের কৃষাণ-কৃষাণীর মধ্যে গিয়ে থাকছেন [illegible]-ইত্যাদের, আপন করে নিচ্ছেন নিজের ভাষা বা প্রতিমা, জীবন ও শিল্পের দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধপাতে আত্মস্থ করে নিচ্ছেন বিপরীতের সমন্বয়, প্রত্যহের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন রহস্যকে এবং রহস্যকে দেখছেন সহজে - তখনই প্রায় সমান্তরাল ভাবে আরো কিছু অভিজ্ঞতা তাঁর ঐ উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করেছে। এই নতুন অভিজ্ঞতাগুলো তাঁর কাব্যের পরবর্তী বিকাশেও খুব মূল্যবান।

ঐ অভিজ্ঞতার পশ্চাদপট হিসেবে তাঁর জীবনপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি থেকে কতকগুলি কালানুক্রমিক তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজনীয় :

১৯৪৪—জন আরউইনের সঙ্গে যামিনী রায়ের চিত্রসংকলনের সম্পাদনা ও ভূমিকা রচনা। পল এলুয়ার ও আরাগঁ-র কবিতানুবাদ।

১৯৪৫—'ক্যালকাটা গ্রুপ' শিল্পীসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শুভো ঠাকুর সম্পর্কে প্রবন্ধ। সেপ্টেম্বরে শিল্পী নীরদ মজুমদারের সঙ্গে প্রথম রিখিয়ায় (সাঁওতাল পরগণার একটি গ্রাম) আসেন। নীরদ মজুমদার ছাড়া সঙ্গে ছিলেন শিল্পী গোপাল ঘোষ।

১৯৪৬—ক্যালকাটা গ্রুপের ইশতেহার লেখেন ইংরেজিতে এবং নীরদ মজুমদারের চিত্রসংকলনের ভূমিকা। এপ্রিল মাসে ক্যালকাটা গ্রুপের নীরদ মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ পাল ও গোপাল ঘোষকে নিয়ে দুমকায় যান নৃতত্ত্ববিদ উইলিয়ম আর্চরের কাছে। পরে রথীন্দ্র মৈত্র ও পরিতোষ সেনও গিয়েছিলেন আলাদা। আর্চরের সৌজন্যে দুমকা-র কাটিকুণ্ডে সাঁওতালী জীবন ও নাচগানের সঙ্গে পরিচিত হন।

অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন স্ত্রীর সাহায্যে।

'আশ্বিন' মাসে 'কঙ্কালীতলা' প্রকাশিত হয় 'পরিচয়'-এ।

১৯৪৭—ভেরিএর এলুইন এর 'ফোক্ সঙস্ অব্ ছত্তিশগড়' গ্রন্থের সমালোচনা। এলুইন সংগৃহীত লোকসংগীতের অনুবাদ—'ছত্তিশগড়ী গান'। জন আরউইনের সঙ্গে 'মার্গ' পত্রিকায় 'ফোক্ আর্ট অব্ বেঙ্গল' বিষয়ে প্রবন্ধ।

'লোকসংগীত' বিষয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রবন্ধ।

বিষ্ণু দে-র সঙ্গে দেওঘর অঞ্চলের সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতির পরিচয় আবাল্য। শহরবাসের আহত স্নায়ু নিয়ে কলকাতাবাসী কবি যখন সাঁওতাল পরগনার নির্জন গ্রাম রিখিয়ায় গেলেন, তখন প্রকৃতির ঐ তরঙ্গিত লাল মাটি তার অপরূপ ও কিছুটা সুদূর রূপৈশ্বর্য নিয়ে কবিকে শুধু ব্যক্তিগতভাবেই স্নিগ্ধ করল না, তাঁর কবিতাতেও প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ স্বর দিল। প্রকৃতি সম্পর্কে কবির যে নির্বিশেষ আসক্তি জমা ছিল, এবার তার কংক্রিট রূপ তাঁর সামগ্রিক নন্দনদৃষ্টিরও অন্তর্গত হয়ে গেল। তার কঙ্কালীতলার পরিবেশে রিখিয়া তো আরো বেশি পরিত্রাণ।

যামিনী রায়ের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পের প্রতি আকর্ষণও তো তাঁর নন্দনচেতনারই অঙ্গ—উপরন্তু যামিনী রায়ের ছবিতে লোকায়ত ব্যাপ্ত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের ল্যাণ্ডস্কেপেরও নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র আকর্ষণ ছিল তাঁর কাছে। লোকশিল্প বা লোকসংগীত নিয়েও এসময় তিনি ভাবিত। অর্থাৎ ক্রমশই তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন নিজেকে শহরের বাইরে, গ্রামবাংলার বা আদিবাসীর জীবনে-শিল্পে-প্রকৃতিতে।

ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ সেটাও এদিক থেকেই দেখা দরকার। বিষ্ণু দে-র কাছে ক্যালকাটা গ্রুপের সার্থকতা বা তাৎপর্য প্রতিভাত হয়েছিল 'সজীব প্রতিরোধতীব্র টেকনিকের বিস্তার ও জীবনাভিজ্ঞ আমাদের পূর্বপরিচিত গুণাবলি'-র কারণে[৭]। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীদের রেখা ও রঙের স্বাধীন ব্যবহার, টেকনিকের প্রথাবিরোধী মুক্তি তাঁর কাছে অন্তত যামিনী রায়ের ঐতিহ্যের সম্পূরক বলেই মনে হয়েছিল। তাই রিখিয়ায় সাঁওতাল পরগনার নির্দিষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে যখন তাঁর সর্বাত্মক অন্তরঙ্গতা ঘটছে, তখন তাঁর দুই সঙ্গী ক্যালকাটা গ্রুপের নীরদ মজুমদার ও গোপাল ঘোষ এঁকে চলেছেন তেল-রঙে জল-রঙে বা প্যাস্টেলেই, প্রকৃতির রঙের সেই একরোখা মুক্তি।[৮]

বিষ্ণু দে-ও প্রথম রিখিয়ার প্রকৃতি নিয়ে পর পর যে তিনটি কবিতা লিখলেন, 'নীরদ মজুমদারের জন্য', 'গোপাল ঘোষের জন্য' এবং 'স্কেচ'—তাতে চিত্রকরের অভিজ্ঞতাই যেন ভাষায় রূপ পেল। 'নীরদ মজুমদারের জন্য' কবিতায় ফরাসী যে তিনজন চিত্রকরের উল্লেখ এল, তাদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য তীব্র রঙের ব্যবহারে এবং রিখিয়ার ভূগোলের সঙ্গে তাঁদের সমন্বয়ে কবির মনের খবর পাওয়া হয়ে যায়।

> বাবুডির আঁকাবাঁকা লালপথ মেঘে ও পলাশে শালে
> একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল…
> চিৎকাটে আজ উত্রিল্লো-মন গ্রাম্য গলির মায়া…
> লাল পথে মাতে দেরাঁার সবুজে ত্রিকূটের নীল হাতে।

ইম্প্রেসনিস্ট পিসারো রাস্তার ছবি আঁকায় বিশিষ্ট। উত্রিল্লোও রাস্তার বাঁক আঁকতে গিয়ে তাকে বিষণ্ণ মায়ায় ভরিয়ে দিতে পারেন। আর ফব্ শিল্পী দেরাঁ চড়া রং-এর সমাবেশ ঘটিয়ে সংগতি আনেন। বাবুডি বা চিৎকাট বা এমনকি ত্রিকূটের সঙ্গে যাঁরা অপরিচিত, তাঁরাও এই বিশিষ্ট শিল্পীদের অনুষঙ্গে এ-কবিতার প্রাকৃতিক মেজাজ অনুভব করতে পারবেন। আর সেই মেজাজ পূর্ণতা

পায় যখন ভেড়োয়াটাঁড়ের অন্ত্যজ গ্রামের মানুষ সম্পর্কে কবি বলেন 'পিকাসোর পেশীস্বচ্ছল সাঁওতাল'।

'গোপাল ঘোষের জন্য' কবিতাতেও জমির সেই 'তরঙ্গঘন বেগ,' 'লাল মাটি'-র বর্ণনা। আর 'স্কেচ' কবিতাতে তো স্পষ্টই দুই বোনের ছবি-আঁকার বর্ণনা—'বর্ষার ধসা লাল খাদ' বা 'মেদুর তন্বী টিলা'। ত্রিকূট ও দিগরিয়া বা দিঘারিয়া পাহাড় দুই প্রান্তে বিখিয়ার প্রকৃতিকে বিধৃত করে রাখে। তাই এই প্রকৃতির বর্ণনায় তাদের অনিবার্য উপস্থিতি। 'পরিণত' কিন্তু 'অক্ষয়' যৌবনের রূপ এই প্রকৃতিকে এমন এক পূর্ণতার মহিমা এনে দেয়, যার ফলে 'গোপাল ঘোষের জন্য' কবিতায় 'তিরিশ' শব্দের একাধিকবার চপল উচ্চারণ শুধু কবি বা কবিপত্নী বা শিল্পীদের বয়সের ইঙ্গিতেই শেষ হয় না, ফুটিয়ে তোলে 'বিন্ধ্যযুগের নগ্নমাটি'-র কল্যাণী-উর্বশী নারীরূপ।

'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া'র উইলিয়ম আর্চর, যিনি ছিলেন সাঁওতাল পরগনার ডেপুটি কমিশনার এবং সাঁওতালী জীবন সম্পর্কে উৎসাহী বিশেষজ্ঞ, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগে বিষ্ণু দে সাঁওতাল পরগনার সদর দুমকায় যান ক্যালকাটা গ্রুপের দলবল নিয়ে। আর্চর এবং এলুইন সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র শ্রদ্ধা ও উৎসাহ অবশ্য আগে থেকেই। দুমকার অভিজ্ঞতা বিষ্ণু দে-র তৎকালীন প্রাকৃতিক বোধকে আরও সম্পূর্ণতা দিল, সন্দেহ নেই, দিল আরো পরিপার্শ্বের নিকটতা—যার প্রভাব নিশ্চয়ই তার রিখিয়াজাত নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে দিল আরো ঘনত্ব। তদুপরি আর্চরের সৌজন্যে 'সাঁওতাল কবিতা' ও 'উরাওঁ গান' এবং এলুইনের সৌজন্যে 'ছত্তিশগড়ী গান'—এই সব আদিবাসী জীবনসংগীত কাব্য ও সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ পাঠে তিনি শুধু মুগ্ধই নন, ওগুলো অবলম্বনে কবিতাও রচনা করেন। তিনি জানেন, 'এলউইনের ছত্তিশগড়ী বা আর্চরের উরাওঁ বা সাঁওতাল কবিতা যে নিছক আনন্দই দেয় তাই নয়, আমাদের সাহিত্যিক প্রশ্নাবলি তোলে এবং কথঞ্চিৎ সমাধানও করে এবং সে সমাধানও প্রায় আমাদেরই।'[২]

আদিবাসী কবিতার 'বাস্তবপরিপক্ব পরোক্ষতা', তার লোকায়ত জীবনরস অথচ সূক্ষ্ম সৌকুমার্য যে সামাজিক সংহতির উপর গড়ে ওঠে, সামাজিক জীবনের যে সংহতির আকাঙ্ক্ষা ক্যালকাটা গ্রুপের ইশ্‌তেহারেও বিষ্ণু দে করেছেন, তার শিক্ষা তো বিষ্ণু দে-র কাছে এই পর্বেই সবচেয়ে জরুরি।

১. সুবল মিত্র, 'মৌভোগ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি'। তেভাগা সংগ্রাম রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি, ১৯৫৬। পৃ ১০৬।

২. দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, 'দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র'। মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৯ ব, পৃ ৭৩।

৩ মুহম্মদ আবদুল্লা রসুল 'কৃষকসভার ইতিহাস'। নবজাতক প্রকাশনী, ১৩৭৯ ব, পৃ ১৫২।

৪. শ্রী নিবাস সরদেশাই, 'ভারতবর্ষ ও রুশ বিপ্লব'। মনীষা, ১৯৫৬। পৃ ১১১।

৫. Sunil Sen, *Agrarian Struggle in Bengal 1946-47*. PPH, ১৩৭৯। পৃ. IX। অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৬. অমলেন্দু বসু, 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বাকপ্রতিমা'। 'সাহিত্যালোক', জেনারেল প্রিন্টার্স ১৩৭৯, পৃ ৫৩।

বর্তমান গ্রন্থে বাকপ্রতিমা-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিভাষার ক্ষেত্রে লেখক অমলেন্দু বসু-কে বহুস্থানে অনুসরণ করেছেন।

৭. বিষ্ণু দে, 'শিল্পপ্রদর্শনী'। 'সাহিত্যপত্র', মাঘ ১৩৫৫ ব। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', সিগনেট, ১৩৭৯ ব। পৃ ৯০।

৮. এ-সময়কার আবহের পরিচয় পাওয়া যাবে বর্তমান লেখকের 'রিখিয়ায় নীরদ মজুমদার' প্রবন্ধে ('পরিচয়', শারদীয় ১৩৭৯)।

৯. বিষ্ণু দে, 'লোকসঙ্গীত'। 'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ ব। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', পৃ. ৭৮।

'আমারও অন্বিষ্ট তাই'

সন্দ্বীপের চর'-এ পেয়েছি দেশকে আবিষ্কারের উত্তেজনা। কবি তাঁর নিজেরই বিকাশের সূত্রে নতুন জমি খুঁজে পেয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন নিজের বর্ণমালা। স্বদেশ-আত্মার সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্বন্ধের যে-ধারা আগেই শুরু হয়েছিল, 'সন্দ্বীপের চর'-এ সেই স্বদেশজিজ্ঞাসার বিস্তার ঘটেছে। নাগরিক চেতনায় যে বৈদগ্ধ্যকে অবলম্বন করে তিনি তত্ত্ববিশ্বে পৌঁছেছিলেন, 'সন্দ্বীপের চর'-এ তিনি সেই ভাষাকে ভেঙে দিলেন, নিজেকেই যেন ভেঙে দিলেন, দেশের সঙ্গে ব্যাপ্ত পরিচয়ে—'আমাদের মন বিরাট ভারত ছায়।' চিনে নিলেন গ্রাম, আদিবাসী জীবন ও কবিতা, বৃহত্তর—এবং নির্দিষ্ট—প্রকৃতি। এই পরিচয় লাভের নাটকীয় উত্তেজনা কণ্ঠস্বরে। কবির নিজের কাছে, পাঠকের কাছেও, একটা বিরাট প্রত্যাশা উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময়ে, 'অন্বিষ্ট'-তে এসে হঠাৎ যেন সুরবদল ঘটল। যে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠেছিল, হঠাৎ খাদে নেমে এল। নাটকীয় উল্লাস বা খেদ নয়—শোনা গেল খুশির আত্মলীন উচ্চারণ কিংবা বিষাদখিন্ন গাঢ় স্বর। যে লয়

নাটকীয় বিন্যাসে ক্রমশই দ্রুত হয়ে উঠেছিল, সেই লয় হয়ে গেল ধীর। নতুন অভিজ্ঞতার যে বার্তা 'সন্দ্বীপের চর'-এ পাঠকদের কাছে ঘোষণা করতে তিনি ছিলেন উৎসাহী—এখন তাকেই নিজে দেখছেন অনেক জটিল বিন্যাসে। বিশ্বাসের ঐ সরল আবেগদীপ্ত উচ্চারণ আর নয়, এখন বিশ্বাস বা আবেগ-কে চূর্ণ করে-করে, প্রিজমের মধ্য দিয়ে বর্ণভঙ্গ ঘটিয়ে তিনি প্রত্যেকটি রংকে বুঝে নিতে চান, প্রত্যেকটি অণুকে পর্যবেক্ষণ করতে চান, অনুভব করতে চান—নিজেরই জন্য—এ যেন নিজেকেই দেখা—নিজের বিশ্বাস বা আবেগের সত্যকে বা গভীরতাকে যাচাই করে দেখা। নিজেকেই প্রতিষ্ঠা করা।

এর প্রয়োজন হল কেন? কবির আত্মবিশ্বাস কি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল কোনো কারণে? তাই কি আনন্দের পাশে বিষাদ, রৌদ্রের পাশে এই ছায়া-সম্পাত? 'কালো ছায়া পায়ে পায়ে'? তাই বা বলি কি করে, কবির আজকের চেতনায় তারা তো বিরোধী নয়, সম্পূরক—বিশ্বাস বা আনন্দেরই গভীরতায় যেন স্বরান্তর!

এই বিষাদছায়া কি তবে বাইরের জগতের আঘাত? সহমর্মী সহযাত্রীর যে আনুকূল্যে আবেগ ছিল স্বতোৎসারিত, আজ কি তা প্রত্যাহৃত? কবিকে যে শোনাতে হচ্ছে বিশ্বাস ও আনন্দের কথা নিজেকেই, তা কি এই জন্যই যে বাইরের জগৎ থেকে তা নিয়ে সন্দেহ ও প্রশ্ন ছোঁড়া হয়েছে? বন্ধুর কাছ থেকে আঘাত পেয়েই কি তিনি এতদূর বিচলিত যে, সেই বিশ্বাসকে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করেই তিনি আত্ম-আবিষ্কার করতে চান—আত্ম-পরিচয়ের বনিয়াদ পাকা করে নিতে চান?

তথ্য হিসেবে আমরা জানি, 'সন্দ্বীপের চর'-এ কবির আবেগের একটা বড় ভিত্তিই ছিল সাম্যবাদী রাজনীতির তত্ত্ব ও সংগঠনের সঙ্গে নিকটআত্মীয়তা। দাঙ্গার সময়কার দগ্ধ স্নায়ু সুস্থ হয়েছিল এই বিশ্বাসের জোরেই। তেভাগা আন্দোলন, ত্রিবাঙ্কুর-তেলাঙ্গানার আন্দোলন—সবের মধ্যেই তিনি কমিউনিস্ট-দের ভূমিকাতেই দেখেছেন নতুন 'বীর'দের। কিন্তু ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনে, বিশ্বের সাম্যবাদী তত্ত্ব ও কার্যকলাপের সূত্রেই, মতবাদগত সংকীর্ণতা গ্রাস করেছিল। তারই পরিণামে শিল্পসাহিত্যনন্দনের ক্ষেত্রেও যে মতান্ধতা ও একদেশদর্শিতা উগ্র হয়ে উঠেছিল, বিষ্ণু দে-কে তার প্রতিবাদও করতে হয়েছে। শিল্পসাহিত্যের স্বভাবের মধ্যে শিবিরবিভক্ত দৃষ্টি যে গ্রাহ্য নয়, সেই অনুভবকে তিনি উপস্থিত করেছিলেন আলোচনায়-

লেখায়। ফলে সাম্যবাদী শিবিরেই, এককালের বন্ধু সহকর্মীদের কাছ থেকে যে সঙ্ঘবদ্ধ বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হল, তার তুলনা নেই। সরকারী বা বেনামা সাম্যবাদী পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রতি যে কটূক্তি বর্ষণ করা হয়েছিল অবিরলভাবে, তাতে ভাষার কোনো বাঁধন ছিল না। বস্তুত সাম্যবাদের শত্রু হিসেবেই তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছিল দিনের পর দিন।[১]

রাজনৈতিক সহকর্মীদের কাছ থেকে এই প্রত্যাখ্যান ও আঘাতই কি তবে এই বিষাদ বা স্বরবদলের কারণ? কবিতার দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর কোনো বাহ্য ঘটনাও অবশ্যই কবির মধ্যে ঘটাতে পারে পরিবর্তন, কবিতাতে আনতে পারে স্বরান্তর। কিন্তু এখানে বাহ্য কারণ এবং কবিতার নতুন স্বরের মধ্যে সম্পর্কটা বোধহয় ততদূর আপতিক নয়। সমাজ ও সাহিত্যের অন্ধ সমীকরণে যারা উৎসাহী, শিল্পের স্বাধিকার বিষয়ে বিষ্ণু দে-র দৃষ্টির যারা প্রতিবাদী, তারা তো আসলে 'সৌন্দর্যের নিয়মকানুন' বা 'বৈচিত্র্য' বিষয়েই অন্ধ। বিষ্ণু দে তাঁদের তাত্ত্বিকভাবে সংযত করতে চান মার্কসের শিল্পবিষয়ক মতামত স্মরণ করিয়ে দিয়ে।[২] অন্য দিকে, তারাই যেন নেতির পথ দিয়ে কবির আত্ম-আবিষ্কারের পথকে আরো খুলে দেয়, যা দিয়ে কাঁপিয়ে দেয় কবির সৃষ্টিমুখর সত্তাকে। কবি যেন সেই প্রতিবাদীদেরই যোগ্য জবাব দেন সৌন্দর্য ও আবেগের সূক্ষ্মতা ও বহুধা বৈচিত্র্যের জগতকে নিজের এবং তাদের চোখের সামনে মেলে দিয়ে।

আর তার ফলে সমাধান বা জবাব যেমন ছাড়িয়ে যায় তার সাময়িকতাকে, হয়ে ওঠে কবিতারই আনন্দবিষাদে বিভোর ভুবন, তেমনি অন্ধ আঘাতকে বা তার নিহিত বাস্তবতাকে আত্মসাৎ বা উৎসর্জিত করতে পারেন তাঁর নন্দন-চেতনার বিকাশে। এই ব্যাপ্ত দৃষ্টির বা উত্তরণের বীজকে তিনি এভাবেই সংগ্রহ করেন।

ব্যক্তিগত স্তরে আহতের এই বিষাদ ও তার সমাধান তাঁর নন্দনচেতনাকে সমৃদ্ধ করে, আবার এই নান্দনিক সমাধান তাঁর ব্যক্তিগত সংকটকেও দেয় মুক্তি। আর এই লেনদেনের উপর ভিত্তি করেই অবয়ব পায় তাঁর উপলব্ধির মার্কসবাদ, তার নন্দন। বিষ্ণু দে-র কাছে এই আঘাত কতখানি মর্মান্তিক, তা বোঝা কষ্ট নয়। তত্ত্বগত লড়াই তিনি থামান নি, আত্মবিশ্বাস তাঁর অটল, তবু সাম্যবাদী দলের এই আক্রমণ তাঁকে নিশ্চয়ই বিপর্যস্ত করেছিল। অথচ সাম্যবাদে, এমনকি তার সাংগঠনিকতায় তাঁর অটল আস্থা চিড় খায় নি—বরং তাঁর

একাত্মতা আরো গভীর হয়েছে—অন্তত তাঁর নিজের কাছে—আর তার ঘোষণায় তিনি কুণ্ঠাহীন। সাম্যবাদী চেতনার ও নন্দনের বিপুল সৃষ্টিশীলতাকে তিনি আরো বেশি যেন উপলব্ধি করেছেন, এ সময়েই। বোঝা যায়, উপলব্ধির কোন গরিমায় তিনি সাম্যবাদী দলের আশু সিদ্ধান্তের সঙ্গে লড়াই করে, সাম্যবাদী দলের তিক্ত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সাম্যবাদের অন্তর্নিহিত মূল্যমান সম্পর্কে তাঁর সংবেদনকে অনাহত রেখেছেন। সেই সংবেদনেরই চেহারা গোটা 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে।

ফলে, এক এদিকে আছে আহত বিবেক, প্রায় অভিমানী মন, প্রিয়জনের কাছ থেকে অন্যায় আঘাত পাওয়ার অভিমান, সহকর্মীর কাছ থেকে সাময়িক বিচ্ছেদের কারণে বিষাদ—অন্য দিকে প্রায় সেই মুহূর্তেই অভিমানে বিষাদে অন্তর্মুখী মন রাজনীতির ভ্রান্ত প্রস্তাব বা মন্ত্রণার বদ্ধ চারদেয়ালের বাইরে ব্যাপ্ত সমাজে প্রকৃতিতে মানুষে খুঁজে পায় সৃষ্টির রহস্য, অস্তিত্বের ও কর্মের বহুবর্ণ বৈচিত্র্য—জল পড়ে সহমর্মিতার ও সহানুভূতির শিকড়ে—শক্ত হয় বিশ্বাসের ভিত। অভিজ্ঞতার এই অখণ্ডতার কারণেই বিষাদের মধ্যেই লুকনো থাকে আনন্দ ও আশ্বাসের স্পর্শ। তেমনি আশা-আনন্দের সরল উচ্চারণ আর নয়, বিষাদকে তা বর্জন করতে পারে না, বর্জন করতে চায়ও না। আর তারই ফলে আগের কাব্যগ্রন্থের উচ্চ কণ্ঠস্বর আর নয়, অন্তরঙ্গ একান্ত স্বর এখানে, রৌদ্র ও ছায়ার নতুন বুনট। ভূখণ্ড আবিষ্কারের উত্তেজনাকে ছাড়িয়ে বিষাদ ও আনন্দে মাখা নিজেকে আবিষ্কার, সেই আবিষ্কারের আত্মকথন বা বড়জোর ঘনিষ্ঠ আলাপ এই 'অন্বিষ্ট'।

আর আস্তে-আস্তে তা যে আশু ঘটনাকে অতিক্রম করে পৌঁছে যায় বৃহত্তর সামাজিক সত্যে, কবির কাছে, পাঠকের কাছেও—এই উপলব্ধি যে রূপান্তরিত হয় কবির গভীরতর বহুদর্শী নন্দনচেতনায়, তার কারণ, এটা তো শুধু ব্যক্তিগত স্তরের সমাধান নয়, আশু ঘটনায় ক্রিয়াশীল ঐ অন্ধতা ও অবিচার দেশ-ছাড়া কাল-ছাড়া কিছু ব্যাপার নয়—দেশকালপটভূমির ছন্নছাড়া রূপের সঙ্গেই তা অভিন্ন। কবির বিচ্ছিন্নতাবোধও আর তাই ব্যক্তিগত আঘাত বা অভিমানে চিহ্নিত থাকে না, এই বোধ ছড়িয়ে যায় গোটা দেশের সঙ্গে সমন্বিত অভিজ্ঞতাতে। তার তা থেকেই উঠে আসে কবির আত্ম-উপলব্ধি, কবির সমগ্র কাব্যজীবনের পাওনা, বিষাদ-লাঞ্ছিত সুন্দরের ও আনন্দের বোধ। রাবীন্দ্রিক অভিজ্ঞতায় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় আধুনিক যুগের টেনশন, আধুনিক কবির

দ্বান্দ্বিক উত্তরণ—'সৌন্দর্যের আনন্দ-বেদনা', 'তীব্র বিষণ্ণ হর্ষ', কারণ তার সঙ্গে যে মিশে আছে স্বদেশের জটিল দুঃখময় অভিজ্ঞতা। দাঙ্গা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে নারকীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তাকে তো বাদ দেওয়া যায় না।

> সে আনন্দে স্বাদ নেই বিষাদে যা তীব্র তীক্ষ্ণ নয়,
> আনন্দের খাতে তাই ঘনীভূত অভিন্ন স্বদেশ।
>
> ('অভিন্ন স্বস্তিতে', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

এইভাবে সংবেদনের যে সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর জটিল কাঠামো গড়ে উঠেছে 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থে, তার পেছনে রয়েছে কবির এই মহৎ বীরত্ব ব্যক্তিগত রক্তমোক্ষণের ইতিহাসকে বৃহৎ পটভূমিতে উত্তীর্ণ করে দেওয়া। 'অন্বিষ্ট' তো কবির সেই বীরত্বেরই গাথা।

'অন্বিষ্ট'-র উপকরণ বলতে যা বোঝায়, তা প্রায় সবই পেয়েছি 'সন্দ্বীপের চর'-এ। কিন্তু এখানে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার ঘটল সংহতি, যে প্রস্তুতি বা উপস্থাপনা আগেই হয়েছিল, এখন তার মধ্যে ঘটল নতুন রসায়ন। এবং এই প্রক্রিয়ার উপকরণ হিসেবেই যেন পেলাম তাঁর জীবনের এই সব তিক্ত ও বিষণ্ণ ঘটনাবলিকেই। অর্থাৎ কবির বিকাশের ইতিহাস চূড়া স্পর্শ করল তখনই, যখন কবির জীবনের এই ঘোর সংকট কাল।

সংকটকালের সংবেদনের সেই গোপন ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করেছে 'অন্বিষ্ট'-র কাব্যভাষাকেও। 'সন্দ্বীপের চর'-এর মতো এখানেও আছে আবেগ, হয়তো আরো বেশি, তার তীব্র প্যাশন। কিন্তু 'সন্দ্বীপের চর'-এ যেহেতু বিচ্ছিন্নতা অনুপস্থিত, তাই সেখানে প্রকাশ পায় আবেগের স্ফূর্তি, আবেগের টানা প্রবাহ। 'অন্বিষ্ট'-তে সেই আবেগের ধ্বনিতীক্ষ্ণতা অনেক নামানো। 'সন্দ্বীপের চর'-এ ছিল লিপ্ত অংশগ্রহণের প্রতিক্রিয়া—'অন্বিষ্ট'-তে নির্লিপ্ততা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু পরিণততর অভিজ্ঞতার চাপে যেন সামান্য নির্বেদ তৈরি হয়, আঘাত পাওয়ার বেদনা থেকে। প্রত্যক্ষ সহমর্মী পাঠক এখানে নিরুদ্দেশ, বা বলা যায়, কবি বিতাড়িত। ফলে, 'অন্বিষ্ট'-র টেনশন অন্তর্মুখী নাটকের। কবি যেন নিচু গলায় স্বগতভাষণ করছেন, বা বড় জোর কথোপকথন চালাচ্ছেন সীমিত পাঠকের সঙ্গে বা হয়তো ভাবী পাঠকের সঙ্গেই। কথোপকথনের বা বাচনের সেই বৈশিষ্ট্য—অন্তরঙ্গ গাঢ় স্বর—ফুটে উঠেছে বাক্যগঠনের ধরনে।

এই গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির কথাই ধরা যাক – যার নামও 'অন্বিষ্ট'। প্রথম কবিতা, দীর্ঘতম কবিতা, মনে হয় যেন এ-সময়েরই কবির ইশ্‌তেহার। কবিতাটি আরম্ভই হয়েছে নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে। প্যাশনের এই প্রশান্ত উপস্থাপনাই কবিতাটির প্রধান মেজাজ। ফলে, আবেগের যে সহজ গড়ানো গতি আছে, তাকে কিছুটা এড়িয়ে যেন এর বাক্যক্রমকে এনে ফেলা হয়েছে দীর্ঘ কথনের কাঠামোয়, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার অবিচ্ছিন্ন আবর্তনে। এক কথা থেকে ঘুরে ঘুরে আসে অন্য কথা, অথবা হয়তো কখনো কখনো একই কথা—কথার গুঞ্জন।

কথার চালে মেশানো থাকে অনেক অভিপ্রায়। লিখিত ভাষার ব্যাকরণকে মানলে তাকে হয় একাধিক সরল বাক্যে ছড়িয়ে দিতে হয়, অথবা উপবাক্য বা প্যারেনথিসিসের বিন্যাসে বাক্যকে জটিল রূপ দিতে হয়। কিন্তু মুখের ভাষায় অংশগুলির নৈকট্যই প্রধান বিবেচ্য, এমনি সমস্ত বাক্যটিই হতে পারে অসমাপ্ত বা ছিন্ন বাক্যাংশের একটি স্বাভাবিক নকশা।

কিংবা কথনের চালে লাফিয়ে চলা যায় এক বাক্‌প্রতিমা থেকে আরেক প্রতিমায়, এক ইন্দ্রিয় থেকে আরেক ইন্দ্রিয়ে—প্রতিমার শৃঙ্খলায় বা গোত্রান্তরী প্রতিমায়। 'এলুয়ার' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে লেখেন: 'আমরা আমাদের ঘনিষ্ঠ আলাপে দেখি যে দু-জন মানুষ কথা বলতে গিয়ে পর্বে পর্বে যুক্তি বা ন্যায় সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করে কথা বলে না। একজন অবলীলাক্রমে বলতে পারে, আকাশ দেখ কী কালো। আর একজন বলতে পারে, মাটির গন্ধে বুক ভরে এল। ব্যাখ্যা করতে হয় না রং থেকে গন্ধ, আকাশ থেকে মাটিতে যাওয়ার পর্বটা। মানবিক আবেগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো বেশি মধ্যপদলোপী হয়ে যায়, অধিকন্তু পারস্পরিক পরিচয়ের অনেক ইঙ্গিত, প্রতীক, কল্পপ্রতিমা এসে পড়ে, যেমন এসে পড়ে অতীত ও বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অঙ্গাঙ্গিতা। এমনকি ব্যাকরণও প্রথাসিদ্ধ চালে চলে না।'[১]

'সন্দ্বীপের চর' ও 'অন্বিষ্ট'-র তুলনা আরেকবার করা যায় এই সূত্রে। 'সন্দ্বীপের চর'-এ বাক্যস্রোত অভিপ্রায়ের দিক থেকে বিচার করলে অনেক ক্ষেত্রেই একরেখার – একই লাইনে চলে—সেখানে বাক্যগুলি, বাক্যাংশগুলি বা শব্দ ও শব্দবন্ধগুলি অনেক সময়ই সমার্থক—সেখানে একই প্রতিমার বা প্রতিমাপুঞ্জের অনুবর্তন। তারা আবেগের বিভিন্ন পর্দাকে প্রকাশ করে মাত্র, কিন্তু বাক্যের অভিপ্রায়ের দিক থেকে তারা এক। ফলে সব মিলিয়ে আবেগের একটা নাটকীয় উত্তেজনা প্রায় সব সময়ই থাকে। কিন্তু 'অন্বিষ্ট'-তে বহু জায়গায়

ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ের বাক্যাংশের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন সংযোগে, কিংবা ইন্দ্রিয়-চেতনার প্রকৃতিপরিবর্তনে ও প্রতিমাশৃঙ্খলের বহুধা বৈচিত্র্যে বাক্যের একটি স্বতন্ত্র বহুমাত্রিক স্থাপত্য তৈরি হয়।

কাকে বলো প্রাত্যহিকে তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
কখনও একাগ্র ঝঞ্ঝা কখনও উন্মনা শুকতারা
নিদ্রাহীন আমার আকাশ ? ..
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে লেগে
আমার অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।...
অবিরাম হানা দাও একান্ত সত্তায় তুমি
প্রাকৃতিক অবুঝ...

আবেগের দৃশ্যমান স্রোত এখানে ছেদচিহ্নের দ্বারা প্রায়শই প্রতিহত, সে ছেদচিহ্ন আক্ষরিক-অর্থে ব্যবহার করা হোক বা না হোক। অথচ দ্বিতীয় উদাহরণের ৪র্থ লাইনে একাধিক বাক্যগত অভিপ্রায়ের সমাবেশ, বা তৃতীয় উদাহরণের ১ম লাইনে 'একান্ত' শব্দটির প্রয়োগে অন্য মাত্রা আনার প্রয়াস— এ সবের ফলে কবিতাতে বরং একটা অনায়াস সারল্য এসেছে—কেননা বিন্যাসের এই স্বকীয়তা তো আকস্মিক বা খামখেয়ালিপনা নয়, মানুষের কথনস্বভাবের স্বাকৃতি।

'অন্বিষ্ট' গ্রন্থে বা কবিতাটিতে বাক্যের এই ভঙ্গি সবত্রই লক্ষ্যগোচর এমন হয়তো নয়। বস্তুত বহু জায়গায় 'সন্দ্বীপের চর'-এর কাছাকাছি আবেগের প্রবাহও আছে। কবিতা যতই এগিয়েছে, ততই আমরা তা পেয়েছি। কিন্তু সেখানেও প্রবাহ সংযত অন্য নানা ভাবে—ছন্দের পরিবর্তনে, স্তবকের মিতায়তনে, উচ্চারণের শান্ত প্রক্ষেপে।

'সন্দ্বীপের চর'-এর আবেগে যে আলংকারিকতা ও নাটকীয়তা আছে, হয়তো

প্রেরণার প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে, 'অন্বিষ্ট'-তে সে-আবেগ অনেক সংযত ও শুদ্ধ—কারণ বাক্‌প্রতিমার ইঙ্গিতময় চলনেই বাহিত হয় এই আবেগ। কবিতার শিকড় প্রোথিত দেশকালের বাস্তবতায়, অথচ কবিত্বের তন্ময়তায় ফুটে ওঠে 'আধুনিক এক সজাগ মনের গীতিকাব্যিক ভাষা'।[৪] উদ্ধৃতিটি বিষ্ণু দে-ই ব্যবহার করেছেন এলুয়ার-প্রসঙ্গে, এবং এলুয়ারের অভিজ্ঞতার শিক্ষা এ সময়ে কবির কাছে সবচেয়ে মূল্যবান—যদিও দুই দেশের দুই ঐতিহ্যের কবির সমাধান মোটেই তুল্যমূল্য নয়।

'অন্বিষ্ট' কবিতাটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অংশের মধ্যে আছে আবার অনেক বিরতিচিহ্ন। (আলোচনায় উল্লেখের সুবিধার জন্য এই অংশ ও ক্ষুদ্রাংশগুলিকে ১ক, ১খ, ২ক, ২খ এইভাবে বলা হল)। এই অংশ ও খণ্ডাংশগুলি নিয়ে দীর্ঘ কবিতার যে কাঠামো তৈরি হয়েছে, তা কোনোভাবেই ইওরোপীয় সিমফনির সঙ্গে তুলনীয় নয়। বরং ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের মতো নির্দিষ্ট কয়েকটি স্বর স্বাধীন বৈচিত্র্যে বিন্যস্ত হতে থাকে। একে অন্য ভাষায় বলা যায় তাঁর অন্তর্নাটকের কুশীলব। 'তুমি' 'আমি' 'ওরা' এই তিনটি 'চরিত্রে'র আবর্তনে গড়ে ওঠে এই বিন্যাস। চতুর্থ আরেকজনের উপস্থিতিও সব সময় অনুভব করা যায়, যাকে একটি অংশে ৩গ) কবি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন 'বিজ্ঞ' বলে।

'তুমি'-র বহুমাত্রিক সংগঠন তো কিছুটা আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। কবির রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক দীক্ষা বা সামগ্রিকভাবেই জীবনদীক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী কবির ব্যক্তিগত প্রেম। সমস্ত কবিতাটিই মনে হয় যেন প্রেমিকার কাছে কবির একান্ত উচ্চারণ। শ্রোতা তাঁর সেই প্রিয়জন, যাঁর প্রতি তাঁর দীর্ঘ অনুরাগকে সন্দেহের বিষয় করে তোলা হয়েছে, কবিকে তাই অনুভব করে নিতে হচ্ছে সংরাগের ঐকান্তিকতা। স্পষ্টই বোঝা যায়, এর ইঙ্গিত বহুদূরপ্রসারী। সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁর আনুগত্যকেই যখন আজ প্রশ্নের বিষয় করে তোলা হয়েছে, তখন তীব্র জ্বালায় নয়, বিষণ্ণ প্রত্যয়ে কবি তাঁর সাম্যবাদী জীবন-বিশ্বাসের অটল রূপকে মেলে ধরেছেন। বিভ্রান্তির এই যুগে আর কারো কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের দায় তো কবির নেই—নিজেরই বিশ্বাসের কাছে ছাড়া। তাই আমাদের কবিও, বৈষ্ণব পদাবলীর কবির মতোই, সম্বোধন করেন সেই দয়িতকে, যার অংশ তিনি নিজে এবং যাতে মিলিত হওয়াই তাঁর লক্ষ্য। তাকে

পাওয়াই তো কবির চরিতার্থতা, স্বরূপকে পাওয়া, তাঁর রাজনৈতিক বা জীবনগত আদর্শের পূর্তি, খণ্ডতার মুক্তি। বলাই বাহুল্য, এদিক থেকে আধুনিক কবির কাছে প্রাসঙ্গিক ফরাসী সাম্যবাদী কবি এলুয়ার বা আরাগঁ-র দৃষ্টান্ত—কারণ তিনি জানেন, 'প্রেম ও মানবিকতা বা সাম্যবাদ এলুয়ারের কাব্যে কী অভিন্ন রূপ নিয়েছে।' আর আরাগঁ 'সুররেয়ালিস্ট আভাসে ইঙ্গিতে আইন উড়িয়ে ফ্রান্সের কথা বলেন, তাঁর প্রেমের কথাও।' কিংবা আরাগঁ-র কবিতায় 'রূপসী কবিপ্রেয়সী হয়ে ওঠেন জাতীয় গাথার প্রিয়া—স্বাধীনতা।' এখানে বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও 'তুমি' হয়ে উঠেছে তাঁর সাম্যবাদী স্বপ্নাতত্তির রূপ, কবির প্রেয়সীরই সঙ্গে অভিন্নতায়।

আর অন্য দিকে 'আমি'—সেই বহু-লাঞ্ছিত কবিসত্তা, পার্টির ফতোয়ায় যে-সত্তাকে বারবার নিগড়ে বন্দী করার চেষ্টা হয়েছে। কবি জানেন, পার্টির আইনকানুনে শিল্পের আইনকানুনকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা কী বিপর্যয়কর! পার্টির অভ্যন্তরে সাময়িকভাবে ব্যাপক লড়াই চালাতেও হয়েছিল তাকে। [illegible] যান্ত্রিক সাহিত্য-বিচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশে তিনি একটু বড় হাতিয়ার করেছিলেন ফ্রান্সের কমিউনিস্ট নেতা গারোদি-র শিল্পসাহিত্যবিষয়ক মতামতকে।[৫] এলুয়ার বা আরাগঁ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি বারবার উদ্ধৃত করেছেন মার্কসের উক্তি—কেননা মার্কসের কথাতেই তো আছে শিল্পসাহিত্যে কর্মীর অধিকারের স্বীকৃতি, সব রকমের যান্ত্রিকতার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি। তিনি জানেন, প্রতিবাদী মার্কস বলেন, 'আপনি প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্য, তার অশেষ ঐশ্বর্যের প্রশংসা করেন। গোলাপের গন্ধ ঠিক ভায়োলেটের মতো হবে এ দাবি আপনি করেন না। কিন্তু সকলের চেয়ে ঐশ্বর্যশালী যে আত্মিক জগৎ তাকে কিন একটিমাত্র রূপে থাকতে দেওয়া হবে?…সূর্যের প্রতিফলনে প্রত্যেকটি শিশিরবিন্দু অশেষ বর্ণবৈচিত্র্যে ঝলমল করে। আত্মার সূর্য—কত অসংখ্য বিচিত্র ব্যক্তি-মানুষ ও বস্তুর উপরই না এসে পড়ে কিন্তু তবুও তাকে একটিমাত্র রংই—সরকারি রং সৃষ্টি করতে হবে?'[৬] এই বিতর্কের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে 'অন্বিষ্ট'-র কাব্যঅভিজ্ঞতা। 'অন্বিষ্ট' কবিতাটি শুরুই হয় এই ভাবে:

> আমারও অন্বিষ্ট তাই
> আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
> প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক সুরে সুরে
> বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্ণা…।

'আমারও' শব্দের 'ও' অক্ষরটিতেই আছে আক্রান্তের আত্মসমর্থন—মরিয়া

আত্মসমর্থন নয়—বরং ফুটে উঠেছে নিরুত্তেজ গাঢ় প্রত্যয়। লাঞ্ছনার কারণে কণ্ঠস্বর হয়তো কিছুটা অভিমানক্ষুব্ধও। কিন্তু সত্যের বিকৃতির জন্য যারা দায়ী, তাদের সম্পর্কে তিক্ততা নয়, বরং বিরোধীভাবে হলেও তাদের সঙ্গে সংলগ্ন থাকতে চেয়েছেন যেন কবি এই শব্দটিতে। শুধু সচকিত করাতে চেয়েছেন আত্ম-কথনে বা একক কথনে, মার্কসীয় জীবনবিশ্বাসে সৃষ্টির যে অনন্ত বৈচিত্র্য বা মানবিক সৌন্দর্যবোধের যে অনন্ত সম্ভাবনা স্বীকৃত, তার স্বরূপকে। মার্কসীয় বিশ্ব-বীক্ষায় তার ভবিষ্যৎকল্পনায়, আর্থনীতিক ভিত্তির উপর সৌধের স্বাধিকারে, হাত ও মাথার সৃজনশীল ঐক্যে, দ্বন্দ্বের মূর্ত বিকাশে বাস্তবের সমস্ত স্তর খুলে যায়, উন্মোচিত হয় আবেগ ও সংরাগের সব রং, সৌন্দর্যের সব কটি মুখ : এই চেতনা বা অনুভূতিই 'অন্বিষ্ট'-তে কবিকে দিয়েছে বিজয়ীর গৌরব—সব লাঞ্ছনা ও বেদনার মধ্যেও।

'ওরা', সেই রবীন্দ্রনাথেরই 'ওরা', শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণ, যাদের কর্মময় অভিজ্ঞতাতেই সম্ভব এই সৃজনবিরোধী বদ্ধ তাত্ত্বিকতার চোরাগলি থেকে মুক্তি। এই নাটকে 'ওরা'-ই জোগায় বাস্তবতার ব্যাপ্ত পটভূমি (২ক)। 'আমি'-র সঙ্গে 'তুমি'-র সংযোগকে সম্ভব করে তোলে 'ওরা'-ই।

> তার মাঝে আসে ওরা
> দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে রুজির সংঘাতে···
> ওদের পায়ের তালে মাটির আবেগ
> ওদের উন্মুক্ত চোখ নীরব সংহত···
> ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
> ওরা চলে বলিষ্ঠ আওয়াজে···।

বোঝা যায় 'তুমি'-র ঐ সামাজিক রূপই 'ওরা'—তাই প্রকৃতির সঙ্গে তাদেরও ঐ একাত্ম সংযোগ। ওরাই কর্মহীন বিরস দিনকে করে দেয় সরস 'রচনার দিন'।

এই নাট্যে বিরোধী শক্তি একমাত্র 'বিজ্ঞ'। রাজনৈতিক তত্ত্বের বদ্ধ চার-দেওয়ালের মধ্যে তার বাস। কবি যে বিশ্বাসে এই কবিতাটি শুরু করেছেন 'আমারও অন্বিষ্ট তাই'—সে 'আমি'-কেও বিজ্ঞের অবিশ্বাস, তার অন্বিষ্টকেও। বলা বাহুল্য, 'বিজ্ঞ' শব্দটি ব্যঙ্গমূলক। কিন্তু তবু গদ্য-অংশে প্রত্যেক স্তবকের শেষে 'বিজ্ঞ' শব্দটির উচ্চারণ বিদ্রূপ নয় শুধু, বিষাদের মতোই শোনায়। কবির সঙ্গে তাঁর অন্বিষ্টের দীর্ঘ সম্পর্কের ইতিহাসকেই উড়িয়ে দিতে চায় বিজ্ঞ। তাই তুমি-আমি-র মিলনসংগীতে প্রত্যেক স্তবকের শেষ লাইনে উচ্চারিত হয় : 'বিজ্ঞ

বলে, এ বুর্জোয়া চাল', 'বিজ্ঞ বলে বলুক না দালাল' কিংবা 'বিজ্ঞ ঘাটে জমায় জঞ্জাল'।

এই চারটি চরিত্র বা উপাদান নিয়েই চতুরঙ্গ নাটকটি এগিয়েছে দীর্ঘ কবিতার নিজস্ব আঁকাবাঁকা গতিতে। এক প্রান্তে 'ওরা' এবং আরেক প্রান্তে 'বিজ্ঞ' ধরে রেখেছে এর বিস্তৃত ও সংকীর্ণ পটভূমি। আর তার মাঝখানে 'আমি' ও 'তুমি'-র নানা সম্বন্ধপাত।

কবিতার প্রথম থেকেই দেখা যায়, শুধু সূর্যোদয়ের বা যাত্রার বর্ণনা নয়, বরং সঙ্গে সঙ্গে সূর্যাস্তের ও ঘরে-ফেরার ছবি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। সূর্যোদয়ে শুধু নয়, সূর্যাস্তেও রঙিন অস্তিত্বের কথা উঠছে। বোঝা যায়, কবির 'নতুন ভাষা' বা 'নতুন আশা' ছাড়পত্র পাচ্ছে 'দিনান্তের ছায়া'য়, 'নিভৃত বনের মৌনে'। বেদনার এই পটভূমিতেই কবি দেখতে পাচ্ছেন আশার আরো বড় এবং গভীর রূপ—'জটিল আনন্দে আর বেদনায় বিস্তৃত চেতনা'।

আর তখনই আবির্ভাব হচ্ছে 'তুমি'-র (১খ)। আষাঢ় বা শ্রাবণের সজল মেঘ বা বর্ষণ, মাঘের শীতে স্ফটিক স্বচ্ছ দিন আর সরল আশ্বিনের উজ্জ্বলতা—ঋতুর বৈচিত্র্যের সঙ্গে অন্বিত হয়ে যায় আকাঙ্ক্ষার নানা রূপ। কবির প্রেম বা সাধনার স্ফূর্তি বোঝাতে বারবার আসে 'হাওয়া' শব্দটি, আর পুনরাবৃত্ত 'আকাশ' সেই ঈপ্সিতেরই বিস্তৃত শরীর। শুধু দৃপ্ত রূপ নয়, অভীষ্টের স্বপ্নিল রূপটিও কবি দেখতে চান, পেতে চান তাকে সর্বাঙ্গীণতায়। তাই দয়িতকে 'নিদ্রাহীন' কবি বলেন, 'ঘুমাও ঘুমাও তুমি।' দেখতে চান তাকে 'চাঁদনীর প্রান্তরে, পাহাড়ে, পলাশবনে, ছায়াপথে, ঝর্ণাধরা ঝিলে' (১গ)।

কবিতাটিতে বারবার হানা দেয় বর্তমান জীবনের গ্লানি—'একঘেয়ে দুপুরের রাজপথ', 'স্নায়ুর জ্বালা', নরকের 'ভয়াল নিবিড় শূন্যতা'। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে কবির তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি—যার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ত্যাগ সামান্য, কর্মীও নই, তাও ঠিক।' আর এই গ্লানি ও তিক্ততার চাপে ঘটে যায় 'তুমি'-রও রূপান্তর—শব্দে আসে বৈচিত্র্যের ও বিপরীতের সংশ্লেষ। তাই কবি যেমন বলতে পারেন, 'আমি একা একা ভাবি ছোট ছোট সুখে', যদিও হৃদয় বিস্তৃত। কারণ কবির মনে হয়, তাঁর সংগীত শোনার সময় আজ কারো নেই। এ শুধু অভিমান নয়—'তুমি'-র সঙ্গে চাওয়া-পাওয়ার, একাত্মতার ও দূরত্বের একটা নতুন সম্পর্ক বিন্যাস তৈরি হয়—কবির অভীষ্টের 'তুমি' ও নিষ্ঠুর বাস্তবতার 'তুমি'-র একটা জটিল সম্পর্ক। রবীন্দ্রভাষার অনুসরণে বলা যায়, এ বড়-'তুমি'

এবং ছোট-'তুমি'-র সংঘাত। কবি বড়-তুমি-র সঙ্গে একাত্ম, শুধু আজ নয়, দীর্ঘকাল ধরে—আজ ছোট তুমি তাকেই অগ্রাহ্য করতে চায়। কবি তাই প্রায় অভিমানী প্রেমিকের শব্দবন্ধে বলেন, তোমাকে আমি চিনি, কিন্তু তুমি জানো না আমাকে, আমার আত্মদানকে। ২য়-অংশটি সেই আহত সংবেদনেই রচিত।

> তোমার না-জানা আমার নিত্য আত্মদান / তুমি জানো নাকো আছি / তুমি চেনো নাকো তোমার পাশের কে সে / তোমার না-জানা সহচর / তোমার না-জানা দিনরাত…।

অথচ কবি তো সেই 'তুমি'-কে ঘিরে রয়েছেন। বারবার কবিতাতে 'বাহু' শব্দটির প্রয়োগে সেই নিবিড় ঐক্য রূপ পায়। কিন্তু আজ সেই 'তুমি'—যে রূপেই হোক—কবিকে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করছে।

> পড়োশীরা হাসে, জানে ভিন্-গাঁয়ে লোকে…।

এই ছোট-'তুমি'-র উপেক্ষা সত্ত্বেও কবির কাছে অবিশিষ্ট যে তার অম্লান রূপ নিয়ে থাকে, তার কারণ প্রকৃতির ব্যাপ্ত পটভূমিতে কর্মী মানুষের সক্রিয়তায়, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিদ্রোহী লড়াকু মানুষের সংগ্রামে ও আত্মত্যাগে সেই 'তুমি'-র বড় মুখ তিনি দেখতে পান। দু-চোখে উন্মীলিত স্বপ্ন নিয়ে যে নারা লড়াই করে শহিদ হয়েছিলেন (নতরা সেন), তাঁর অকাল মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েই কবি পান ঐ 'তুমি'-র অম্লান পরিচয়—'প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী'-র নিথর দেহে। তাই কবির মনে যদি বিচ্ছেদের হাহাকার বেজেও ওঠে, সে-হাহাকার 'ঊর্মিল বাজকম্প্র'—মিলনের সম্ভাবনা তাতে আরো অনিবার্য।

আর এই সংগ্রামের আবেগেই 'তুমি'-র কুয়াশাচ্ছন্ন রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রূপকথার জগতে তুমি-আমার এই দ্বন্দ্ব বিন্যাস নিশ্চয়তা পায়। বন্দিনী রাজকন্যা, ব্যর্থ প্রহরী, নীলকমল-লালকমল যে আসলে কাঠকুড়ানির ছেলে—তাই সমাধান অতিশয় তিক্ত (৩য়)। সেই নীলকমলরা আজ 'তরুণ কুমার', 'মাথা কোটে মরিয়া আবেগে' (৩য়)। অবশ্য তেভাগা আন্দোলনের প্রাকৃত দেবতা তারা নয়, তাই নীলকমলের আজ নতুন রূপ—তার আবেগ 'মরিয়া', 'অন্ধ'। একি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের পথভ্রষ্টতারই ইঙ্গিত, তাই কি শেষ স্তবকে অন্ধ আবেগকে চক্ষুদানের কথা বলেছেন কবি, পাষাণকে প্রাণ দান? না কি রক্ত-মোক্ষণের যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই কবি খুঁজে নিতে চান উজ্জীবনের ভাষা?

অর্থাৎ আশার রূপও আজ নির্মল নয়, তবু এরই মধ্যে সাময়িক রাজনীতির

ক্ষুদ্রতা, বর্জননীতি, লক্ষ্যহীন অভিযানকে অতিক্রম করে কবি পান সত্যের বিরাট যাত্রা বা অভিযানের আভাস—'তোমার উর্ধ্বযান রথ' ৩১। বলতে পারেন, 'আমাদের উপমেয় নদী', ইলোরার ভাস্কর্যনির্মাণে প্রতীক খোঁজেন মানুষের ভবিষ্যৎ-নির্মাণের, আর বিজ্ঞের শাসন উপেক্ষা করে কুণ্ঠাহীন ঘোষণা করতে পারেন তুমি আমি-র অদ্বৈত—বারবার উচ্চারণ করতে পারেন বহুদিনের চেনার গর্ব ও নির্ভরতা।

তোমার বাহু পেয়েছি বাহু ডোরে
তোমারই চোখ নিজের চোখে জ্বালি।

কবিতার চতুর্থ ভাগে এসেও দেখছি এই আবেগ নিরুদ্ধ হচ্ছে কবির স্বতন্ত্র অবস্থানের উল্লেখে—উঠছে তফাতের কথা, ত্রুটির কথা—'বহু মৌন ব সরব বাদ-বিসংবাদে'র কথা। কবি বলছেন, 'আমাদের অনেক তফাৎ।' তিক্ততার 'ভাঙা পাঁচিল' তারই প্রতিমা। কিন্তু সেই ভাঙা পাঁচিলের পাড় বেয়ে চলে আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর।

অতএব বিস্মরণ অসম্ভব, কবি তা চানও না। তবে কি নেতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তিনি অন্বিষ্টকে পাবেন? বর্তমান সভ্যতার ধ্বংসের চেহারা কবির চোখের সামনে—চতুর্থ ভাগ শুরুই হয় প্রত্নতত্ত্বের ধ্বংসনমুনার বর্ণনায়। তবে কি কবি তারই মধ্যে পেতে চান 'তুমি'-কে? এই কি আধুনিক কবির অন্বিষ্ট? 'ধ্বংসেই বাসর'? সহজ যান্ত্রিক তাত্ত্বিক 'তুমি'-কে নয়—ধ্বংসকে ভঙ্গুরতাকে বাদ দিয়ে নয়। তাই কি আধুনিক শিল্পীকে 'নৈর্ব্যক্তিক সত্তা' লাভ করার অভিযানে এই অনিবার্য মধ্যবর্তী স্তর পার হয়ে যেতে হবে, যেখানে পিকাসোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সুন্দরী তন্বী হয়ে যায় 'ছিন্নভিন্ন উরুবাহু-হাত'? এই ভাবে নরক পার হয়ে তবেই তিনি পৌঁছবেন সমুদ্রে? তাই কি নরকের যন্ত্রণার পরিচয়লাভও সমান বৈপ্লবিক—যুদ্ধের মধ্যেও থাকে ঘরবাঁধার স্বপ্ন?

কবি যখন বলেন 'নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক', সমুদ্রের ডাক শোনেন, তখনও মরুভূমির আকস্মিক আক্রমণে সংশয়ের ছায়া নামে: 'তুমি আর নয় কি আমারও?'

এইভাবে শাদা-কালোর দ্বান্দ্বিক সংঘাতেই আশার আজকের রূপ গড়ে ওঠে—'ব্যক্তির বিন্যাসে নব স্বতন্ত্র আশা' যেখানে 'ভালোমন্দ জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রণা', 'যেখানে শরীরমনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আতত ছিলা।'

মনে হয় এই অন্তর্নাটক চরম শীর্ষে পৌঁছয়। আততি ভেঙে পড়ে প্রাপ্তির

আনন্দে (৪৬), যেখানে 'বধির বিপ্লবী সুরস্রষ্টা' বেটোফেনের রচনা 'তেম রুপে' বেজে ওঠে প্রায় পরিত্যক্ত উৎসবগৃহে। এই উৎসবগৃহ ত্যাগ করে গেছে বিজ্ঞজনেরা—'মানুষের প্রাণের উৎসব' শুধু একান্তে, প্রায়ান্ধকার ঘরে। এখানেই সংগীতের তুঙ্গ মহিমায় 'আমার দুচোখে তুমি দুইচোখ।' তুমি এবং আমি-র ঐক্য সম্পূর্ণ—'দ্বৈতের একতা'—অনন্ত সম্ভাবনার আবর—'বীজকল্প'। এখানেই 'শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা সাবালক, মানবিক, মানুষের আপন স্বভাবে।' শিল্পের উপলব্ধিতেই পৌঁছনো গেল মানবিক বোধের পূর্ণতায় - 'ভেদের মিলনমৃত্যু' তে।

আর অনুভূতির এই চরম মুহূর্তেই উঠে আসে কবির অন্বিষ্টের সেই চিরপুরাতন চিরনূতন মূর্তি –'অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাত' তনু। কবি তাকেই চান আজ সহচরী সঙ্গিনী রূপে— অনেক জটিল অভিজ্ঞতা ও গ্লানির মধ্য দিয়ে এই পাওয়া, অনেক অভ্যাসিকতার বর্জনের মধ্য দিয়ে এই পাওয়া, দৈনন্দিন যন্ত্রণা ও সংগ্রামের জমিতে এই পাওয়া। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থে যার আভাস পেয়েছিলাম, সেই প্রিয়তমাকেই পেলাম অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কবির কণ্ঠে তাই নতুন আবেগ আবার অনুরণিত হয়ে উঠল :

মৈত্রী দাও সহচরী ছন্দে ছন্দে কর্মে প্রাণে
মোহানায় প্রেমের প্রয়াণে
মুক্তি দাও হৃত্তে হৃত্তে তোমার বাহুতে
মেরুতে মেরুতে দাও পাখার সঞ্চার
তরঙ্গে তরঙ্গ ভেঙে অন্ধকার ভেঙে সুরঙ্গমা
অত্যাচারে অনটনে তোমার স্বরের দীপে অমাবস্যা
দীপাবলি হোক⋯।

এই হল 'হিরণ্ময় সত্যের বাটিতে উন্মুক্ত নির্ঝরের মুখ', এই হল 'মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা'। এরই ফলে অভিজ্ঞতার প্রবীণতা সত্ত্বেও 'মাদুর ঘাটিতে/অম্লান পিপাসা আজও'—কালো ছায়া পায়ে পায়ে, তবু দুই চোখে নশ্বরের অমর প্রত্যাশা। এরই জোরে কবি বলতে পারেন যে 'তুমি'-কে তার সব জটিলতা নিয়ে পেয়েছেন, তাকে বাস্তব জীবনে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সংকল্পের কথা।

তোমাকে তাই তো চাই, খুঁজি চলো পাহাড়,
মানুষ।

মানুষ যখন পাহাড়ের মহিমায় সম্পূর্ণতায় পৌঁছবে, তখনই শেষ হবে এই অন্বেষণ।

এই কাব্যগ্রন্থের একটা প্রধান কথাই তাই অন্বেষণ। 'সন্দ্বীপের চর'-এ যাকে মনে হয়েছিল কিছুটা সহজ, এখানে এসে দেখা গেল তা বেশ জটিল। এই অন্বেষণ নানা স্তরে। কবি কী চাইছেন তা যেমন গড়ে উঠতে থাকে, তেমনি বর্তমানের রূঢ় বাস্তবে তাকে পাওয়াও তো দুঃসাধ্য। কবি খুঁজে চলেছেন এই চাওয়া ও পাওয়া-না-পাওয়া দুয়েরই অবয়ব।

'১৪ই অগস্টে' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে দেশকে খোঁজার পালা। ঘুরে ফিরে যার কথা কেবলই কবির কণ্ঠে, তাকে চেনানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েই কবিতার শুরু—'চেনো না এখনও, তাকে আমি চেনাবই।' তারপর শহুরে বাবুদের তৈরি মেলার বর্ণনা—'বাবুদের মেলা'। সেখানকার আকাশও যেন ময়লা চাঁদোয়া। নোংরা ভিড়, হরেক মনোলোভা জিনিস, দুর্গন্ধ - যেন এই রোগদুষ্ট এলোমেলো বিশৃঙ্খল সভ্যতা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এর মাঝখানে গ্রামীণ সুস্থ মানুষেরাও আসে—বড়ই বেমানান লাগে। 'গুটিকয় শিশু'—গ্রামের শিশু মেলায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এ-জীবন এ-মেলাকে তো তারা চেনে না তাই শুধায় এ ওকে, 'ভাই একেই কি মেলা কয়? বাবুদের মেলা?' শিশুর এই হতভম্ব বিস্ময়ের টানে-টানেই চলে আসে স্বাভাবিক বৈপরীত্য—'তাদের গ্রামের মাঠ', 'মাঠের মুক্তি', 'মুক্তির আকাশ'। আর সেই পরিবেশে সুস্থ কর্মিষ্ঠ মানুষ, যারা ধান ভানে, গম ভাঙে, হাল ধরে, গান করে—'আমাদের পৌরুষের গান'। এই তো আমাদের দেশ—'আমাদের জীবনের স্বাধীন আকাশ।' কবি সেই দেশকেই চেনাতে চান—এই পরিবেশেই বা এই পরিবেশের স্বপ্নেই বাঁচেন, তাঁর নন্দনকে পুষ্ট করেন সৃষ্টিময়তায়। কবির সঙ্গে যেন একাত্মতা ঘটে যায় চাষী মজুর সাধারণ মানুষের—জীবনের ভাষা খুঁজে পান। এই স্ফূর্তিতেই কবিতাটি শেষ হয় ১৯৪৭-এর ১৪ই অগস্টের সেই রাত্রে, ১৫ই অগস্টের মুক্তির প্রাক্কালে, হিন্দুমুসলমান মিলনের আনন্দ-সংগীতে।

কিন্তু এই খোঁজা কখনই শেষ হয় না, শেষ হবেও না, যতদিন না কবির ঐ উপলব্ধি শুধু স্বপ্ন নয়, দেশকালের বাস্তবে সত্য হয়ে উঠবে। আর তা ছাড়া, গ্রামেও তো ছড়িয়ে পড়ে অসুস্থতার সংক্রমণ, গ্রামও তো হয়ে পড়ে দুস্থ, পরাক্রান্ত প্রকৃতি সত্ত্বেও। ফলে, যৌবন আজ মৃত, বাস্তবে, শহরে, গ্রামেও। কবি 'পারিজাতভুক্ পাখি' চক্রবাকের পাখার ঝাপটে, গানে যৌবনের আনন্দ-

স্বর শুনতে পান। কবির কাছে এ স্বর খুবই চেনা, বাস্তব, স্বপ্ন যেমন বাস্তব— কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীর্ণ বাস্তবতায় সে স্বর শোনা যায় না—কবি তাই সেই স্বপ্নের পাখির স্বরকে, যৌবনকে খুঁজে বেড়ান শহরে-গ্রামে। পেতে চান তাকে বাস্তবতার বোধে।

> তাকেই তো খুঁজি এই জনতার হাটে বাটে বন্দরে
> সেই চেনা স্বর চিনি নাকো মুখ যার।
> হে চক্রবাক্ হে আমার যৌবন। ('এক জলসায়')

এই অন্বেষণের, কবি যাকে বলেছেন 'অন্বেষা-উৎসব', যেখানে কবি অন্বিষ্টকে চেনেন, অথচ তাঁর শরীর খুঁজে পান না, তার একটি স্থায়ী প্রতীক এ-গ্রন্থের দুটি সনেটে মূর্ত হয়েছে। হরগৌরীর মিলনই তো কবির অন্বিষ্ট, কিন্তু সতীকে পার হয়ে, দক্ষযজ্ঞের সংহারের অনিবার্য স্তর অতিক্রম করে, পৌঁছতে হবে পার্বতীতে, কুমারসম্ভবে। 'বীজকল্প' শব্দটির মতো 'কুমারসম্ভব' শব্দটিও এখন থেকে সম্ভাবনার আবেগ-সংহত শব্দমন্ত্র হয়ে রইল।

> জানি নিরুদ্দেশ অন্বেষা উৎসবে সতীকে মেলে না,
> মেলে পার্বতীকে কুমার-সম্ভবে ··। ('ঘুরেছি অনেক')
> রাজসূয় অসূয়ার যুগ গত কুমার-সম্ভবে । ('এলোরা')

এর আগেই তো দেখেছি এই অন্বিষ্টকেই তিনি পেয়েছেন তাঁর প্রেমিকার রূপে—তাকেই সম্বোধন করেছেন 'তুমি' বলে। অবশ্য পরের অনেক কবিতাতে 'অন্বিষ্ট' কবিতার কুশীলব তুমি-আমি-ওরা-র অনায়াস স্থানপরিবর্তন ঘটেছে। '১৪ই অগস্টে' কবিতায় তাঁর অন্বিষ্ট হয়েছে 'সে'—'তার' কথা বলতে সেই অন্বিষ্টের কথাই বুঝিয়েছেন—হয়তো সঙ্গে সঙ্গে 'অন্বিষ্ট'-র 'ওরা'-ও তার মধ্যে সংলগ্ন হয়েছে। পরে আবার দেখেছি 'আমি' এবং 'ওরা'-র সমীকরণ ঘটেছে কবির উপলব্ধিতে। কবি তখনই বলতে পারেন, 'আমরা ভেনেছি ধান।' কিংবা 'অবিচ্ছিন্ন কাব্য'-র তৃতীয়াংশে স্পষ্টতই 'তুমি' এবং 'ওরা' ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু সাধারণভাবে 'তুমি'-'আমি'-র মিলনসংগীতেই অন্বিষ্ট-র এই উপলব্ধির স্বাভাবিক রূপক বিধৃত। তাই 'অবিচ্ছিন্ন কাব্য'-তে শুধু নামকরণেই নয় (এলুয়ারের বিখ্যাত Poetry uninteruppted), উৎসর্গটিতেও ('পল এলুয়ারের জন্য') এলুয়ারের অনুষঙ্গ। এলুয়ারের মতো তিনিও এখানে প্রেমিকার অবয়বে স্বাধীনতার ধ্যান করেন।

প্রাচীন কাব্যপ্রথায় ঘর ও বাহির, নিস্তরঙ্গ মন্থর জীবনে কাব্যের ও বাস্তবের জগতের মাঝখানের পাঁচিল আধুনিক জীবনের তীব্রতায় ভেঙে গেছে। 'হাসির নিভৃত আলাপ' এবং 'বিশ্বের যত বাস্তুহারার কান্না'-র মধ্যে আজ চলে যাতায়াত। আধুনিক কবির প্রেমিকা শুধু নিরালা মনের ঘরেই থাকে না, বেরিয়ে আসে বাস্তবের রৌদ্রে। প্রাচীন কাব্যের 'মেঘম্লান' মালবিকা আজ 'ঝকঝকে দিনে তলোয়ার'। প্রেমিকার চোখে, আরাগঁ-র প্রেমিকা 'এলসা-র চোখে'র মতোই, তিনি দেখেন 'স্বদেশের জনগণ'।

> সুতরাং নাও একটি কবির স্বীকৃতি
> ঘর ও বাহির এক, তুমি তাই ঘরণী
> বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে,
> তোমার বাহুর পটভূমি গ্রীক ফাঁসি কাঠ,
> নয়ন ঘনায় ছায়া স্বদেশের জনগণ,
> আমি একজন সেই আসন্ন কবিদের।

'স্বদেশের জনগণে'-র বিস্তৃত জটিল ছবি ফুটে ওঠে এর পর, এলুয়ারের ঢঙে, কয়েকটি শব্দ ও প্রতিমার মিছিলে। সে শব্দগুলো হল : 'পথ', 'চোখ', 'ভিড়'।

> শীর্ণ নগ্ন পিষ্ট চূর্ণ পথ
> শুধু রাজপথ...
> রক্তে এবং রক্তহীনের হাড়ে ঝলসায় রাজপথ ...
> ভিখারীর চোখ, গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধের আর
> বৌমানুষের বিধবার আর ত্রিকালদর্শী শিশুদের চোখ
> ঘরহারাদের, কারখানাছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের
> যেন লাখো লাখো চোখে অগ্নিবর্ষী জঙ্গম পর্বত। ...
> আলোর ভিড়, দাঙ্গার ভিড়, বঙ্গভঙ্গ স্বাধীনতা ট্রেড্‌মার্ক ভিড়
> আর প্রতিবাদী ছাত্রের ভিড় ছাঁটাইয়ের ভিড় ধর্মঘটে:
> ধর্মধ্বজের প্রতিবাদের ভিড়, দুস্থের ভিড়...।

একটা থেকে আরেকটা বেরিয়ে আসে—শেষ পর্যন্ত সব কটি প্রতিমা এক জায়গায় মেলে অর্থান্তরে। 'স্বপ্নের ভিড়ে শত রাজপথ শত শত ঢেউ চোখে চোখে নামে।' এলুয়ারের প্রভাব এখানে খুবই স্পষ্ট, যে এলুয়ার সুররিয়েলিস্ট বিবর্তনে বাক্‌প্রতিমার পুনরাবৃত্তির মালা তৈরি করেন। এলুয়ারের কবিতা 'যুদ্ধের মধ্যে প্রেমের সাতটি কবিতা'য় এই চোখের প্রতিমার অনুবাদ তো বিষ্ণু দে ই

করেছেন। 'অবিচ্ছিন্ন কাব্য'-র শেষ অংশে আবার এই চোখের প্রতিমার মিছিল পাই—মানুষের স্বপ্ন, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম স্ফুরিত হয় চোখে-চোখে। আর তার মধ্যেই গড়ে ওঠে একটি মুহূর্তে অনেক সুরবিন্যাস—'ঝঞ্ঝাময় শান্তি'।

কবি কি তবে এভাবে কালকেও ধরতে চান মুহূর্তের অভিজ্ঞতায়? বর্তমানের প্রেমিকার মধ্যে শুধু ব্যাপ্ত দেশকে নয়, ব্যাপ্ত কালকেও অন্বিত করেন? 'পঞ্চবটী' কবিতায় 'তুমি' তাই হয়ে যায় 'কালের বাগানে' 'কালের মালিনী'। যুগ যুগ ধরে যে মালিনী মানুষের ও প্রকৃতির শুশ্রূষা করে এসেছে, তারই প্রতীক কবির প্রেমিকা? তাই কবি বলেন, তুমি 'ফুলেরই প্রতিমা'—তার সান্নিধ্যে প্রাণের আরাম আলো ছড়ায়, হৃদয়ের আলোছায়া দূরে সরে, এ আলোর বর্ণচ্ছটা যেন ইন্দ্রধনু। 'ইন্দ্রধনু' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'অন্বিষ্ট'-র সংরাগের জগৎ যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রেমিকা, ব্যাপ্ত প্রকৃতি, ব্যাপ্ত কাল একটি মুহূর্তে ধরা পড়ে।

এই উপলব্ধি কিভাবে বিষ্ণু দে-র পুরনো বহু পরিচিত একটি প্রসঙ্গ বা থিমকে রূপান্তরিত করে দেয়, তার উদাহরণ 'এল্‌সিনোরে' কবিতাটি। 'চোরাবালি'-র 'ওফেলিয়া' কবিতায় ছিল হ্যামলেট ও ওফেলিয়ার বিচ্ছিন্নতা, হ্যামলেটের ত্রিশঙ্কু হৃদয় ও যন্ত্রণাবিদ্ধ সংবেদন ওফেলিয়ার মৃত্যুতে অর্থহীন অপচয়। কিন্তু 'এল্‌সিনোরে' কবিতায় তাদের নবজন্ম ঘটে, অর্থের ভিন্ন বিন্যাস বা মাত্রা আসে। হ্যামলেট যেন রূপকথার সেই নীলকমল, সুস্থ চিন্তা ও সংকল্প নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ওফেলিয়া 'অন্বিষ্ট'-র সেই 'তুমি'—প্রেমিকার চোখে স্বদেশের দুঃখব্যথা, স্বাধীনতার বেদনাঘন আকাঙ্ক্ষা। 'ওফেলিয়া'র হ্যামলেট বলেছিল 'কথারা আমার গৃহহারা', 'এলসিনোরে'-র হ্যামলেট নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছে—, 'প্রস্তুতিঘন ভাষা'।

ফলে এই পর্বের উপলব্ধির দাবিতে হ্যামলেট-নাটকের ভাষ্য পালটে যায়। 'চোরাবালি'-র 'ওফেলিয়া' বিষ্ণু দে-র কাব্যের বিবর্তনে পৌঁছয় 'এল্‌সিনোরে'-তে। 'চোরাবালি'-তে এলসিনোরের জগৎ অবিশ্বাসের জগৎ—সেখানে 'খোড়ো হাওয়া ছোঁড়ে কালো-কালো বুনো মেঘ।' সেখানে হ্যামলেটকে বলতে হয়, 'মরণে মোহে করিনি জয়', সেখানে হ্যামলেট নিঃসঙ্গ—'রাত্রি ও আমি একা।' প্রেম সেখানে খামখেয়ালির মেঘ'। অথচ হ্যামলেট সেই পূর্তির আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা নিয়ে একা-একা ঘোরে—চোখের সামনে দেখে ওফেলিয়ার মৃত্যু—'আশ্বিনে গাঁথা গান' কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে জলে ভাসায়।

এই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা দূর হয় 'অন্বিষ্ট'-তে এসে। হ্যামলেট ওফেলিয়ার মুখের আশ্বাসে আশাকে খুঁজে পায়—ওফেলিয়া এখানে 'যৌবন জীবন মূর্তিমতী'। এখানে আর বিচ্ছিন্ন একা-একা ঘোরা নয়—এল্‌সিনোরের নরক পার হতে-হতে, নরক দূর করার শপথ নিয়ে দুজনে পরস্পরকে বাঁধতে পারে মৈত্রীতে। এ তো হ্যামলেটের নতুন পরিচয়, নিজেকেও নতুন চেনা, ওফেলিয়াকেও নতুন জানা। হ্যামলেট তার দ্বিধার ছদ্মবেশ খুলে ফেলে, সে চিনতে পারে কালের বাগানে··· ঘুমভাঙানিয়া মালিনী' এই ওফেলিয়াকে। 'চোরাবালি'-র 'ওফেলিয়া'-তে বাক্‌প্রতিমার দিশাহারা বিচ্ছিন্নতা 'এল্‌সিনোর'-তে এসে আবেগের তীব্রতায় পেয়ে যায় সংহত বিন্যাস।

'অন্বিষ্ট'-র জগতে প্রকৃতির একটি পরিপ্রেক্ষিত সব সময়ই থাকে। এই প্রকৃতিও, প্রেমিকার মতেই সম্প্রসারিত হয় অন্য তাৎপর্যে—কখনো-কখনো প্রকৃতি ও প্রেমের অদ্বৈতে। অথচ, অন্য দিক থেকে, এই প্রকৃতি আবার খুবই প্রত্যক্ষ, নির্দিষ্ট।

'সন্দ্বীপের চর'-এর যুগেই জানা গিয়েছিল, সাঁওতাল পরগনার রিখিয়া গ্রামের প্রকৃতি তাঁর কবিতায় কিভাবে প্রবেশ করছে। 'অন্বিষ্ট'-র জগৎ ছেয়ে আছে এই প্রকৃতি। এই গ্রন্থের বহু কবিতাই রিখিয়ায় বসে লেখা। রিখিয়ার 'পাথর কাঁকর লালমাটি / উৎরাই খাড়াই, রুক্ষ মাঠে মাঠে তরঙ্গিত ঢেউ' চকিতে, বহু কবিতাকেই স্পর্শ করে গেছে। রিখিয়ার ভৌগোলিক নাম, রিখিয়ার মানুষ, রিখিয়া ভূবৈচিত্র্য আবার বহু জায়গায় একটি স্বতন্ত্র ছবি তৈরি করেছে। অবশ্য শুধু 'অন্বিষ্ট'-তেই নয়, অন্বিষ্ট' থেকে শুরু করে তাঁর পরবর্তী কাব্যজগতেও রিখিয়ার প্রকৃতির স্থান গভীর।

অবশ্যই রিখিয়ার এই টান নিছক প্রকৃতিরই টান, যে টান কবির রক্তে আবাল্য। এমনকি তাঁর জীবনের ঘটনাবলির সাক্ষ্যে জানা যায়, সাঁওতাল পরগনার এই বিশেষ প্রকৃতির প্রতি তাঁর পক্ষপাত গড়ে উঠেছিল যখন থেকে বাবা মার সঙ্গে তিনি দেওঘরে আসতেন সেই শৈশবেই। দাঙ্গা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ঘূর্ণিতে যখন তাঁর নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত, নরকের দাহ তাঁর স্নায়ুকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, তখন স্বভাবতই রিখিয়ার রূপসী প্রকৃতি তাঁকে শুশ্রূষা দিয়েছিল, দিয়েছিল চোখের মনের আরাম। কিন্তু সেই আশ্রয়ের লোভেই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছিলেন, প্রকৃতি সম্পর্কে 'প্রিডমিনেটিং প্যাশন'১ তাঁর সৌন্দর্য-

বোধের ও সংবেদনের স্বভাবেই নিহিত ছিল।

> এ প্রকৃতি এ নিসর্গ ঘনিষ্ঠ সৌন্দর্য চেতনায়
> আজন্ম এ তীব্র স্মিত সৌন্দর্য চেয়েছি ছলে বলে
> প্রাত্যহিক সাধারণ্যে, সেই জলে রৌদ্রে বেদনায়
> এল নেমে ইন্দ্রধনু, পরগনার পাহাড়ে পাহাড়ে…।
>
> ('ইন্দ্রধনু প্রতিবিম্ব', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

সৌন্দর্যের যে ইন্দ্রধনুর প্রতিমা 'অন্বিষ্ট'তে সর্বব্যাপ্ত, তার নির্মাণ না হোক, বিকাশ রিখিয়ার প্রকৃতিতেই।

'প্রতীক্ষা' কবিতাতে রিখিয়ার এই নির্দিষ্ট প্রকৃতিই যেমন সর্বাধিক প্রত্যক্ষ, তেমনি এখানেই তার ব্যঞ্জনা এ-পর্বের তাৎপর্যকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে। তাই এখানকার অজস্র প্রকৃতিপ্রতিমাই 'অন্বিষ্ট'-র জগতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে আছে।

বলা বাহুল্য, সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতি যেখানে বাক্‌প্রতিমার উৎস, সেখানে রঙের বাহারই সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, লাল মাটির 'তরঙ্গিত ঢেউ'-এর উল্লেখ থাকলেও কবি এখানে প্রধানত ঊর্ধ্বমুখ। তাই 'নানান রঙের মেঘমালা', 'রঙের সপ্তসমুদ্র পারে স্বচ্ছ আকাশ' কিংবা 'ছড়াল আকাশে রঙের বন্যা' – এই আকাশ বা মেঘের বর্ণনাই প্রধান হয়ে ওঠে। এখানে বার-বার এসেছে 'অন্বিষ্ট'-র জগতের 'আলোর ঝর্ণা', 'মুক্ত ঝর্ণা', 'হাজার ঝর্ণা'। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, তার রক্তমেঘ। রঙের মুক্তি, রঙের বন্যা—ইন্দ্রধনুর সাতটি রং - রঙের মেলা বসে গেছে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আকাশে।

> নীল পশ্চিমে ফেরার মেঘেরা জাগল
> জবা চাঁপা সোনা ফিরোজা হাজার ঝর্ণা।

স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে ফুলের সমারোহ, বর্ণে গন্ধে। এখানে চামেলি আকাশ, আঁধারে গোলাপবন, গানে বনশিউলির গন্ধ। প্রতিমাপুঞ্জের ঢেউ ওঠে, অন্ধকার থেকে আলোয়। এমনকি রাত্রির আকাশেও 'তারার দীপাবলি'। আর সব পার হয়ে বারবার আসে 'ভোরের স্বপ্ন', 'এ ঊষা হৃদয়'। কবির স্বপ্নের এই বর্ণচ্ছটা রিখিয়ার প্রকৃতিতে এসে যেন তার আধার খুঁজে পায়।

আর আছে রিখিয়ার দুটি পাহাড় - রিখিয়াকে ছাড়িয়ে দুই প্রান্তে দুটি— ত্রিকূট ও দিঘারিয়া। রিখিয়ার পরিচয়চিহ্ন যেন এই ত্রিকূটেই। বিষ্ণু দে-র কবিতায় কতভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। পাহাড় তো 'অন্বিষ্ট'তে প্রায় প্রতীকের

মহিমা পেয়েছে। 'অন্বিষ্ট' কবিতাটি শেষই হয়েছে এইভাবে: 'খুঁজি চলো পাহাড়, / মানুষ।' 'অন্বিষ্ট'-র টেনশনের মুক্তি ঘটেছে বেঠোফেনের গানে, যে গান 'পাহাড়ে পাহাড়ে তরলসংগীত বোনে।' বোঝা যায়, পাহাড় মানুষের স্বপ্নের, পরিপূর্তির মুক্তির প্রতীক। এখানেও কবি যখন বলেন,

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের স্বপ্ন লাগল
সে আলো কি আজ তোমারও হৃদয়ে জাগল?

তখন বুঝি কবি কোন সমীকরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন। তার সেই স্বপ্নাতিতে ভরে যায় তাঁর প্রকৃতির গোটা আবহ।

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের আগুন লাগল
সে আলো কি আজ দিঘারিয়া বেয়ে সন্ধ্যা?

কিন্তু নদীর অমোঘ গতি এখানেও প্রতিহত হয়। 'অন্বিষ্ট'র মতো এখানেও বাস্তবের 'অন্ধ চাপড', সিপাইসান্ত্রীর নিষেধ হয়তো বিভ্রান্তির বিষাদও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই সব মানুষ যারা প্রাকৃতিক স্বতস্ফূর্ততা চেনে না নকল বাগানেই খুশি, তাদের কাছে গতির কোনো মূল্য নেই. বস্তুত গতিতে কোনো স্বস্তিই নেই। তাই নদী যদি মরে যায়, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই. নদীকে বাঁধতে পারলেই খুশি। তাই 'নিঃস্রোত নদী, চলে না ধারা।'

কবি অবশ্য জানেন, এ পাহারা সাময়িক। সব পাহারাকে ব্যর্থ করে ইতিহাস এগোয়। 'নদীর ধারা ইতিহাস যেন।' তাই নদী কি 'যাবেই বাঁয়?' 'ধর্মঘট' কি তারই ইশারা? সমস্ত প্রকৃতিতেই কি প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতি? দক্ষনাট্যের আগুন'ধোঁয়া পার হয়ে তাপসী অপর্ণা যেমন প্রতীক্ষারত, তেমনি গোপন হিমহ্রদে পাহাড়ের ঝর্ণা অপেক্ষা করে আছে সহস্রধারায় বেরোবে বলে। সমস্ত প্রকৃতিই তাই উন্মুখ, এখানেও কুমারসম্ভবের উপমায়।

কবি যদি প্রকৃতির মধ্যে আনন্দনির্ঝর দেখেও থাকেন অনুভব করে থাকেন শান্তি, সেই আনন্দ ও শান্তির অন্তরালে রয়ে যায় এই প্রতীক্ষার টেনশন। কবির শান্তিও তাই ঝঞ্ঝাময়।

'জল দাও' এই গ্রন্থের শেষ কবিতা, 'অন্বিষ্ট' কবিতাটির মতোই. শুধু দৈর্ঘ্যের কারণে নয়, তুলনীয় এ-পর্বের প্রতিনিধি স্থানীয় বলেও। এ-যুগের ব্যথাবেদনা ও আনন্দবিশ্বাস সঞ্চিত হয়ে আছে এখানেও। অবশ্য গঠনের দিক থেকে একটু স্বতন্ত্র। 'অন্বিষ্ট'-র বিন্যাস আপাতদৃষ্টিতে অনেক শিথিল। সেখানেও অভিজ্ঞতার একটা গতিপথ আছে, কিন্তু তা চলে যেন দমকে-দমকে,

লাইন ছেড়ে-ছেড়ে, ভিন্ন-ভিন্ন ছিন্ন পথরেখায়। 'জল দাও'-র গঠন সে-তুলনায় অনেক প্রত্যক্ষভাবে সুসংবদ্ধ—একই পথরেখায় তার সংঘাতময় প্রগতি। তাই 'অন্বিষ্ট' র গড়ন-বিচারে একমাত্র ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের গড়নের তুলনাই বোধহয় অনিবার্য—পক্ষান্তরে 'জল দাও'-র কিছুটা নিরূপিত গড়ন প্রসঙ্গে ইওরোপীয় সিমফনিক সংগীতের তুলনাই আসে।

'জল দাও' কবিতাটির রচনাকাল সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা আছে। কবিতার রচনা শুরু ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সময়। তারপর দীর্ঘকাল ধরে কবিতাটি গড়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। ১৯৪৭-এই কি কবিতাটি শেষ হয়েছে? কবির সাক্ষ্য অনুসারে 'সম্ভবত' তা-ই। দুটি গ্রন্থে আমরা কবিতার রচনাকাল সম্পর্কে দুটি সালই পাই। অথচ কোনো-কোনো পাঠকের মতে, কবিতাটির অভ্যন্তরীণ বিচারে দেখা যায়, ১৯৪৮-৪৯-এর সাম্যবাদী রাজনীতির হঠকারিতার নানা অনুষঙ্গের ছায়াপাত ঘটেছে, অন্তত দু-একটি জায়গায়। 'অন্বিষ্ট' কবিতারও পটভূমি ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৯। 'অন্বিষ্ট'র যুগের শব্দ, বাক্প্রতিমা বা অন্বয় যেভাবে 'জল দাও'-তে ব্যবহৃত হয়েছে, সমস্ত কবিতাতে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিষাদ যেভাবে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাতে এ-কবিতাটির আবহকেও 'অন্বিষ্ট'-র মতোই, দীর্ঘতর সময়-সীমার মধ্যে ধরা যায়। বোঝা যায়, এ বিষাদের উৎস শুধু দাঙ্গা বা দেশবিভাগ নয় সাম্যবাদী রাজনীতি ও নন্দনের যে-বিভ্রান্তি কবিকে আক্রান্ত করেছিল, সেই সব ঘটনাও। তবে নিশ্চয়ই, কবিতাটি দানা বাঁধতে শুরু করেছিল দাঙ্গার সময়কার ঘটনা থেকেই, যার কথা কবি স্বয়ং বলেছেন।[৮] এবং দাঙ্গার অভিজ্ঞতাই এখন সবচেয়ে প্রবল। তারপর অবশ্যই এই দীর্ঘ কবিতাটিতে নানা সময়ের নানা স্তরের পরিপূরক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে। কবিতার উপলব্ধিও 'অন্বিষ্ট' কবিতার পাঠকদের কাছে খুব পরিচিত। এখানে বিন্যাসের ধরনটা আলাদা।

'জল দাও' কবিতাটি শুরু হয়েছে 'অন্বিষ্ট'-র মতোই প্রশান্ত ভঙ্গিতে, নিরুত্তেজ গলা যে ভাবে খাদে নেমে আসে। বোঝা যায়, কবির সেই একই আহত সংবেদনের প্রক্ষেপ এখানেও। যেভাবে ঋতুচক্রের নির্লিপ্ত বস্তুময় বিবরণ দিয়ে কবিতাটি শুরু হয়েছে, তাতে কেউ কেউ 'মহাকাব্যোপম'-ও বলেছেন। 'অন্বিষ্ট'-তেও আমরা কালের সেই বিস্তৃত মহাকাব্যোচিত চেতনা পেয়েছিলাম—এখানে তা আরও যেন সংহত, ভাবগম্ভীর।

ঋতুচক্র, প্রকৃতির কর্মসূত্র বা নিয়ম, উদ্ভিদের জীবনবৃত্ত—কথ্যচালে, কিন্তু

যুক্তি-পরম্পরায় নেমে আসি আমরা এই কবিতার জমিতে যেখানে কলকাতার কঠিন বিপরীত বাস্তবেও ফুল ফোটে, নিত্য ফুল ফোটার আয়োজন চলে। ফুল ফোটার দীর্ঘ প্রস্তুতি—'কুঁড়ির অধরা আবেগ'— এ তো সৃজনেরই আবেগ। কিন্তু কবির পরিবেশে এখন সৃজনের কোনো সমর্থন নেই, হয়তো বিরুদ্ধতাই আছে—দাঙ্গার সংহারে, মনুষ্যত্বের ব্যর্থতায় আজ 'আকাশে নামে নির্জন বিষাদ।' কিন্তু তবু ফুল ফোটে—ফুটেই চলে—এত পরাক্রান্ত ক্ষমতা সৃজনশক্তির - 'প্রাণের প্রয়াসে প্রচুরতা তার।' কিন্তু বাস্তবকে তো অস্বীকার করা যায় না, তার বেদনা গ্লানি অপচয় লেগে থাকে এই সৃষ্টির গায়ে। তাই শিমুলের লালে 'অন্ধকার পরোয়ানা', 'গোলমোরের সোনাও পাণ্ডুর।' তবু, মানুষের সাময়িক বিভ্রান্তি ও ও বিচ্যুতির চেয়ে অনেক বড় সৃষ্টির এই অভিযান—বেদনাকেও সে গ্রহণ করে নিয়ে আরো সমৃদ্ধ ও গভীর হয়ে ওঠে। তাই কুঁড়ির অধরা আবেগ 'প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে' আনন্দে আকুল হয় সৃজনের সম্ভাবনায়। আর তাই তো কবিও পরিত্রাণ পান—দাঙ্গার ভয়াবহ সংবাদ যখন পৌঁছয়, তখনই 'একরাশ শাদা বেলফুল' ফুটে আছে দেখেন। দাঙ্গা তো 'সময়ের জড়ো করা ভুল।' দাঙ্গার তিক্ততা মুছে দিতে পারে এই ফুল, যে ফুল 'বিনীত পদের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত / বর্মের সংবিতে শুদ্ধ / অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা।' জড়ো-করা-ভুল এবং অভ্রান্ত-সত্তা শব্দবন্ধ দুটি পাশাপাশি এসে মন্ত্রোচ্চারণের মতো পাঠককে কবিতাটির চরণের সিঁড়ির ধাপে-ধাপে পৌঁছে দেয় অমোঘ উপলব্ধিতে। 'রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন' দীর্ঘ চরণটির পর উদ্দীপিত উচ্চারণ হয় 'একরাশ শাদা বেলফুল।'

দ্বিতীয় মুভমেন্টের বিবাদী স্বরে কলকাতার বিপরীত ছবি চলে আসে (বিষ্ণু দে স্বয়ং 'মুভমেণ্ট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন)। 'সময়ের জড়ো করা ভুল'—দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু মানুষ কলকাতার পথেঘাটে—এই রূঢ় বাস্তবকে এড়ানো যায় না। গরমের বর্ণনা বারবার—'হিংস্র গরম'। ফুল তখনও ফোটে, কিন্তু অন্য পরিপ্রেক্ষিতে, অন্য অর্থে। তাই গোলমোরের সাবেক জেলুশ বিবর্ণ, কৃষ্ণচূড়া চোখে আনে জ্বালা, আর গরম হাওয়ায় নীল আর বেগুনি ফুরুষ ঝরে। উদ্বাস্তু মানুষের একটা মর্মান্তিক ছবি এখানেই। 'গরম', 'ছায়া', 'হাঁপায়' শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। কবি ধীরে ধীরে এই 'ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়' মানুষগুলির মধ্যেই সেই সব 'বীর' মানুষদের দেখা পান, যাদের স্বদেশ নেই, অথচ যারা মরিয়া যাত্রী, দেশকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। আজকের দাঙ্গার ব্যর্থ মানুষ,

একালের এবং সর্বকালের দেশছাড়া মানুষ এবং ভৌগোলিক অভিযানের ভূখণ্ড-সন্ধানী বীর মানুষ—কবি তিনটি স্তবকের মধ্যে শুধু মাত্রাবেই বাড়ালেন না, মানুষের পরাজয়কে উত্তীর্ণ করলেন জয়ে। তাই এই মুভমেণ্টের শেষ স্তবকে 'বিজয়ী বসতি আনে স্বচ্ছল বসতি' চরণাংশে প্রথম মুভমেণ্টের 'আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল' প্রতিমাকেই প্রসঙ্গান্তরে প্রতিষ্ঠা করলেন। আর শেষ লাইনে 'বিজয়ী বসতি আনে চেলিউস্‌কিন (Chelyuskin, ১৮শ শতকের রুশ অভিযাত্রী ও আবিষ্কারক, যিনি এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে উত্তরের অন্তরীপে পৌঁছন ১৭৪৯ সালে) নামের মধ্যে এই বিজয় অভিযানকে তুঙ্গে তুলে দিলেন – আর তারপরই অকস্মাৎ নেমে এলেন বাস্তবে, বাংলা দেশের উদ্বাস্তু মিছিলে, শব্দের গড়ানো ভঙ্গিতে, কিন্তু ততক্ষণে অন্য প্রত্যয় জমা হয়েছে কবির কণ্ঠস্বরে :

হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়।

অবশ্য শুধু চেলিউস্‌কিন নয়, এর আগেই তারা সংলগ্ন হয়েছে দেশবিদেশের সমস্ত অভিযান-আবিষ্কার-কর্মোদ্যোগের সঙ্গে।

কর্মহীন ব্যর্থ উদ্বাস্তুরা যে হয়ে গেল চেলিউস্‌কিন, সে কবিরই স্বপ্নে। কিন্তু বাস্তব তো বড় কঠিন—'বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস'। তাই তৃতীয় মুভমেণ্টে দেখি, নদীতে স্রোত নেই, 'বালিচড়া' 'মরা নদী'। কালের বাগানে রাশি রাশি বেলমল্লিকা, অথচ আজ রুদ্র মাঘে কেবল ক্ষোভ আর রাগ ঝরে। দেশকালবিরহিত সমাধান তো সম্ভব নয়—তাহলে না হয় কচি ফুল হয়ে দক্ষিণের হাওয়া হয়ে বইতেন। কিন্তু অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়া যায় না। তাই যন্ত্রণা মানুষের 'ক্রতুকৃতম', দায়ভাগ। যন্ত্রণা এবং প্রতীক্ষা সমার্থক। প্রাত্যহিক জীবনে কর্মী মানুষের আস্থায়, বর্তমানের যন্ত্রণার তীব্রতায় মানুষের এই 'তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষা'।

চতুর্থ মুভমেণ্টে পর পর আসে বর্তমানের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা : 'অপ্রাকৃত মূঢ়তা', 'ছায়া কূট দুর্বিষহ', 'অন্ধ বিসংবাদ', 'উন্মাদের ব্যবসা', 'গৃধ্নু দানবিক সিংহকণ্ঠ'। এই অভিজ্ঞতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তিক্ততা ও হিংস্রতা হয় সর্বগ্রাসী। 'হাসবে কি একাই নিষাদ?' কবির মন ছেয়ে যায় এই অভিজ্ঞতার বিষাদে। 'হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে?' অবশ্য বিষাদকে যেমন বাদ দেওয়া যায় না, তেমনি বিষাদই তো শুধু পাওনা নয়, কবি তো 'আলোর ঝর্ণা' ও দেখেছেন।

তবু আমি শুধু খুঁজি নি বিষাদ
সোনালী চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ শুনেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত স্বচ্ছল সুঠাম
গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে · ।

তৃতীয় মুভমেণ্টের মতো পঞ্চম মুভমেণ্টও শুরু হয় ঘোষণায়—'হয়তো বা যন্ত্রণাই সার' সেখান থেকে কবি পৌছন 'অন্বিষ্ট'-যুগের প্রতিমাপুঞ্জে বা পৌরাণিক উপমায়। এখানে অবশ্য প্রতিমার ধাক্কায় ধাক্কায়, ভাষার আবেগ-তীব্রতায় লয় দ্রুত হয়, নাটকীয় চরম মুহূর্ত যেন তৈরি হয়। কবিতাটি শুরু হয়েছিল যে ধীর লয়ে, সংগীতিক নিয়মেই সেই লয় ক্রমে ক্রমে দ্রুত হতে থাকে। এখানে বাক্যের মধ্যে অপ্রত্যক্ষ ছেদ বা যতিও ক্রমশ সরে যায়। স্বল্পদৈর্ঘ্য চরণগুলির দ্রুত উচ্চারণে একটা টানা আবেগ আসে।

নিরুপায় শ্রেতা ভীষ্ম কিংবা অজ্ঞাতবাসের বৃহন্নলা—এই দুটি পৌরাণিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে 'অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ' বর্তমানে কবির অসহায়তা ফুটে উঠেছে। কবি তাঁর একাকিত্বের কথা বলেছেন, এবং সে একাকিত্ব যে পরমুখ পেক্ষী ভ্রষ্ট রাজনীতি ও নন্দনের প্রতিবাদেরই পরিণাম, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। সন্ত্রাসের এই রাজনীতিই তো পথভ্রষ্ট করে দিতে চায় সবাইকে।

অথচ নিঃস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে, কারণ, সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলন বান-ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ…।

অথচ এই সংকটকালেই কবির সত্তার প্রতিবাদ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, স্বপ্ন মূর্ত হল আবেগের ভাষায়। 'সন্দ্বীপের চর'-এর ভাষা চলে এল স্রোতস্বিনী নদীর নামের মালায়, সুপরিচিত বাক্‌প্রতিমার আবির্ভাবে—'শিরায় শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসব।' এই হল 'অন্বেষা-উৎসব'। অন্বেষণের টেনশন দীর্ঘ একটি স্তবকে চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। নৃত্যমঞ্চে 'বোল ছড়াবার আগের মুহূর্তে' বালা সরস্বতী বা রুক্মিণী দেবী, 'আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননী' কিংবা 'বল্‌গা ধরে তাতার সওয়ার'—মুহুর্মুহু এই উপমার চাপে, বর্ণনার তীব্র উত্তেজনায় পাঠক উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। কবিতার সমস্ত পরিবেশ সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আর

ঠিক তখনই স্বর বদলে কবি টেনশনের মুক্তি ঘটান :

তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর স্রোত
কল্লোল মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে
সাগর উত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিষ্ট আভাসে
উর্মিল জোয়ার।

খরস্রোত নদী, নীল মহাসমুদ্র—'নিঃস্রোত নদী'র পর এই উত্তরণ সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে আপ্লুত করে, প্রতিমার দীর্ঘ পরিচিতিতে। আর আর্টেমিস ও মহাশ্বেতার যুগ থেকেই কবির মানস-অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর সঙ্গে যাদের পরিচয়, তাঁরা সহজেই চিনবেন 'এই সাগরউত্থিতা' কে। শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই জয়ী হল এই তিক্ত বাস্তবতায়। সাগরউত্থিতা সুন্দরীর স্বপ্নকে কবি মরণজয়ী করে রাখলেন দাঙ্গার কলকাতাতেও।

তার এই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীই তো 'অন্বিষ্ট'-র 'তুমি'। 'অন্বিষ্ট'-তেও টেনশনের মুক্তি ঘটেছিল 'অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাত তুমি'-র আবির্ভাবে। কবির স্বপ্ন 'তুমি', আবার সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সংগ্রামে সঙ্গিনীও এই 'তুমি'। 'তুমি' শব্দটিতে ঘটে যায় এই ভাবে বিপরীতের সংশ্লেষ। নিঃস্রোত নদীতে স্রোত বয়, কবিরও নৈষ্কর্ম্যের মুক্তি ঘটে। কবি উপলব্ধি করেন, 'তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই।' তাই মিছিলে জাঠায়, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামে কবি এই স্রোতস্বিনীর সহযাত্রী, যে একাধারে তাঁর প্রিয়া এবং ব্যথিত ও প্রতিবাদী স্বদেশ। (লক্ষণীয় কিভাবে কবি 'মিছিলে' 'জাঠায়' শব্দ দুটি চকিতে লাগিয়ে কবিতাটির ভিন্ন মাত্রা পরিষ্কার করে দেন)। তারা অভিন্নও বটে—আর প্রিয়া হয়ে শুধু লীলাসঙ্গিনী নয়, লড়াইয়ের সমান অংশীদার। 'তুমি' এবং 'আমি' মেলে এই জায়গায়। কবি এই প্রিয়'তেই বাঁচেন, মুঠিয়ে তোলেন তার ফুল—আবার তাকেই দেন হৃদয়ের 'পল্লবিত ছায়া'। অন্বিষ্টই তাঁর লক্ষ্য, আবার অন্বিষ্টই তাঁর অবলম্বন বা আশ্রয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনিই আবার প্রার্থনা করেন প্রিয়ার শুশ্রূষা :

জল দাও আমার শিকড়ে।

কবি নিজেই জানিয়েছেন, হপকিন্সের ***Send my roots rain*** মন্ত্রে

প্রতিধ্বনি এখানে।[৯] আমরা এর আগেও তাঁর কাব্যে বারবার পেয়েছি যাত্রা, গ্রীষ্মের পর বর্ষণ। 'জল দাও'-তে গ্রীষ্মের প্রতিমার পুনরাবৃত্তিতে জলের জন্য আর্তি আগেই উচ্চারিত হয়েছে—প্রত্যাশা করা হয়েছে 'বিস্তৃত শান্তির বর্ষা'। এমনকি কোনো পাঠক যদি রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র অনুরণন শোনেন, সেটাও অসংগত হবে না। কারণ চণ্ডালিকার মতো কবিও তো ছিলেন অচ্ছুৎ, একাকী —সেই বেদনা থেকেই তাঁরও নবজন্মের আনন্দ। আর সমস্ত 'জল দাও' কবিতাটিই রচিত হয়েছে গাছের জীবনবৃত্তের রূপকে। তাই শিকড়, পল্লব, ফুল, ফল ইত্যাদির প্রতিমা ও উপমার মধ্যেই গড়ে উঠেছে এর জগৎ। ফলে 'জল দাও আমার শিকড়ে' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে ফুলফল সমন্বিত সতেজ বৃক্ষের স্বপ্ন, কবির।

বাহ্যত মনে হতে পারে, টেনশন থেকে মুক্তিই 'অন্বিষ্ট' গ্রন্থের মূল আর্তি। 'অন্বিষ্ট' কবিতায় পাহাড়ে-পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়া বেটোফেনের তরল সংগীতে কিংবা 'জল দাও'-তে বালা সরস্বতীর নৃত্যপ্রস্তুতির পরের ভেঙে-পড়া ঊর্মিল জোয়ারে যে বিক্ষোভের মুক্তি ঘটে আবেগে, তাকে অবলম্বন করেই মানুষ লড়াইয়ে উদ্যত হয়। মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে সে জোগায় প্রেরণা, আরোগ্য। শুধু রক্তচক্ষু দক্ষযক্ষ নয়, কবির প্রস্তুতিঘন ভাষায় কুমারসম্ভবের গান, আলো-ছায়ার বিচিত্র নকশা। কিন্তু এ তো মুক্তি নয়, নিরুপদ্রব পরিত্রাণ নয়। এক টেনশন থেকে আরেক টেনশনের ঢেউ ওঠে তাঁর কবিতার ভাষায়। টেনশন থেকে মুক্তি নেই। শুধু উত্তরণ আছে, আছে প্রগতি।

'শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব' কবিতায় এই নন্দন-উপলব্ধিকেই হাজির করেন কবি। বোঝা যায়, কবি কিভাবে জীবন থেকে কবিতার ভাষাকে সংগ্রহ করছেন, কিভাবে জীবনের এক বৃত্ত থেকে আরেক বৃত্তে গিয়ে পড়ছেন, এক টেনশন থেকে আরেক টেনশনে। কিভাবে ত্রিকালকে বিধৃত করতে চেয়েছেন, কাল ও দেশের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত করেছেন ভাষার দ্বন্দ্বময় অবয়বে।

১. যে প্রবন্ধগুলিতে বিষ্ণু দে-কে আক্রমণ করা হয়েছিল, তার সব কটিই বেরিয়েছিল 'মার্কসবাদী' পত্রিকায়। যথা, বীরেন পাল-এর 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' ('মার্কসবাদী', ১ম সংকলন, অক্টোবর ১৯৪৮), ঊর্মিলা গুহ-র 'সাহিত্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি' (ঐ), প্রকাশ রায়ের 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' ('মার্কসবাদী', ৪র্থ সংকলন, জুলাই ১৯৪৯)।

২. 'সাহিত্যপত্রে'র ১ম সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু-র গ্রন্থের সমালোচনাসূত্রে বিষ্ণু দে যে প্রবন্ধ

লেখেন, তাতে এই মতামতের বিস্তৃত আলোচনা আছে ('সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৫ ব)। পরে প্রবন্ধটি 'রাজায় রাজায়' নামে 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩/৪. বিষ্ণু দে, 'এলুয়ার'। 'অগ্রণী', মাঘ ১৩৫৯ ব।

৫. রজের গারোদি-র লেখা *Artist without uniform*-এর বিষ্ণু দে কৃত বাংলা অনুবাদ 'উর্দিহীন শিল্পী'। 'অরণি', ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭।

৬. কার্ল মার্কস, …রচনা, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ ১৫৪। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রকাশিত 'শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস লেনিন' গ্রন্থের (জুলাই ১৯৫৮) বঙ্গানুবাদ (পৃ ৫০)।

৭. বিষ্ণু দে, 'সম্পাদকীয় মন্তব্য'। 'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ ১৩৫৭ ব। পরে 'বীরবল থেকে পরশুরাম' নামে 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'-এ গ্রন্থস্থ হয়।

৮/৯. Poet's note. South Asian Digest of Regional Writing, Vol 2 (1973). University of Heidelberg. এর পূর্বেও অনেক জায়গায় বলেছেন, কিন্তু এখানেই সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে।

কবির বিশ্ব

কঠিন ব্রতযাত্রার অন্তে কবি তো পৌঁছলেন তাঁর অন্বিষ্টে—এর পর থেকে শুরু হল 'পাহাড়ে পাহাড়ে তরল সংগীত' বুনে যাওয়া। 'অন্বিষ্ট' গ্রন্থেই তিনি বলেছিলেন, 'তোমাকে তাই যে চাই, খুঁজি চলো পাহাড়/মানুষ।' শুধু 'অন্বিষ্ট'-তেই বা কেন, তারও আগে, বরাবরই, সমুদ্র বা পাহাড়ের দিকে যাত্রা তাঁর কবিতায় লক্ষ্যে পৌঁছনোরই সহজ প্রাকৃতিক উপমা। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এও তিনি এসে বললেন, 'জীবন যেখানে স্বচ্ছ আকাশ, মানুষেরা সব পাহাড়।' কবিতা তাঁর কেবলই 'খাড়া চড়াই উৎরাই' পথে অবিরল যাওয়া, 'দুর্গম শিখর'-এর দিকে। কিংবা শুধু বলা: 'অদ্বৈত সাধনে তাই সমুদ্রের ধাই।' খুবই শ্রমসাধ্য দীর্ঘ যাত্রা—বলেছেন 'পায়ে পায়ে চমকাই'—'অথচ যেতেই হবে অবিশ্রাম নিদ্রাহীন।' এবার যেন পৌঁছনো গেল। 'তারপরে হঠাৎ শিখর।' 'টলোমলো সমুদ্রের একরাশি জলধারা হাজার হৃদয়।' 'হঠাৎ' শব্দটি এরকমই আসে অনেকবার। চৈত্রজ্বালা অগ্নিদিনে যেমন 'হঠাৎ বেহালা বাজে।' যে যাত্রাপথকে এতক্ষণ দুর্গম মনে হচ্ছিল, এখন আর তা লাগছে না—'পৌঁছলে সহজ লাগে, জীবনের মতো সহজ/সেই তীব্র দেশে।' 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' থেকে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পর্যন্ত—মাঝখানে আর মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থ 'আলেখ্য' এবং 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'—এই সমস্ত সময়টা জীবনের মতো সহজ ঐ তীব্র দেশে পৌঁছে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। এতকাল কবি যার সন্ধান করছিলেন, সেই আনন্দনিষ্যন্দনকে এবার যেন পাওয়া গেল। কবির ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষায় সেই হর্ষই ছড়িয়ে পড়ে।

> স্নায়ুতে মানসের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রঙ্গতান,
>
> কোয়ার্টেট যেন কোন অতন্দ্রিত গ্রোস ফুগের গান।
>
> ('পাঁচপ্রহর', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার',

মুক্তির আনন্দ মূর্তি জীবনের মুক্তির আনন্দ…

('নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', ঐ)

ভাঙল রঙের কেল্লা রাঙাল পৃথিবী আনন্দে ইন্দ্রিয় ?

('হেমন্ত', 'আলেখ্য')

মনে হয় বুঝি পৃথিবীর জ্বালা থামল
মনের হরিষে নিন্দ যাওয়ার ছন্দ। ('আষাঢ়', ঐ)

আনন্দে আনন্দে মন বেঁচেছে কেমন,
প্রচুর আনন্দে, আর বিচিত্র বহুধা…
আনন্দই দিয়েছে বসুধা। (শত মুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়', 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ')

অঙ্কুরে অঙ্কুরে তাই আজ
আমারও কবিতা দোলে প্রসন্ন হাওয়ায়
আসন্ন আশ্বিনে আহা ধানের মঞ্জরী…

('আমিও তো', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

গ্রন্থ তিনটির মধ্যে এই যে মিল, তা স্বাভাবিকও বটে। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর বহু কবিতা কিছু আগে লেখা হলেও, মোটামুটিভাবে বলা যায়, পঞ্চাশের দশকই, অন্তত স্বাধীনতা-পরবর্তী বছরগুলিই এর সময়পরিধি। চল্লিশের দশকে অভিজ্ঞতার এক-একটি গ্রন্থি পার হয়ে-হয়ে বামপন্থী রাজনীতির সাময়িক ভ্রান্তির দেনা চুকিয়ে এ-সময়ই বোধহয় তিনি স্বপ্নকে পরিপূর্ণ ছুঁতে পারলেন—'স্বপ্নের দিন রাতের জীবনে মেশে।' বাস্তব ও স্বপ্ন এক লক্ষ্যে পৌঁছয়। ঝকঝকে রৌদ্রে রূপান্তরের স্বপ্নই শুধু বোনেন না কবি, মনে হয় যেন সেই স্বপ্নেই পৌঁছে যান এবার। তাঁর 'স্বপ্নে বাস্তবের নিরাকার সর্বদা সাকার' শুধু নয়—মনে হয়, বাস্তবেই স্বপ্ন শরীর পেয়ে যায়।

চারপাশের প্রকৃতিতেই যেন তার ইশারা। এবং সে-প্রকৃতিও আবার, 'চোরাবালি'-র যুগেই যেমন লক্ষ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, 'নদী ও বন, মেঘ ও পর্বত, সমুদ্র ও আকাশ, রাত্রি ও দিন ইত্যাদি চিরপরিচিত চিত্রকল্পাদি…।' এখানেও আছে আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, রাত্রিদিন, হাওয়া—কিন্তু প্রকৃতি ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে শুধু পরোক্ষপ্রতিমা নয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয় হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। কিংবা কয়েকটি প্রতিমা পুনরাবৃত্তিতে হয়ে উঠেছে প্রতীকোপম।

'আশ্বিন' এবং 'হালকা হাওয়া' বোধহয় সেরকমই দুটি শব্দপ্রতিমা। অনেক

আগে থেকেই তাদের স্বতন্ত্র ব্যবহার আঁচ করা যাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল তাঁর পক্ষপাত, নিছক ব্যক্তিগত পছন্দতে যেমন, তেমনি অর্থের বা ব্যঞ্জনার বিকিরণেও। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ যেন সেই 'আশ্বিনের পুবালী বাতাসে'র ঝাপটা গায়ে এসে লাগল। তিনি অনুভব করেন সব সময় 'আশ্বিনের নতুন ভাষা'।

হালকা আকাশে আশ্বিন থর থর ··
আশ্বিন আসে নির্বাক প্রতিবাদ···
আশ্বিন আসে স্বচ্ছল নির্ভর···
আমার হৃদয়ে ঢেলে দিলে আশ্বিন ('আশ্বিনে', 'নাম রেখেছি···'
দুই দিকে আজ আমার শারদ জীবনের প্রান্তর ('ত্রিপদী', ঐ)
আসবে আসবেই বিরাট আকাশের যে আশ্বিন ('আশ্বিন', ঐ)।

আশ্বিনের এই 'আগুন' কিংবা 'স্বচ্ছ হাসি' পরের গ্রন্থগুলিতেও ছড়িয়ে আছে অজস্র।

বোঝা যায়, এরকমভাবেই আসে 'হালকা হাওয়া', 'হালকা মেঘ' 'সোনালি ধানের হালকা হাওয়া', 'স্বচ্ছ আকাশ'। ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ্য করে 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এর '-ন যেন নিভন্ত অঙ্গার' কবিতায় কবি বলেন :

এসো তবে হাওয়া তুমি, শুচি স্থির মানবিক হাওয়া ··
হাওয়া চাই লক্ষ্যে স্থির।

এরকম আরো অনেকই ধরা যায়। কবি যেন এ-যুগে প্রতিমা-পুঞ্জেই ডুবে আছেন। সেই প্রতিমাপুঞ্জের অনুসরণেই অনেক দরজা খুলে যায়। প্রতিমার মিল অমিল পুনরাবৃত্তি বা বিস্তার-সংকোচন যাচাই করে-করে আমরা তাঁর অভিজ্ঞতার স্বরূপকে বুঝে নিতে পারি। কখনো বর্ষা, কখনো সমুদ্র, কখনো পাহাড় তাঁর কবিতায় কিভাবে গোড়া থেকেই প্রায় শুরু হয়ে এখন সংগঠিত হচ্ছে পূর্ণগর্ভ ভাষা ও অর্থের নির্দিষ্টতা ও সীমাতিশায়ী বিস্তারে একই সঙ্গে, তা লক্ষ করার বিষয় নিশ্চয়ই।

যেমন ধরা যাক 'পাহাড' বা 'সমুদ্র'। জীবনের পরিপূর্ণতায় সমুদ্র-ই সচেতনভাবে প্রতীকের রূপ ধরে। আবার জীবনের দুস্তর উৎরাই ও খাড়াই বেয়েই তো নিটোল পাহাড়ে পৌঁছনো—সেখানেই জীবনের লক্ষ্য সংহত। 'জীবন যেখানে আকাশে জমাট একটি নিকষ পাহাড়।' আবার :

সমুদ্রে সমুদ্রে দেখি আবেগকল্লোলে
এই বুঝি আবির্ভাব…
সভায় মিছিলে তোমাদের আমাদের ভিড়ে…

('প্রচ্ছন্ন স্বদেশ' 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')

আবার কখনো পাহাড়-সমুদ্র একাকার। কবি বলেন, 'পাহাড়ে পাহাড়ে সমুদ্র গড়ি' কিংবা সমুদ্রকে বেঁধে দিতে চান 'উৎসের ঘরে পাহাড়ের নীল অম্বরে'।

ঠিক এমনিভাবেই 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' গ্রন্থে যেমন শরৎ, তেমনি আলেখ্য'-তে বারবার শোনান বর্ষার ধারায় 'নবজীবনের গান'।

কবে যে মানুষ-ও আষাঢ়ের গান করবে
আমাদের এই নবজীবনের আষাঢ়! ('আষাঢ', 'আলেখ্য')

এই সব পক্ষপাতের মধ্যেও বিষ্ণু দে-র কবিতায় ঋতুচক্রই যে নানা ভাবে ঘুরে-ফিরে আসে—কখনো বিস্তারে কখনো আভাসে—সে তো এই মানসযাত্রারই অবলম্বন। উদার রুচি বা সর্বগ্রাসী ইন্দ্রিয়ের টান তো বটেই, তার অতিসজাগ মনন দু-হাতে জড়িয়ে ধরতে চায় বচিত্র ঋতুর বাস্তব ও ব্যঞ্জনাকে একসঙ্গে। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ 'বারোমাস্যার'-র সচেতন উপস্থাপনাতেই শুধু নয়, অনন্ত জীবনতৃষ্ণাকে যেন তিনি মেটান সর্বত্রই ঋতুবদলের উৎসবে।

আমাদের শুভদিন প্রতিদিন, শ্রাবণ আশ্বিন
অঘ্রান ফাল্গুন আর আষাঢ ভাদ্রের
জলে জলে থৈ থৈ কিংবা রৌদ্রে রৌদ্রে তলোয়ার,
শিশিরে ঘনিষ্ঠ মৃদু, উল্লসিত বসন্তবাহার,
বানডাকা পাড়ভাঙা সুখে মেঘে মাটির আর্দ্রের
মিলনে স্পন্দে স্পন্দে জীবনের সৃষ্টিময় দিন। 'রাগমালা', 'আলেখ্য',

লক্ষ্য একটাই: জীবনের পরিপূর্তির ঘোষণা। কবির স্নায়ুতে মনের আনন্দের যে রেশ বাজে, সেই তীব্র প্রবল আনন্দ প্রকাশ করেছেন কবি এই সব প্রতিমায়। শান্তি, জয়, প্রেম, আশা সবই সেই আনন্দের সমার্থক। প্রেমের উজ্জীবন ঘটে গেছে যেন বাস্তবেই। কবির দায় শুধু পাহাড়ের চূড়ায় আকাশের মুখোমুখি 'উদাত্ত বেদগানের সুরে' সেই কথাটাই বলা।

তা বলে এমন নয় যে, দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ কোনো সুখে বা স্থিরতায় তিনি পৌঁছে গেলেন। চারপাশে এত গ্লানি, এত পরাজয়, এত পূতিগন্ধ—তার মধ্যেও তিনি

আজ বলতে পারছেন বটে, 'আনন্দে নিশ্বাস টানি'—কিন্তু পৌঁছনোর আগে তাঁর যাত্রাপথ যেমন ছিল দ্বন্দ্বসংকুল, আজকে তাঁর উপার্জিত আনন্দবিশ্বও তেমনিই দ্বন্দ্বময়। পাহাড়ের হালকা হাওয়ায় নিশ্বাস টান। রোমান্টিকের পালানো নয়। তিনি যে এত ঘাট ঘুরে ঘুরে নিজেকে প্রসারিত করে করে আজ দেশ-আবিষ্কারে আত্মস্থ হলেন, সে তো দ্বন্দ্বের সঠিক অনুভবের উপর ভর করেই। তাই আজ যখন কবি বলেন 'স্বপ্ন আমার মেলাচুম/তোমার অন্ধ বাহুতেই' কিংবা 'জীর্ণ জীবনের স্বপ্নের ঋজু আলপনা' কিংবা 'এদিকে স্বপ্নে অশরীরী বিদ্রোহ' তখন বোঝা যায়, কোনো সরলীকরণে নয়, শব্দের নিহিত জটিলতা ও নির্মাণের ইতিহাসেই তাকে চিনে নিতে হবে। কবি যখন বলছেন, 'আনন্দে আনন্দে মন বেঁচেছে কেমন'—তখন বুঝতে হবে, স্বপ্ন শুধু 'বাবু পলায়ন' নয়—কবি নিজের দ্বন্দ্ববোধকেই আবো শানিয়ে নিচ্ছেন। স্নায়ুর আত্মসমর্পণে বা তৃষ্ণার বিসর্জনে নয়, ইন্দ্রিয়ের অধিকারকে প্রদীপ্ত করে তুলেই দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের যোগ্য ভূমিকা পালন করা যায়। যদি কখনো মনে হয়, 'শান্তির শরতে' তিনি গা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন জানতে হবে এ তাঁর প্রস্তুতিঘন মুহূর্তেরই অন্যনাম। কিংবা সায়ুর আরোগ্যস্নান। 'ব্যাপ্ত আশা উদাস সংবিতে।'

তা ছাড়াও, ইন্দ্রিয়ের ঐ রসের আড়ালে গোপনে গোপনে ঘটে যায় রক্ত-পাত। স্বপ্নের আনন্দের অসীম বেগ কতক্ষণ বাজাতে পারে তাঁর স্নায়ুতে বন্ধহীন? তাঁর আনন্দকেও তাই শেষপর্যন্ত স্পর্শ করে বর্তমানের গ্লানি। কবির তীব্র সৌন্দর্যবোধ ব্যথিত নন্দন হয়ে ওঠে জীবনের বিচ্ছিন্নতায়, প্রকৃতির আনন্দ-গান 'ছাপিয়ে ছাপিয়ে হাড়ে হাড়ে বাজে দাঁতে-দাঁতে অভিযোগ।' 'বীটোফেনী সিমফনির গন্ধব বাতাস' কেটে যায় উপোসী মানুষের কান্নায়। শান্তিই চান কবি এ-যুগে, কিন্তু তাকেই বলেন 'খর শান্তি', 'ঝঞ্ঝাময় শান্তি'।

প্রবলভাবেই আছে তাই, এ-সময়ের কবিতাতেও; ভাঙাচোরা জীবনের ও আহত মানুষের দীর্ঘ নিশ্বাস। রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছে বিষাদের কালি। 'আশ্বিনে'-র স্ফূর্তিতেও বলেন, 'এই তো জীবন নাজেহাল হিমশিম।' বলেন, 'আমার হৃদয়ে বহু অন্ধকার চেনাশোনা বহুকাল।' শ্মশানের দুঃস্বপ্ন এখনও: 'এ শ্মশানের সীমা নেই।' নরক সামনে: 'এ কোন নরকে এসেছি অলকার দম্পতি।' 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ 'আমার স্বপ্ন' কবিতায় বলেন, 'কতো দুর্যোগ কতো দুর্ভোগ যায়।' এখনও দেশজোড়া বিচ্ছিন্নতা চোখের সামনে থেকে সরে না:

আকস্মিক অসহায়
অসংবদ্ধ পাশাপাশি নিঃসঙ্গের ভিড
পায়ে পায়ে সারে সার ট্রামে বাসে
কাতারে কাতারে ভিড় · ('আমি তো গাঁয়ের লোক', 'নাম
রেখেছি কোমল গান্ধার')
কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায় ?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ ? ('পরবাসী', 'তুমি শুধু ··)

প্রকৃতির সম্ভোগের নিশ্চিন্ততা শুধু নয়, চোখের সামনে উঠে আসে রুগ্ণ বিকল উপবাসী ভিখারি ছেলে কিংবা ভিখারি গায়ক ('তিনটি কান্না', 'নাম রেখেছি···')। 'সারাদিন ঘুরে ঘুরে লঙরখানার পাশে সন্ধ্যার নৈরাশে' ভিখারি 'নিজের শিশুর মুখে' দেখে অনাগত আহারের উন্মুখতা, 'সঙ্গিনী স্ত্রীর বিবস্ত্র ব্যর্থতা'। কবি জানেন : 'শুধু দেশজোড়া এই রয়েছে মানুষ' ('টাইরেসিয়স', ঐ)। কবির কাছে এই হল স্বদেশের মুখ। 'দুপাশের দেশ কাঁদে, তোমার ও আমার স্বদেশ··।' এই বোধেই যন্ত্রণার একাকিত্ব কেটে যায়, ঘটতে পারে 'যন্ত্রণার নবপ্রতিষ্ঠা'। কবি বলতে পারেন, 'আমার সে দুঃখে আজ মেশে সারা দুঃখের স্বদেশ।'

কবি বলেছেন, 'কর্ম দুঃস্বপ্নে অস্থির।' অথচ 'স্বপ্ন বাঁচে কর্মে।' এ-কথা আগেই তো তিনি বলেছেন অনেকবার নানাভাবে। এ-সময়ের উচ্চারণে মনে হয়, কর্মী মানুষের সৃষ্টি ও সংগঠনের কোনো জীবন্ত চেহারা তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট ছিল। অর্থাৎ পেছনে কবির মনেরই বাস্তবতা। ৪৯-এর বিচ্ছিন্নতা কেটে গেল, স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বদেশে তাঁর আস্থা নবীন উৎসাহে ফিরে এল বামপন্থী আন্দোলনে। ৫০-এর দশকের রাজনীতির যে মূল্যায়নই হোক আজ, কবির কাছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ আবেগদীপ্ত প্রেরণার সঞ্চার করে। 'নতুন মানুষ নতুন জীবন নতুন কালের বীর' কবির বাস্তবতার জমি ভেঙে সামনে এসে দাঁড়ায়। দুস্থ এই পরিবেশে ভাবীকালই শুধু স্বপ্নের উৎস নয়, কর্মী লড়াকু মানুষও তাদের কর্মময়তায় রচনা করে স্বপ্নের বর্তমান—'স্বপ্ন আর কর্ম যেথা একাকার ভ্রূণস্থ মাতৃত্ব যেন।' কবির মনে আজ নির্বিঘ্ন আশা ও আনন্দের যে উপার্জন, তা তো শুধু প্রাকৃতিক আশ্রয় বা ভবিষ্যতের কল্পনা বা নিজের

ইন্দ্রিয়ের প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষাই শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন স্বপ্নময় কর্মময় মানুষ ও তার জীবনকে ঘিরে যে বর্তমান, তার সঙ্গেও যুক্ত।

আর এই সূত্রেই তাঁর কবিতায় ভিড় করে কর্মী প্রতিবাদী মানুষ, তার কর্মের গৌরব।

মোহিনী নয়কো, মানুষেরই নির্মাণ
মাটির মানুষ, একাগ্র দিনমান
শিক্ষিত চোখ, সদাসতর্ক কাজ,
প্রখর হৃদয়, লেনিনের মহাপ্রাণ
হাজার বাহুতে এনে দিল যৌবন।
('আমার স্বপ্ন', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')

শুধু একজনার গৌরবে
তল্লাসীরা হানা দেয় আজও, ঘরে পায় নাকো তাকে,
কখনো নন্দিত বন্দী, সর্বদাই দেশ যাকে ডাকে,
যে ছেলের মুখ দেখে যম-ও নেয় না ঠাকুমাকে। ('যমও নেয় না', ঐ)
তাই এরা বীর, এদের আশার ক্ষয় নেই,
বাঁশি শুনে তাই এরা ছেড়ে যায় ঘর,
তাই এরা ভালোবাসে সুখেদুখে,
শত গ্লানি তাই সয় হাসিমুখে
মরণকে করে জীবনের নির্ভর
পর-কে আপন, আপনকে করে পর। ('রাগমালা', 'আলেখ্য')
তাকে চেনা যেন এক কঠিন মানসযাত্রা। ··
·· সে বলে প্রতিটি দিন
আমরা সবাই শেরপা! ('আলেখ্য', ঐ)

এই মানুষের, 'বীরভোগ্য জীবন' যাদের, সেই মানুষের আলেখ্য এসময়ে নানাভাবে এসেছে। সেই পাহাড় বা সমুদ্রেরই সন্ধান পান তিনি তাদের অস্তিত্বে।

ঊর্মিল কর্মের দিন উড়ে চলে হাওয়ায় হাওয়ায়
এ আকাশে বাসা তার জীবনের সমুদ্রে উদার।
জীবনের স্বপ্নের ভিড়ে তাই মিলে যায়।
('অক্টোবর দিনগুলি', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')

চোখে বিদ্যুৎ দীপ্ত স্বচ্ছ নির্ভীক,

সে রেখে এসেছে পাহাড়ে যা কিছু দ্বিধা। ('আলেখ্য', 'আলেখ্য')

এই নির্ভীক অনলস কর্মী মানুষের পূর্ণাবয়ব—চাহনিতেই যার যাত্রারম্ভ, যার পাশে দুদণ্ড বসাও 'জীবনের অভিযান', যার চলায়-বলায় 'তীরের ফলকে রৌদ্রের হীরা', যার 'আতত শরীরে' টংকার, সেই 'প্রশান্ত সূর্যের মতো ধীর' মানুষকে 'আলেখ্য' গ্রন্থে নানা ভাবে পাই। কবি তার সঙ্গেই একাত্ম হতে চান।

কাজের মানুষ ঘোরে সারা পরগণা ··

আমাকেও নিক মিছিলে তাহলে নিক সে···

বলিষ্ঠ তার কর্মী-বাহুর গানে

দিবারাত্রির একান্ত এক কোণা ··

('একটি প্রেমের পাঁচটি কবিতা', 'আলেখ্য')

তাঁর কবিতায় কর্মময় মানুষের এই মিছিল এবং কর্মের এমন গরিমাময় রূপ আধুনিক বাংলা কবিতাপাঠকের কাছে একটা বড় অভিজ্ঞতা। ঠিক এমনিভাবেই কাজের মেয়েরও আলেখ্য আঁকা হতে থাকে তাঁর কবিতায়। কবি তাকেই বলেন 'চেনা মুখ', 'সমস্ত দেশের চেনা যৌবনের হাসিমুখ'। 'গোটা জীবনের প্রেমে বিশ্বাসী বাংলা দেশের মেয়ে', যার 'ছোটোখাটো বীরত্বের প্রাত্যহিক নিষ্ঠার জীবন', যে শুধু গৃহিনী নয়, জঙ্গী,

জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা

আমাদের পাশাপাশি, প্রতিবেশী, সহকর্মী

কিংবা বলো প্রতিযোগী ··

সেই 'আমাদের মেয়েরা'—তারাই তো 'প্রতীক কবির 'মনের পাথারে'। কবির স্বপ্নকে জ্বালিয়ে রাখে তারা ঋজুকোমল শরীরের ছন্দে। 'আলেখ্য'-র সেই তন্বী শ্যামা মেয়েটিই 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এ অন্তরঙ্গ আপিসের ভিড়ের সহকর্মিণী, 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ একেলে রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে। ওদের মিলনের দৃশ্যেই কবি পান তাঁর স্বপ্নের চরিতার্থতা।

একালের কৃষ্ণকলি, কখনো দেখেছি সে একা নয়,

সঙ্গে যায় একেলে যুবক, পরনে পাজামা।

('আলেখ্য', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

তাই তো মাঝে মাঝে রাজার ছেলে
মিছিল করে কলরবে।
রাজার মেয়ে তাই হৃদয় দেয় মেলে
ধর্মঘটের গৌরবে।...
এদের অভীবের অগ্নিবীণাতে
জীবন পেল যৌবন। ('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত', ঐ)

এই কর্মিণী নারীই বিষ্ণু দে-র কবিতার জগতে প্রেমিকার মৌল প্রতিমা। অনুভূতির বৈচিত্র্যের সীমা নেই, রহস্য অন্তহীন, আকাঙ্ক্ষা শতবর্ণ—কিন্তু সেই অধরা বিধুর আমাদের ঘর্মময় বাস্তবেরই নিত্যসহচর। কবি বলেন :

তোমার মেয়েলি সত্তা আধোসত্যে আধোকল্পনায়,
এমনি ঘুরুক স্বপ্নে আর প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।
('এক যুগের সংলাপ, 'আলেখ্য')

যাকে পাওয়া কখনও নিঃশেষ হয় না, হাওয়ায় যার অস্তিত্বের ভাষা টের পাওয়া যায়, তাকেই কিন্তু কবি বলতে পারেন :

আমার বৈশাখে তুমি শ্রাবণের সেই নদী
প্রেমের লাবণ্যে স্নেহে কর্মিষ্ঠতায় আশ্বিনের স্বচ্ছস্রোত...
('নদীর উৎস যদি জানা থাকে,' 'নাম রেখেছি...')

তুমি এসো প্রতিদিন হে জীবন হে প্রেয়সী আমার হৃদয়ে,
এসো তুমি বাহুবন্ধে প্রতিদিন উভয়ের কাজে মৃত্যুঞ্জয়ে...
('রাগমালা', 'আলেখ্য')

বিষ্ণু দে-র কবিতায় বহুস্তর 'তুমি'র আবির্ভাব তো বহু আগেই—এখন বুঝতে পারি, স্বদেশ ও সমাজের, তাঁর সমগ্রের ভাবনার প্রতীক হতে পারে এই 'কাজের মেয়ে'ই যাকে পাওয়া যায় একই সঙ্গে ঘরের ঘনিষ্ঠ ছায়ায়, জীবনের ও জীবিকার তোলপাড় স্রোতে, আবার আত্মদানের ঝড়ো হাওয়ায়।

বাস্তব যেখানে কুটিল, অথচ স্বপ্ন অপ্রতিহত—শুধু ভবিষ্যতে নয়, বর্তমানেও—তখন দ্বন্দ্বের একটা ব্যাপ্ত চেহারা তো উঠে আসবেই। তা-ই ছেয়ে আছে বিষ্ণু দে-র কবিতায়। সমাজের শরীরে দ্বন্দ্বের বিচ্ছিন্নতা, কবির মনে দ্বন্দ্বের ঐক্য—এরকম সরল ব্যাপার তো নয়। এই বিচ্ছিন্নতা ও ঐক্যের ক্রমান্বয় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কতকগুলো প্রাকৃতিক সামাজিক বা পৌরাণিক

প্রতিমায় বিধৃত হয়ে থাকে।

দিন-রাত্রি এরকমই একটি উপমা। দিন ও রাত্রির বিচ্ছিন্নতার কথা যেমন বলেন কবি, তেমনি তার মিলনের কথাও। একটি স্তরে তিনি যখন বলেন, 'দিনকে ভয়, দিনেই চোরাগলি', কিংবা 'বাংলার দিনগুলি গোবিপ্রান্তর', বলেন 'নিঃঝুম দিনে'র কথা বা 'দিনের জ্বালা'-র কথা, দিনের মধ্যেও অশুচি অন্ধকারের কথা— তখন বুঝি আমাদের ভঙ্গুর সমাজের যত কিছু ক্লেদ ও অর্থহীনতা, তার সঙ্গেই এক করে দেখছেন দিনকে। রাত্রিই তখন তাঁর কাছে 'স্বপ্নে স্বপ্নে জাগ্রত'।

রাতগুলি গানে মরমর
আঁধারে স্বাধীন · ('দিনগুলি রাতগুলি', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')

রাত্রি বা অন্ধকার সম্পর্কে সরল ও যান্ত্রিক মার্কসবাদী চেতনার মিল নেই বলেই কোনো সমালোচক একে 'মার্কসীয় মিস্টিসিজ্‌ম্' আখ্যা দিয়েছেন বটে[১], কিন্তু এতে রাত্রি-দিন বা আলো-অন্ধকারের মধ্যে যে বিপরীতের সংশ্লেষ আছে, সেই 'মার্কসীয় চিদম্বর' চোখ এড়িয়ে যায়। রাত্রি তাঁর কাছে চেতনার বিলোপ নয়, সচেতনতার উদ্বোধন। অন্য রাত্রি বা অন্য অন্ধকারের পরও তো তিনি চান অন্য দিন, অন্য আলো। আজকের বুভুক্ষু ও অরাজক দিনকে বাতিল করে স্বপ্নের রাত্রিকে জাগিয়ে রাখা, যাতে কর্মময় সৃষ্টিময় নতুন দিনকে পাওয়া যায়। তাই এর পরের কথায়: দিন ও রাত্রির মিলন। যা ভবিষ্যতের গর্ভে, অথচ যা প্রতিনিয়ত নির্মিত হচ্ছে বর্তমানেই।

দিনে রাতে গড়ি এ নিখিল···('আশ্বিনে', 'নাম রেখেছি' ·)
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে···('ভিলনেল', ঐ)
দিন ও রাত্রির তরল নিবিড়ে · ('পাঁচপ্রহর', ঐ)
দিনকে খুঁজি রাতে ও রাতে দিনই
হাওয়ার মতো ঘুরছি চারদিকে ··('আগামীবারে সমাপ্য', ঐ)
দিনগুলি ওড়ে প্রজাপতি, রাত্রি দেয়ালির সংসার ·
('একটি প্রেমের পাঁচটি কবিতা', 'আলেখ্য')
তাই রাত্রি হিরণ্ময় তাই দিনগুলি জোড়ে বোনা? ('যামিনী রায়ের এক ছবি', ঐ)

দিনরাত্রি তোমারই সংগীতে
মর্মরিত আমার নিঃশ্বাস···('এক যুগের সংলাপ', ঐ)
রাতের কোলে মিলবে প্রতিদিন···('দেশে ও কালে', 'তুমি শুধু ··')

রাত্রিদিনের এই সংহতি, যখন একই কেন্দ্রে স্বপ্ন ও জাগরণ গাঁটছড়ায় মিলবে, সেই ভাবনাতেই কবির আকাঙ্ক্ষার বিশ্ব। শঙ্খ ঘোষ ঠিকই বলেন, 'দিন আর রাত্রি তাহলে কোনো কথা নয় আর, কথা কেবল তার হয়ে ওঠা নিয়ে।' [২]

ঠিক এরকমই গ্রাম ও শহরের বিভেদ ও ঐক্যের সামাজিক প্রতিমা তাঁর কবিতায় ক্রমশই জায়গা নিয়েছে এই সময়ে। এ-প্রতিমা হয়তো তত জটিলতা নিয়ে আসে না। তবু, কবি যখন বলেন, 'তাই চলেছি শহর ছেড়ে গ্রাম্য মাঠে রুদ্ধ প্রাণ'—তখন একজন অন্তত বলেছিলেন, 'বিষ্ণু দে শহর থেকে অনেকখানি মুখ ফিরিয়ে গ্রামের, প্রকৃতির দিকে তাকান, স্বহস্তে শহরের বন্ধন শিথিল করে দেন।'[৩] সত্যিই কি তাঁর কাছে এভাবে একটাকে ছেড়ে আরেকটা ধরার প্রশ্ন ওঠে? আমাদের এই বাস্তবে কোনোটাকেই যে ধরা যায় না, ছাড়াও যায় না। শুধু বস্তুর নিহিত আলোঅন্ধকারকে আনা যায় চেতনায়।

আমাদের এ শহর যে মামফোর্ডের উৎসাহের শহর নয় এ তো জানা। এখানে ছড়িয়ে আছে জিরাফ, টিরানোসরাস কিংবা জলহস্তী, কুমির, গোখুরা, হায়না, শেয়াল। কখনো কখনো মনে হয়, এই শহুরে কৃত্রিমতাকে এড়াতে সভ্যতার গ্লানিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে তিনি বুঝি ছুটে যান গ্রামের আশ্রয়ে, রোমান্টিকরা যেমন বলেন, প্রকৃতির কোলে। কিন্তু এ মুক্তি তো অলীক। তা ছাড়া সেই প্রকৃতিও তো আর অক্ষত নেই, সেই গ্রামও গেছে বদলে—'এ গ্রাম সে চেনা গ্রাম নয়'—'নিসর্গে মানুষে সেই গ্রাম ঠিক এই গ্রাম নয়।' ঠিক যেমন মনে হয়, 'এ শহর তো কারো শহর নয়।' আর তখনই বুঝতে পারেন, গ্রাম ও শহর আজ এক, 'গ্রাম কি শহর বলো সব তেপান্তর।' কি হবে ছুটে শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে?

অর্থাৎ কোনোটাই তাঁর নিজবাস নয়—না আজকের গ্রাম, না আজকের শহর—না প্রকৃতি, না নাগরিক জীবন। তাই তো 'পরবাসী' কবিতায় তিনি আর্তস্বরে প্রশ্ন করেন, 'সারা দেশময় তাঁবু বয়ে কত ঘুরব?' নাগরিক জীবনের গ্লানিতে ছিন্নভিন্ন মুখর শহর থেকে তিনি মুক্তি পান বটে প্রকৃতির নন্দনে কিংবা গ্রামের সহজে, সব জেনেও ক্ষণিক পরিত্রাণ চান ব্যক্তিগত বাঁচার তাগিদে বা আপন শুদ্ধতা রক্ষার কল্পনায়, চলে যান 'শহর ছেড়ে অন্তহীন উদার নিসর্গে'। তবে এই ব্যক্তিগত বাঁচাটাই বা আর হয়ে ওঠে কই? কারণ গ্রামও তো আমাদের দুস্থ, প্রকৃতির স্বস্তিও তাই আমাদের শান্ত রাখতে পারে না—অনিবার্য হানা দেয় শহর। ঠিক যেমন 'আমরা শহর চাই গাঁয়ে গাঁয়ে আরেক

শহর'বলে তিনি দাবি করেন ঠিকই, কিন্তু পরক্ষণেই চিৎকার করে ওঠেন, এ শহর চাই না। শেষপর্যন্ত দেখা যায়, নাগরিক জীবনের বাস্তব এবং গ্রাম বা প্রকৃতির আশ্রয়, এ দুয়ের সম্পর্ক তাঁর কবিতায় আর সরল সহজ ব্যাপার থাকে না।

প্রশ্নটা তাই নিজের সত্তার তাগিদেই ছুটে যাওয়া গ্রামে এবং আঘাত পেয়ে যেন ফিরে আসা শহরে। অন্বিষ্টের সন্ধানে এই খুঁজে-ফেরা চলেই, যত দিন না সমাজের ক্রান্তিতে গ্রাম ও শহরের বিভেদ ঘোচে। কবির চোখে তো সেই স্বপ্নই—'গ্রাম ও শহরে শহর-গ্রামের স্বচ্ছন্দ আরাম'—যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এই শতকের গোড়ায় প্যাট্রিক গেডেসের মতো প্রাজ্ঞ স্থপতি, নগর-পরিকল্পনার সঙ্গে সভ্যতার, শিল্পসৌন্দর্যের, এক কথায় মানবজীবনের পুরুষার্থের সম্পর্ক মনে করিয়ে দিয়ে - কিংবা ঐ একই সময়ের আরেক স্থপতি এবেনেজের হাওয়ার্ড, যাঁর স্বপ্ন ছিল আগামীকালের উদ্যান-শহর।

তুমি সেই কোথা ট্রামে বা ভরতি বাসে
ভাবো : প্রকৃতিকে আনবে শহর ঘেঁষে ;
গ্রাম দেশে দেবে নবনাগরিক ভাষা। ('চৈত্রহাওয়ায়', আলেখ্য'
শহরে শহরে ছায়াবীথি দাও অরণ্য জাগাও
সারা দেশে সরসতা আনো। ('বৈশাখী মেঘ', ঐ)

ভাবী সমাজের এই স্বপ্ন, নতুন শহরের স্বপ্ন, নতুন গ্রামেরও, যেখানে গ্রাম ও শহর মিলে গেছে—'যেখানে দ্বন্দ্ব সমাহৃত এক সুস্থ সুশ্রী গানে', সেই স্বপ্ন তাঁর চোখে—যেখানে প্রকৃতি আমাদের জীবনে অঙ্গীভূত, সেই জীবনেই তো আমরা চলতে চাই, 'মাসে মাসে ভিন্ন ভিন্ন ঝরা ফুল ঝরা পাতা আলতো মাড়িয়ে'—তাই প্রতীক্ষা, কবে 'আনন্দ মিলবে গ্রাম-শহরের অভিন্ন স্বস্তিতে।'

এ হল স্বপ্ন ও প্রতীক্ষার কথা। কিন্তু বাস্তবের চেহারাটা কি অজানা?

জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।··· ('পরবাসী', 'তুমি শুধু ··')

তাই যে-গ্রাম যে-শহর দেখতে চান কবি, তার কোনোটাই নেই আজ—শহর নিতান্তই গ্রাম্য এবং গ্রামকে আক্রমণ করেছে শহুরেপনা। গ্রামের উপোসী মানুষের কান্না তিক্ত করে দেয় টুরিস্টের ছুটি, 'গ্রামদেশে এই চড়িভাতি'—কবি বলে ওঠেন 'এ গ্রাম শহর আর নয়।' বুঝতে পারেন, 'শহরে শহরে কোনোই আরাম নেই, / গ্রামে মানুষের এতটুকু দাম নেই।' গ্রাম ও শহর সবই আজ ভূতপত্রীর দেশ। গ্রামের পাস্তভূত ও কবন্ধ হানা দিয়েছে, জ্যান্ত

হয়ে উঠেছে শহরে। কারণ এ গ্রাম তো স্বপ্নের গ্রাম নয়—এ গ্রাম মারি ও মড়কের, বন্যার, বাস্তুত্যাগী নৈঃসঙ্গ্যের গ্রাম।

অথচ শিকড় সন্ধান করতে হবে আজ ঘরছাড়া উৎকেন্দ্রিক মানুষকে এই লক্ষ গ্রামের দেশ থেকেই। গ্রাম বাদ দিয়ে শহুরে জীবনে আমাদের পরবাস ঘুচবে না। তাই শুধু বিচ্ছিন্নতার কথাই নয়, ঐক্যের কথা, ঐক্যের স্বপ্নের কথাও আসে। তিনি জানেন, 'কৃষাণ কৃষাণী ওরা, আর এরা ভব্য চাকুরিয়া'—'অথচ সবাই এক, উভয়েরই একটি প্রকৃতি।' আত্মপরিচয়ের ভাষা তাই শুধু শহরে নয়, গ্রামে ও শহরে। তাই চিরচেনা কুষ্ঠিত লজ্জার কলকাত-সম্পর্কে তাঁর প্রার্থনা: 'নিরন্ন কলুষ ধুয়ে কলকাতাকে প্রাণ দিক গ্রাম' এবং তখনই তো হয়ে উঠবে আমাদের কাছে 'গ্রাম শহর সুস্থ ধীর নবনারাম'।

বিচ্ছিন্নতা ও ঐক্যের এই বাস্তব ও স্বপ্নের সত্য আরো নানা প্রতিমাতেই রূপ পেয়ে যায়। তার মধ্যে বহু পৌরাণিক প্রতিমা তো আমরা আগেই পেয়েছি। সেদিক থেকে সুপরিচিত পার্বতী-পরমেশ্বর এ সময়ের কবিতায় অন্যদের ছাড়িয়ে যেন আরো বেশি উচ্চারিত হতে থাকে—হয়তো বিচ্ছিন্নতা ও ঐক্যের এই ক্রমিকতা পার হয়ে মহামিলনের নিশ্চয়তা এর উল্লেখে চকিতেই স্পষ্ট হয়ে যায় বলে। তাই তিনি এক-আধবার যেমন বলেন 'উমার কৈলাস-ছাড়া আঁখি'-র কথা কিংবা 'কৈলাসথব উমার অশ্রুজলে'র কথা:

> পার্বতী বেতালা নাচ ধরে আর শিব ?
> চড়কের সং সেজে লণ্ডভণ্ড মাথায় দাঁড়ায় ·
>
> ('লুসিয়া, প্রকৃতি, আমরা', 'স্মৃতি সত্তা...' ,

কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে বারবার:

> এদিকে পাহাড় ওদিকে চূড়ার সার—
> এই পার্বতী এই পরমেশ্বর। ('আশ্বিন', 'নাম রেখেছি...')
> উমার হৃদয়ে জ্বলে ত্রিনেত্র যেমন
>
> ('অথচ তোমায় জানি', 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ')
>
> নটরাজ বুঝি নামল নীলিম শুরু
> বাহুর ভঙ্গে গৌরীর বরঅঙ্গে।
>
> ('প্রথম কদম ফুল', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ')

ঠিক যেমন সেই অতি-পরিচিত প্রতিমা 'কপিলগুহার ভীষণ অন্ধকার' হয়ে যায় 'কপিলগুহায় সাগরদ্বীপে আবার চিনে ডাকব' ('বসেছিল চুপ', 'স্মৃতি

সত্তা…')। পার্বতী-পরমেশ্বরের উপমাই প্রসারিত হয় বরবধূ বা বিবাহের প্রতিমায় বারবার। 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ শুনি : 'বিধবার দেশে অরক্ষণীয়া সুন্দরীর বর নেই', 'বিবাহের সকলই প্রস্তুত·· শুধু বর নেই'—আর অন্য দিকে 'বর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয়।' বেকার ছেলে এবং আপিসে-খ'টা কাজের মেয়ে মিছিলে-ধর্মঘটে সেই প্রস্তুতিতে মগ্ন, যখন বলতে পারা যাবে 'বিবাহের রঙে রাঙা কপালে একটি লালতারা', কিংবা :

> গোধূলিলগনে এই বিবাহের রঙে
> তাও তো তোমাতে চাই
> দিনরাত্রি হোক গুঞ্জামালা।
> (তাই তো তোমাতে চাই', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

এই দ্বন্দ্বের চেতনা—কখনো বিচ্ছিন্নতায়, কখনো ঐক্যে—পরিব্যাপ্ত তাঁর সমস্ত কবিতায়। সামাজিক বা মানসিক বিচ্ছিন্নতার কথা যখন বলেন, তখন যেমন তার মধ্যে নিহিত থাকে সেই বিচ্ছিন্নতার রূপান্তর - তেমনি অদ্বৈত আবেগের স্থির মুহূর্তেও বিচ্ছেদভাবনা। কিছুতেই একটাকে ছেড়ে আরেকটা দাঁড়াতে পারে না। সমাজবোধ-বাস্তববোধ এবং কবির স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ-ভাবনা অঙ্গাঙ্গী বলেই প্রতি মুহূর্তেই সমস্ত চেতনায় আসা-যাওয়া করে এই বিপরীতের অভিন্ন সত্য। দ্বন্দ্বেরই একটি শুদ্ধ ও নৈর্ব্যক্তিক ধারণাই যেন অনুরণিত হতে থাকে তাঁর কবিতার হাওয়ায়। তাই কি কবিকে কখনো তিনি বলেছেন 'চিরবিরহী', কখনো চিরমিলনের সাধক? কখনো 'মনের হরিষ'. কখনো 'বিষাদে অস্থির'। দুটোই কি এক নয় তাঁর কাছে? 'মিলনে-বিরহে চিরবাহুবদ্ধ রাধা।' সামাজিক সত্য ও কবির স্বপ্নের সত্য বেয়ে এইভাবেই পৌঁছে যাওয়া যায় হৃদয়ের 'চির-দ্বৈতাদ্বৈত গানে'।

> তোমাতে আমাতে নেই মিল
> তবু তুমি আমি একাকার
> তোমার বাহুতে তোল খিল
> আমার হৃদয়ে খোলা দ্বার·· (বহু বড়বা', 'নাম রেখেছি…')
> বেশ তবে তাই হোক, তুমি থাকো একা সূর্যে,
> আমি অদৃশ্য বাষ্পের নীলাকাশ।
> ('স্বরের আড়ালে শ্রুতি', 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ')

তার পায়ে অশোক পলাশ,
আমি বই বিবর্ণ শিশির।
তার চোখে হোলির নিশির,
আমি মাঘী ভোরের আকাশ। ('আদিম-অন্তিম', 'স্মৃতি সত্তা...')

দ্বন্দ্বের এই নৈর্ব্যক্তিককেও ব্যক্তির কিন্তু হার নেই, অপসারণ নেই। ব্যক্তি চাওয়া-পাওয়ার আবেগে দোলে, প্রেমিক সে। পাওয়া না-পাওয়ার দীর্ঘ তীর্থপথ, প্রেমের তৃপ্তি-অতৃপ্তি একই দীক্ষা যেখানে, সে পথে যদি প্রেমিক চলেও সেটা প্রেমিকেরই সন্ন্যাস ঠিকই। কিন্তু শূন্যের বেগ বুক রেখেও এই সন্ন্যাসী উচ্ছ্বাসে দুই বাহু বাঁধে, মর্ত্য-আরাধনাই তার সাধনা, তার প্রব্রজ্যাও 'প্রখর আবেগের প্রব্রজ্যা'—তাই নিঃসঙ্গতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা মেশে, স্থিতির গতির অনন্ত দ্বন্দ্বের সংগঠন গড়ে ওঠে, সর্বদাই জীবনে-মরণে অধরা রহস্যের ছায়া পড়ে প্রেমিক-সন্ন্যাসীর পথ-চলায়। কবিই এই প্রেমিক-সন্ন্যাসী—নৈর্ব্যক্তিক অদ্বৈতের আত্মস্থতা ও চির-অস্থির আসক্তি দুয়ের বিপরীতে গড়ে তোলেন ভয়হীন মুক্তি। স্নায়ুর তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা তাঁকে টেনশনের চূড়ায় নিয়ে যায়—'শরীর-মনে এক বিরামহীন চরম টানে বাঁধা সুরবাহার অথবা হরধনু'—অন্য দিকে 'উদাসী মন বিধুব তবু অচঞ্চল।' এই বিপরীতের অভিন্নতাতেই কবির বিশ্ব গড়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতার সত্য, বিচ্ছিন্নতার দুঃখ এড়ানো যায় না কিছুতেই, ঠিক যেমন বন্ধ রাখা যায় না শুদ্ধ-যন্ত্রণার অনিবার্য মুক্তিদ্বার। কবির লক্ষ্য এটাই: ব্যক্তিযন্ত্রণাকে শুদ্ধ যন্ত্রণায় রূপান্তরিত করা। তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যন্ত্রণা-মুক্তিও—মানুষের দ্বন্দ্বের জগতে 'মৈত্রীর ক্রন্দসী'।

বিচ্ছেদের দুস্তর বন্যায়
কান্না ফুলে ওঠে অহরহ,
হৃদয়ে জীবনে সংসারে
মিল চায় শুদ্ধ যন্ত্রণায়···
যেখানে দ্বৈত সদা হারে
অদ্বৈত ভগ্নাংশ কোল নেয়। ('দ্বশমিক', 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ')

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ উর্মিল স্বপ্নবীজের জগতে পৌঁছে যাওয়ার যে হর্ষ, তার রেশ 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে, ক্রমশই, 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এ তা প্রথম

টের পাই, 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' আমাদের আরো সজাগ করে, স্মৃতিময় বিষাদ কবিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। হয়তো পেছনে অনেক কারণই আছে—কবির বার্ধক্যের অনুভব কিংবা দেশকালেরই আহত প্রত্যাশা। হয়তো তার চেয়েও বড়, ঐ দ্বান্দ্বিক অনুভূতিরই অন্য পিঠের চাপ। স্মৃতি নিশ্চয়ই কবির মনেরই সম্পদ—'স্মৃতির বিশুদ্ধ শুভ্র ঐশ্বর্য লক্ষ্মী'। কবি তো বলেনই, 'আমার স্মৃতিতে ইস্পাত গলে।' কখনো বলেন 'স্মৃতির সংরাগ', কখনো 'সংলগ্নতার স্মৃতি'। সমুদ্রহাওয়ায় মনের পর্বতে স্মৃতিরেণু ওড়ে। কিন্তু 'আলেখ্য'-তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে কি শুধু দিয়ে গেল স্মৃতির গোধুলি?' 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এ এসে: 'তার স্মৃতি / আজ শুধু একাকিত্বে জাগে' কিংবা 'নিঃসঙ্গতা ভাসে নির্নিমেষ' কিংবা 'যৌবনের নিঃসঙ্গতা আজ বাজে বৃদ্ধ হাড়ে হাড়ে।' স্মৃতির সঙ্গে এই নিঃসঙ্গতার কালো ছায়া তবে কি নতুন? 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ এসে কেন তবে মনে হয় 'স্মৃতি শুধু শোক'? কেন বলেন,

আজকে বৃথা বলো স্মৃতির রণনে?
আজকে শহরের জাগর অতলে
উদাসী ডুবেছে যে আত্মহননে…('ত্রিপদী', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

হয়তো সাময়িক এই অবসাদ, এখনো অসংলগ্নতার বোধ প্রবল হয় নি। এখনো 'স্মৃতির প্রতাপ এবং আশার স্পন্দন' এক সঙ্গে শোনা যায়। তাই যখন বিষাদের কথা বারবার বলেন তিনি, বেশি করে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ, তখন বুঝি, বিচ্ছেদ ও মিলনের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত রাত্রিদিন বা ঘর ও বাহিরের এ-ই পাওনা।

পৃথিবীর রাঙা দীর্ঘশ্বাস
বিষাদে আহত করে থরো থরো সৌন্দর্যে আকাশ
যত দূরে চাই। ('পলাশ', 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ')

একেই কি তিনি বলেন 'সুতীব্র নন্দনতত্ত্বে বয়স্ক বিষাদ', 'ঘনিষ্ঠের ব্যথিত নন্দন'?

দ্বন্দ্বকে অক্ষুণ্ণ রাখাও তো একটা লড়াই। জীবনের লড়াইয়ের প্রশ্রয় ছাড়া কবিতার লড়াইকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। অবশ্যই জীবন ও সমাজের লড়াইয়ের উত্তরণই জল দেয় কবিতার শিকড়ে। কিন্তু কবি নিজেরই প্রয়োজনে খুঁজে নেন আরো নানা প্রেরণা ও শুশ্রূষা।

প্রকৃতিই তো সবচেয়ে বড় শুশ্রূষাদাত্রী। কবি বলেন, 'প্রকৃতিতে পড়ি সমাজের বরাভয়।' সাঁওতাল পরগনার যে প্রকৃতিকে কবি বারবার আশ্রয় করেন, সেই টিলার ঢেউ ও লালমাটির ওঠানামা, নয়নাভিরাম চেনা সৌন্দর্য, কবির 'চোখের প্রিয়, কানের প্রাণের আনন্দ, আরাম, শান্তি'। যখনই জীবনকে দুঃসহ মনে হয়, তখনই সেই বার্তাবহ প্রতীক প্রত্যয়কে বেঁধে আনে হাওয়ায় হাওয়ায়। 'এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে' শান্তি নেই বটে, তবু এই প্রকৃতিই আবার 'লাল সবুজের ভিড়ে / প্রতিটি সত্তায় গড়ে সংহত আভাস।' 'প্রত্যহ টিলায় আনাগোনা' তাঁর কাছে 'ইন্দ্রিয়ের মুক্তধ্যান'। 'তীব্র বিধুর এ রূপের সম্ভারে'— 'এ তীব্র স্মিত সৌন্দর্যে' গড়ে ওঠে মানুষের সমগ্রতার বোধ।

প্রকৃতির মতোই শিল্পের আবেগও তাঁর আশঙ্কার জগতকে সংহত ও জিজ্ঞাসু করে রাখে। 'গানের বাস্তবে' দূর হয়ে যায় মানবক জীবনের বিচ্ছিন্নতা— 'আধেয় আধার একাকার শরীর ও অশরীরী প্রাণ'। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এর 'গান' কবিতায় তাই তো তিনি বলতে পারেন,

দপ্তরে চত্বরে উল্লাসে সংকটে গান চাই
প্রাণ চাই গান চাই শেয়ালদার শেডে।

এই গানের অধরা নিগে যায় মিলনের কৈলাসে—'রামকেলির বিলম্বিত লয়ে বাহু বাঁধি বাহুর আশ্রয়ে।'

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' গ্রন্থে এই গানশোনার অভিজ্ঞতা ছড়ানো। 'পল রোবসন'-এ 'মুক্তিতে মুক্ত আকাশে মানব-কণ্ঠস্বর'। 'সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে' মনে হয়, 'নন্দিত জীবনে নির্ভীক অজস্র রঙে ফুল ফোটে।' রাজেশ্বরী দত্ত-র 'পরকে আপন করে'-তে মনে হয়, 'সকলই সম্ভব আহা সকলই সম্ভব।' জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র 'গায়কিতে আধুনিক চৈতন্যের আতত সম্ভার।' শুধু গানেই বা কেন, 'কোনার্ক দেউলে' গিয়ে তিনি অনুভব করেন, 'চৈতন্য পাবে প্রত্যক্ষ প্রসাদ।' এই ভাবে শিল্পের বাস্তবেই বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে যায় বারবার— 'বাস্তবে অনেক বাধা', শিল্পেই পাওয়া যায় 'নৈর্ব্যক্তিক হৃদয়বত্তা'।

এই অনুপ্রেরণার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বোধহয় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। চারটি কাব্য-গ্রন্থেই রাবীন্দ্রিক অনুষঙ্গের দৃষ্টান্ত বিচিত্র ও বিস্তৃত। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর ২২শে শ্রাবণ' কবিতায় বলেন, 'আমার আনন্দে আজ আকাল ও বন্যা প্রতিরোধ।' '২৫শে বৈশাখ'-এ : 'রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।' রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার সমগ্র কবিকে, 'আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে'

জোগায় 'সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো'। এই আলোয় স্পষ্ট হয় 'একনিষ্ঠ দীর্ঘায়ু প্রগতির এক ছবি'। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এর 'রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল?' কবিতায় সেই প্রেরণার কথাই স্পষ্ট করে বলেন বিষ্ণু দে:

সপ্তাশ্বের পদধ্বনি

আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে...

এই মন নিয়েই তো সম্ভব এই সাহসী উচ্চারণ: 'আলোকিত নিত্যকর্মে আমরাও সৌন্দর্যে স্বাধীন।' এই রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারকে সারা বাংলার মনে খুঁজে পাওয়ার বা সম্প্রসারিত করার দায়বোধই যেন কবিকে খাড়া রাখে, সজাগ করে রাখে 'বিশ্রামহীন মধ্যাহ্নের কর্মিষ্ঠ রৌদ্রে'।

এই যন্ত্রণার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই এই শুশ্রূষার অগাধ বৈচিত্র্যের। প্রাকৃতিক শুশ্রূষা তো আছেই, আছে চারপাশের কর্মী মানুষের প্রেরণা। লক্ষ লক্ষ গ্রামে ও শহরে কবিতার ভাষা খুঁজে পাওয়া। 'শিকড়ে শিকড় বেঁধে যাওয়া'—তাতেই 'সত্তাকে প্রাণদান'। কখনো 'সকর্মক শিশুর হাসিতে', শিশুর নিশ্চিতিতেই লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়। আর সবার উপরে থাকে 'স্নায়ুর মাটিতে অম্লান পিপাসা', ইন্দ্রিয়ের সজাগ উল্লাস, যার জোরে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এও অম্লান যৌবন।

বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রথম পর্বে, তাঁর হয়ে-ওঠার পর্বে, নিজের উচ্চারণ আবিষ্কারের ইতিহাসে তিনি ধারণ করেন সমকালের ছোটবড় অভিজ্ঞতাকে, গ্রহণবর্জনের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন নিজের কবিদৃষ্টি। কবিতার অভিজ্ঞতা ও ভাষার মধ্যে এনে ফেলেন দেশকালেরই স্পন্দন। ত্রিশের দশকের শেষ থেকে, চল্লিশ বা পঞ্চাশ দশকের বাংলা দেশের সময় চিহ্ন রেখে গেছে এই কবিতার ইতিহাসে ও নন্দনে। এটাই তো একটা বিরাট লাভ পাঠকের। কবিত্বের বিস্তারে দেশ ও কালের পরিচয় তাঁর সামনে। বাস্তবের গোটা চেহারা, ধারাবাহিকতার সজ্ঞানে।

কিন্তু বিষ্ণু দে-র পরের অভিযান আরো বিরাট। অনুভূতির ব্যক্তিসর্বস্বতাকে বর্জন করেও ব্যক্তির অপার রহস্য কিভাবে লীলায়িত হয় এই দেশকাল-জড়ানো নৈর্ব্যক্তিকতায়, কিভাবে দ্বন্দ্বের পটে নির্মিত হতে থাকে ব্যক্তিগত বাসনালোক ও নৈর্ব্যক্তিক উদাস সংবিত একই পক্ষপাতে, কিভাবে মিলনের

উল্লাস ও বিচ্ছেদের অশ্রু সংলগ্ন হতে পারে ইতিহাস ও ব্যক্তি উভয়েরই বাস্তবে কিংবা কিভাবে দেশকালের সংযোগ থেকেই বৃহৎ কল্পনায় পুনর্সৃষ্টি হতে থাকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সেই ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকের আলোড়নে উদ্ভাসিত মহা-বিশ্বের আবিষ্কারই বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রকৃত মহত্ত্বের উৎস। একই সঙ্গে ঘরোয়া অন্তরঙ্গতা, অন্যদিকে মনের মহাজাগতিক তীব্র অভীপ্সা : আকাঙ্ক্ষার এই ব্যাপ্তি ও ক্ষমতা কিংবা বলা যায়, প্রতি মুহূর্তের গ্রহণ-বর্জন, আসক্তি-নিরাসক্তি, ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট—সচেতন বোধে ও দেখার বা অনুভব করার রহস্যে গড়ে ওঠে তাঁর মহাবিশ্ব, মহাকাব্য। প্রতিটি দৃশ্যে, প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ কিংবা মনের লঘু সক্রিয়তা এবং সেই সঙ্গে বিরাটের নির্মাণ। এ যেন বিশ্বরূপকে দেখা 'দোঁহার কৌতুকে' কিংবা 'পৃথিবীর গান'-কে ঘরে আনা সন্ধ্যাদীপে। এই বিশাল আলিঙ্গন ছড়ানো তাঁর কবিতার বিশ্বে। দেবেশ রায় সুন্দর বলেছেন, এ যেন 'শুধু সমকালকে এপিককালে বদলে নেওয়া, ঘুচিয়ে দেওয়া সমকালের দ্বিধাদ্বন্দ্ব।'[৩]

> বহু দীর্ঘ পরিক্রমা, নীল কন্যাকুমারিকা থেকে
> নদনদী মাঠক্ষেত পাহাড়পর্বত পার হয়ে
> ডিঙিয়ে অগস্ত্যবিন্ধ্য, মুক্তির গাহনে গঙ্গাজলে
> লঘিমা সর্বাঙ্গে মেখে ধূর্জটির জটা বয়ে শেষে
> মন্দাকিনী নির্ঝরের শীকরবীজন ভূর্জবনে
> এসেছি, এখানে হাওয়া স্বচ্ছ নীল অণিমা বিথারে …
> কন্যাকুমারিকা থেকে অভিযাত্রী আমি ক্লান্তিহীন
> এবারে পৌঁছাব বুঝি কৈলাসের দিন পার হয়ে…
> …শুভ্র হিমে আমৃত্যু রইব শুধু চেয়ে,
> সৌন্দর্যে বিধুর শুদ্ধ, পার্বতীতে যেমন গিরিশ।
>
> ('পরিক্রান্ত', 'আলেখ্য')

সমকালের দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো রইলই, রক্তমাংসের ঘৃণায় ও সংরাগেই রইল—তার স্বরূপকে, তার অতীতবর্তমানভবিষ্যৎকে, তার নিশ্চিত মুক্তির রক্তোচ্ছ্বাস-কেও চিনে নেওয়া গেল প্রতিমুহূর্তে বিরাটের বা সমগ্রের প্রশস্ত বক্ষপটের আশ্রয়ে।

মনন ও আবেগের বিভেদ সেখানে অস্বীকৃত। প্রখর আত্মসচেতনতাতেই হয়তো যাত্রারম্ভ, কিন্তু বারবার তা ডুব দেয় অবচেতনে—জাগরণ ও নিদ্রা

কোথায় যেন মেশে—'ঘুমের আকাশে মুক্তি' কিংবা 'স্নায়ুর আরোগ্যস্নান ঘুমের শিশিরে'। ইন্দ্রিয়ের সাতরং ঝলমল করতে থাকে, অথচ ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার চোরাগলিতে মাথা কোটে না—বুদ্ধির আলোকোজ্জ্বল আকাশের নীচে দাঁড়াতে পারে কবির শরীরমন ইন্দ্রিয়ের ঐশ্বর্যেই ধনী হয়ে।

অতৃপ্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে এ তো সমগ্রেরই জয়ের ধ্যান। কিংবা হয়তো বিরাটবেই মূর্ত হতে দেখা প্রতিদিনের জীবনযাপনে, বর্মে, লড়াইয়ে, এমনকি লড়াই থেকে সাময়িক পিঠটানেও। মুহূর্তের ও ইতিহাসের অনুরণন এক সঙ্গে পাওয়ার অভিজ্ঞতাই বিষ্ণু দে-র কবিতার যাত্রাপথের উপার্জন।

১. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, "খরস্রোত নব আনন্দের"। 'দেশ', ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ ব।

২. শঙ্খ ঘোষ, 'রাত্রি স্তোম : বিষ্ণু দে'। 'শব্দ আর সত্য'। প্যাপিরাস, ১৯৮২। পৃ ১২৫।

৩. অশোক মিত্র, 'গ্রামবাংলার পঁচিশ বছর'। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', স্বর্ণ জয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৯ ব।

৪. দেবেশ রায়, 'বিষ্ণু দে-র অপেক্ষায়'। 'পরিচয়', নভেম্বর ১৯৮২।

—